সূচিপত্র।

নলিনী।

বিষয়।

ম সংখ্যা। মূল্য /০ আনা।

ভারতী।

১

বসিয়ে পর্ব্বতোপরে, ধরি শির বাম করে,
কি হেরিছ শূন্যপানে, জননি, আমার!
কেন মলিন বদন, জলে ভাসে ত্রিনয়ন,
পশেছে মরমে কি গো কীট ভাবনার?

২

কোথা তব পীতবাস, কোথা সে উজ্জ্বল ভাস,
কেন ফেলিয়াছ খুলি রতন ভূষণ?
কাঙ্গালিনী বেশ ধরি, পদ্মাসন পরিহরি,
বিরলে বসেছ হয়ে বিষাদে মগন!

[illegible], কোথা, গো মা ত্রিভঙ্গিনি,

কেন নাহি হেরি, দেবি, তারে পদ্ম করে !

কেন নীরব এক্ষণে, সপ্তস্বর সুধাননে,

কাঁপাইছে ঘনশ্বাস মধুর অধরে !

৪

বেদ, বেদাঙ্গপুরাণ, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান,

ছড়ায়ে তাদের, মাতঃ, ফেলেছ কোথায় ?

কি খেদ হয়েছে মনে, কেন বিষণ্ণ বদনে,

ভাসাইছ ধরণীরে নয়ন ধারায় !

৫

ক্ষণে ক্ষণে বঙ্গক্ষেত্রে, দেখিছ সজলনেত্রে,

শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে, শূন্য দরশন ;

পুনঃ যেন অভিমানে, কাতর হইয়া প্রাণে,

ফিরাইছ তায়, সহি অসহ্য বেদন ।

৬

কি হেতু সহ এ জ্বালা, কহ চতুর্মুখবালা,

পশিল কেন এ শোক হৃদয়-কমলে ;

সুধালে কহ না কথা, এত কি মনের ব্যথা,

অথবা করিছ ঘৃণা বঙ্গবাসী বলে ?

৭

বুঝেছি মনের গতি, দুর্ভাগা বঙ্গের প্রতি,

হয়েছে, জননি, তব এত অভিমান ;

সে জন্য বঙ্গের পানে, চাহিতেছ ক্ষণে ক্ষণে,

তাই গো সজলনেত্র, বিষণ্ণ বয়ান !

৮

বিধির বিধানে বঙ্গ,　　হয়েছে উদ্যম ভঙ্গ,
ধন, মান, স্বাধীনতা কিবা আছে আর!
সকলি গিয়াছে হায়,　　বিধিত কি না ওপায়,
সেই হতে পড়িয়াছে এত হাহাকার।

৯

নাহি আর্য্য রাজাগণ,　　উৎসাহ দিতে এখন,
সঙ্গীতে কবিত্বে আর যত শাস্ত্রচয়ে।
তেঁই, গো ভারতি এবে,　　গিয়েছে সে দীপ নিভে,
জ্বলিত উজ্জ্বল তেজে যাহা বঙ্গালয়ে।

১০

জঠর যন্ত্রণানলে,　　কাতর এবে সকলে,
সঙ্গীতের কবিত্বের কোথা আর রস?
জনাদে দুঃখের দায়,　　কেহ না ফিরিয়া চায়,
এমনি হয়েছে সবে পরিশ্রম বশ।

১১

কত যে হইল যত্ন,　　তুলিতে কবিত্ব রত্ন,
অতল জলধি মধ্য হইতে তোমার।
সকলি বিফল হল,　　কাল তরঙ্গে ডুবিল,
[illegible], যাতে রত্নের উদ্ধার।

১২

কে গাঁথিবে বল আর,　　বিনা গুণে ফুলহার,
ডুবেছে ভারতচন্দ্র যার রজদিন।
নাহি কীর্ত্তিবাসভবে,　　কবিত্ব কোথা সম্ভবে,
বিদ্যাপতি বিনা বঙ্গ সুরস বিহীন।

১৩

হায় কে অপূর্ব্বতানে, মোহিত করিবে প্রাণে,
ত্যজিয়াছে জীবলীলা শ্রীমধুসূদন !
কে শিখাবে গৌড়জনে, স্বভাবের ছবিসনে,
নাহি আর দীনবন্ধু দরিদ্রের ধন !

১৪

হায় মা দুরন্তকালে, গ্রাস করেছে অকালে,
সুরেন্দ্রে, অপরিচিত, তোমার সন্তান !
অতি সুললিত স্বরে, চিত্ত বিমোহিত করে,
গাইবে বিরলে আর কে মধুর গান !

১৫

অ রো কত কবিগণ, স্মরি ও রাঙ্গাচরণ,
পশিয়াছে সগৌরবে যশের মন্দিরে ;
নাহি তারা এ জগতে, নূতন তানে তুষিতে,
দিতে সঞ্জীবনী শক্তি শবের শরীরে !

১৬

তেঁই বঙ্গবাসস্থান, হয়েছে যেন শ্মশান,
দুরন্ত কৃতান্ত দোষী, নহে বঙ্গদেশ ;
কত রত্ন প্রসবিল, কাল সকলে হরিল,
বঙ্গ রত্নাগার ক্রমে হইতেছে শেষ !

১৭

কি হবে স্মরিলে আর, কৃতান্তের ব্যবহার,
জ্বলে উঠে হৃদয়েতে কেবলি অনল !
যাগ মা গিয়াছে যারা, অমর হইয়া তারা,
লভুগ বিশ্রাম সুখ, কীর্ত্তি সুবিমল।

১৮

আশীর্ব্বাদ, ভগবতি, কর গো বঙ্গের প্রতি,
বঙ্গদেশ এখনও কবিশূন্য নয়।
নবীন পলাশীযুদ্ধে, হেম বৃত্রাসুর বধে,
কাব্যরসে ভাসায়েছে বঙ্গের হৃদয়।

১৯

পদ্মিনীর উপাখ্যানে, কি মাধুরী, কে বাখানে,
বসায়েছে রঙ্গলাল করিয়া সন্ধান।
কতই কল্পনাসনে, ভ্রমণ করিয়া মনে,
রচেছে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপন-প্রয়াণ।

২০

বঙ্কিমের কাব্যবাগে, অনন্ত বসন্ত জাগে,
প্রণয়ের প্রেম খেলা মদন খেলায়।
লইয়া মর্ত্ত্যের ছবি, ভেদি অম্বর শশি,
গায় কৃষ্ণ তাঁয় স্বর্গে উঠি কল্পনায়॥

২১

আরো কত জন সাধে, তব চরণপ্রসাদে,
গাঁথিতে চিকণমালা কবিতা-প্রসূনে।
গায় কি মধুর গান, ভুলাইয়া দেয় প্রাণ,
মরি যেন পিককুল নিকুঞ্জকাননে।

২২

কর মাতঃ, আশীর্ব্বাদ, ত্যজ এ মনবিষাদ,
দেহ বর, গো বরদে, তব দাসদলে।
গীতি গাঁথি নবহার, স্বজনে উপহার,
সকলে মিলিয়া দিব চরণকমলে॥

২৩

ত্যজ কাঙ্গালিনীবেশ, বাঁধ মা চাঁচর কেশ,
ধর বীণা পদ্ম করে, জগত-জননি,
গাইব মা নানা রঙ্গে, পুলকে পূরিয়া বঙ্গে,
শুনিবে আনন্দভরে তুমি, নারায়ণি!

২৪

ত্যজ মলিন বসন, ত্যজ, দেবি, ধরাসন,
বাজিবে কোমল অঙ্গে কঠিন পাথর।
তব পাদপদ্ম স্মরি, "নলিনী" রচনা করি,
আনিয়াছি রাখ পদ ইহার উপর॥

২৫

পাদপদ্ম পরশিয়ে, নলিনীরে বিকাশিয়ে,
বিস্তার মা ভূমণ্ডলে মধুর সৌরভ।
যেন পরিমল লোভে, ধেয়ে আসি অলিসবে,
করিয়া পীযুষপান বাড়ায় গৌরব॥

ন

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রসর।

এই বিশ্বসংসারের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কি অদ্ভুত ও মনোহর দৃশ্য আমাদিগের নয়নগোচর হয়! উপরে অনন্ত আকাশ—তাহাতে অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আভাময় সুবর্ণবৃত্ত বা প্রোজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নিম্নে কোথায় ফল-পুষ্পশোভিত তরুলতা, কানন আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে—কোথায়

তরলরজতময়ী নদী কলকলস্বরে প্রবাহিত হইতেছে—কোথায় অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, কোথায় উত্তালতরঙ্গময় সাগর, কোথায় বালুকাময় বিস্তীর্ণ মরুভূমি বিরাজমান রহিয়াছে। এইরূপ জড়প্রকৃতির দৃশ্য। সৃষ্টির অপর দৃশ্য জীব-প্রকৃতি। সেই জীব-প্রকৃতির ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শয়ন, বিরাম, দ্বেষ, সুখেচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-বোধ এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম। ইতর জীব প্রকৃতির চিন্তা-শক্তি সংকীর্ণ। শুদ্ধ মানব-প্রকৃতি অসীম চিন্তাশালিনী দেখা যায়। জড়প্রকৃতি চিরকাল সমভাবে চলিতেছে, উহা নৈসর্গিক নিয়মাবলীর অধীন। ইতর জীব প্রকৃতি নৈসর্গিক নিয়ম ও স্বাভাবিক সংস্কারসমূহের অধীন। ঐ নিয়মের অধীন হইলেও মানব প্রকৃতির বুদ্ধি ও চিন্তা সুদূরব্যাপিনী। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব ইত্যাদি, বাহ্যদর্শনের সমুদয় প্রশ্নের [illegible] করিয়া দেয়। অন্তর্দর্শনের মীমাংসা মনস্তত্ত্বে পাওয়া যায়। ইতর প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ যে বৃত্তি আছে তাহা আনুক্রমিক ও জীবন পরম্পরাগত, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই। মানব মনের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। মনুষ্যেরা সকল বিষয়ে আপনাদিগের মনোবৃত্তি চালনা করিয়া পারিয়া অনেক তত্ত্ব অবগত হইতেছেন। অতএব সেই মন সম্বন্ধীয় বৃত্তি সমূহের পর্য্যালোচনা ও তাহাদিগের তত্ত্ব নিরূপণে যত্ন করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ কি?

রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নানা দ্রব্য সংযোজনে বস্তুর কিরূপ ভাব স্তর হইতেছে দেখিয়া পুলকিত হইতেছ। জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নে, গ্রহ নক্ষত্র সকলের গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি অবগত হইয়া বিস্মিত হইতেছ। পদার্থবিদ্যা পাঠ করিয়া তাপ, আলোক, তড়িৎ, শব্দ ইত্যাদি বস্তু সকলের গুণানুধ্যানে চমৎকৃত হইতেছ। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়েই তোমার মনের গতি দেখিতে পাইবে। যে মন ঐ সকল নিরূপণ করিয়া মানবজাতিকে সৃষ্টির ভূষণ করিয়াছে তাঁহার তত্ত্বা[illegible]

গতির কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না। এই মন-বিষয়ক তত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূত।

আমাদিগের চিরস্মরণীয় মহাত্মা পূর্ব্ব পুরুষগণ এই জড় জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ কিভাবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে এই বহিঃ-প্রকৃতির চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃ-প্রকৃতির গভীর তত্ত্ব সমূহের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আধুনিক ইউরোপীয় মহোদয়েরা বিজ্ঞানের সমূহ আলোচনা করিয়া দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কিরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং এই দর্শনশাস্ত্র ভারতীয় ও ইয়ুরোপীয় চিন্তায় কতদূর প্রসারিত হইয়াছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপ-সংহার করিব।

সকল মনুষ্যই দার্শনিক। দর্শন না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। বহিঃচক্ষু উন্মীলন করিলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প এই সকলের আকার, জ্যোতিঃ, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য গোচরীভূত হয়; কিন্তু এই সকল দর্শনে যদ্দ্বারা তাহাদিগের অস্তিত্ব উদ্বোধিত হইতেছে তদ্‌বিষয় চিন্তা করিতে কাহার প্রবৃত্তি না হয়? অতএব অন্তর ও বাহ্য উভয় বিষয়ই আমাদিগের দর্শনীয়।

পূর্ব্বতন আর্য্য পণ্ডিতেরা তত্ত্ববিদ্যাকে দর্শনশাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে বস্তু সকলের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ক সমস্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সমগ্র ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার অনুধ্যেয়। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে মুক্তিপথ দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা পার্থিব যন্ত্রণা ও ক্লেশরূপ দুশ্ছেদ্য পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এইজন্য ভারতবর্ষীয় সকল দর্শনেই কিরূপে দুঃখ, সন্তাপ ও গ্লানির চির অপশম হয় তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা উপ-লক্ষিত হয়। মহামুনি কপিল বলিয়াছেন আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ যন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভই অন্তি-

...ত্তের শেষ পরিণাম। এইরূপ ইহাও দৃষ্ট হইবে যে সকল দর্শনই পরমার্থ তত্ত্ব বিমিশ্রিত। প্রাতীচ্য দর্শনশাস্ত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষম চিহ্নটী দৃষ্ট হয় না। ইহা কেবল হিন্দুদার্শনিকগণের প্রসিদ্ধি। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ইঁহার দর্শনশাস্ত্রে পরমার্থ বিষয়ক চিন্তা [illegible] করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন পরম সত্য [illegible] বুদ্ধের আনুকূল্য-করণে এবং আত্মাকে নির্মল পবিত্রতাবিভূষিত [illegible] দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির অনুধাবক কেহই ছিলনা। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ [illegible] মত সকলকেই পূর্ব্বাপর অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

[illegible] যন্ত্রণা ও ক্লেশভোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভই যদি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য [illegible] তবে তাহা কিরূপে প্রাপ্য ?—সত্য বিষয়ক জ্ঞানে ; এবং [illegible] সত্যনির্ণয়ই দর্শনের মূল প্রশ্ন। আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা [illegible] পরিবর্ত্তনশীল—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কি আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহার ধ্বংস নাই বিকৃতি নাই—সেইটী কি ? থেলস, এনিক্সিমিনিস, এনাক্সিমিণ্ডার, পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ এই প্রশ্নেরই ভিন্ন ভিন্ন সমাধা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দানেই হিন্দুদর্শন সকলের প্রকৃতিগত বৈষম্য।

ক্রমশঃ

উপন্যাস।

রজনী-প্রভাত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত।)

দিবা যায়, রাত্রি আসে ; রজনীর অন্তে পুনরায় প্রভাত—নৈসর্গিক রাজ্য জগতের ইহা চিরন্তনী নিয়ম ও বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের

মূলভিত্তি। সৃষ্টি হইতে আবহমান কাল বাহ্য জগত এই নিয়মে চলিয়া আসিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে, কেবল ইহার অতিক্রমণেই বাহ্য জগতের লয় স্থির সিদ্ধান্ত। যতদিন এই নিয়ম থাকিবে ততদিন এই জগতও থাকিবে আর যতদিন এই জগত থাকিবে ততদিন এই নিয়মও থাকিবে। তাহাতেই বলি প্রভাত-রজনী—রজনী-প্রভাত; পরস্পর অক্ষয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, একের অপগমে অন্যের আবির্ভাব। মানবের অবস্থাও তদ্রূপ: সুখ আসে, দুঃখ যায়; দুঃখ আসে, সুখ যায়—সুখ-শেষে দুঃখ আর দুঃখ-শেষে সুখ। কেহ চিরকাল সুখভোগী বা চিরকাল দুঃখভোগী নহে। সুখ আধ্যাত্মিক দিবা ও দুঃখ আধ্যাত্মিক রজনী: সুখের সময় অন্তর সুবর্ণময় কিরণে উদ্ভাসিত এবং দুঃখের সময় মসী আবরণে সমাচ্ছাদিত। সুখের সময় মন-বিহঙ্গকে উড়াইয়া দাও, পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া উড়াইয়া দাও—বিহঙ্গ প্রাণ ভরিয়া উড়িবে, গান করিবে, ও তালে তালে নৃত্য করিবে কিন্তু দুঃখের সময় এ কি আশ্চর্য্য বিপর্য্যয়! তখন কোথায় সেই উল্লাস, কোথায় সেই মধুমাখা গান আর কোথায় সেই নৃত্য!—সুখের সহচরগণ সুখের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, অস্তমিত রবির হেম কিরণ তৎসঙ্গেই বিলীন হইয়াছে। এক্ষণে মানস-বিহঙ্গ নেত্র নিমীলিত করিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন ও শোকাসারবর্ষণে তৎপর! পক্ষী নিজে ক্রন্দন করিতেছে এবং সহৃদয় পক্ষিগণকেও কাঁদাইতেছে। কিন্তু চিরকাল এক রূপেই যায় না—নিশা যাইবে আবার দিবা আসিবে, নৈরাশ্যের ক্রীতদাস হইও না। ঐ দেখ পুনরায় প্রভাত আসিল, সুখদেবী প্রবাললাঞ্ছিতকরপল্লবদ্বারা হেম গৃহের যবনিকা উত্তোলন করিতেছেন: বৃক্ষ হাসিছে, বিহঙ্গকুল সুস্বরে গান করিতেছে আর তরলবাহিনী স্বর্ণভূষণে দেহ সাজাইয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছে! মন! সেই সঙ্গে তুমিও হাস, সুধামাখা সুস্বর ছড়াইয়া জগতকে

বিমোহিত কর আর সেই রূপে তালে তালে পুনরায় নৃত্য কর—তাহাতেই আবার বলি, প্রভাত-রজনী—রজনী-প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক বৃন্তে দুইটী ফুল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। সুধাংশুর বিমল চন্দ্রিকায় নৈশ-গগণ ও ধরাতল অভিষিক্ত—নীলনৈশগগণ হাসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরাতলও হাসিতেছে। সুধা-পিপাসু চকোর উড়িয়া উড়িয়া প্রাণ ভরিয়া সুধাপান করিতেছে—সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া, উদাসমনে জ্যোৎস্না সমুদ্রে সাঁতার দিতেছে। আকাশে একখানিও কালমেঘ নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রমেঘগুলি ধূমের ন্যায় শূন্যমার্গে চলিতেছে—কৌমুদীতরঙ্গে শুভ্রফেনবৎ দুলিতে দুলিতে চলিতেছে। মেদিনীপুর-পূর্ব্ববাহিনী কাঁসাই তরঙ্গিনী চাঁদের হার বক্ষে পরিয়া কলনাদে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। মেদিনীপুরবাসী সকলেই নিদ্রিত ও সৌধমণ্ডলী দীপালোকশূন্য—কেবল তরঙ্গিনীর উপকূলে একটী মনোহর অট্টালিকার অন্তঃপুরস্থ দ্বিতলগৃহদ্বয়ের জানালা দিয়া এখনও দীপরশ্মি নির্গত হইতেছিল। অট্টালিকামধ্যে সকলেই সুষুপ্তির কোমলাঙ্ক আশ্রয় করিয়াছে, কেবল কতিপয় প্রাণীর চক্ষে এখনও নিদ্রা নাই—চুপি চুপি কথা কহিতেছে, নিঃশব্দে এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমনাগমন করিতেছে। এই নিশাচরদিগের মধ্যে একজন সুশ্রী পুরুষ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, উৎসুকমনে একাকী এক কক্ষ মধ্যে পদচারণ করিতেছেন। ইনিই এই সুরম্য হর্ম্ম্যের অধিকারী—হরেন্দ্রনাথ রায়।

হরেন্দ্রনাথ রায় মেদিনীপুরের জমীদার। তাঁহার জমীদারি বহু-গ্রাম বিস্তৃত, তন্মধ্যে অধিকাংশই খাসে, অবশিষ্টগুলি পত্তনিবিলি

করা হইয়াছিল। তিনি সামান্য জমীদার ছিলেন না। এই রূপ জনশ্রুতি যে তাঁহার প্রতাপে " বাঘে গরুতে " একত্রে জলপান করিত। হরেন্দ্রনাথ দেখিতে সুশ্রী, গৌরবর্ণও সদাই সহাস্যবদন কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ অসামান্য গম্ভীরভাব ধারণ করিত। তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন : পরোপকারিতা, প্রজাবাৎসল্য ও সহৃদয়তা। এতদ্ব্যতিরিক্ত কেহ কেহ বলিতেন যে তিনি অতি অমায়িক লোক, শিষ্টজনের প্রতিপালক ও দুষ্টের শাসনকর্ত্তা ; মাতৃভাষায় বিজ্ঞ, ইংরাজিভাষায়ও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন কিন্তু পারশ্যভাষায় তাঁহার কতদূর অধিকার ছিল কেহই বলিতে পারিত না পরন্তু মেদিনীপুরস্থ সকলেই জানিত যে তিনি একাধিক্রমে দুই বৎসর একজন গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্টকায়, আবক্ষঃপরিলম্বিশ্মশ্রুবিরাজিত মুসলমান মুন্সির নিকট চাহার দরবেস্ ও গোলেস্থান প্রভৃতি পুস্তক-সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন।

হরেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতেছেন—তাঁহার পদবিক্ষেপ অনৈসর্গিক ও ভাবভঙ্গী অপ্রাকৃতিক। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই চঞ্চল মন সুস্থির হইতেছে না—তাঁহার পক্ষে প্রতি মুহূর্ত্ত এক এক যুগের ন্যায় বোধ হইতেছিল। ক্রমশঃ তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল, তিনি নিঃশব্দে কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিলেন—পার্শ্ববর্ত্তী অপর কক্ষে কে কাতরস্বরে কহিল—ওগো প্রাণ যায় যে, আর সহ্য হয় না। স্বর অস্ফুট ও বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত। হরেন্দ্রনাথ থমকিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার অন্তরের অন্তরে আঘাত লাগিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল এবং উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে বারিধারা গণ্ডস্থলে বহিয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে স্বীয় বস্ত্র প্রান্তে চক্ষু মুছিলেন। ইত্যবসরে অপর কক্ষ হইতে আসিয়া একজন পুরুষ শ্রমাধিক্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন।

হরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল? এখনও বিলম্ব আছে, কেবল এইমাত্র উত্তর হইল।

উত্তরদাতার নাম বামাচরণ—হরেন্দ্রনাথের পারিবারিক চিকিৎসক। তাঁহার আকৃতি গম্ভীর, ললাট প্রশস্ত ও পাণ্ডুবর্ণ, নেত্রযুগল উজ্জ্বল—প্রতিভার চিরনিবাস, মস্তকের কেশ আকুঞ্চিত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় বিলক্ষণ সবল ও দৃঢ়। তিনি ইংরাজামতে চিকিৎসা করিতেন, নিঃসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তির নিকট দর্শনী-মুদ্রা গ্রহণ করিতেন না। মেদিনাপুরস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার নিকট উপকৃত ছিল এবং তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

হরেন্দ্রনাথ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কত বিলম্ব আপনি বিবেচনা করেন?

বামা। অধিক বিলম্ব নাই, বোধ হয় আর অর্দ্ধঘটিকামাত্র। অর্দ্ধ ঘটিকা! বিস্ফারিতনেত্রে ও উৎকণ্ঠিত-স্বরে হরেন্দ্রনাথ কহিলেন, উঃ! আরও অর্দ্ধ ঘটিকা!

বামাচরণ কোন উত্তর দিলেন না, উভয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বামাচরণ নিজ কটিদেশ হইতে একটী সুবর্ণময় ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি সস্মিত-বদনে হরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, চলুন এই বার আমরা উভয়ে যাই, সময় সন্নিকট।

হরে। মার্জ্জনা করুন, আমি স্বচক্ষে তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিব না, তাহার কাতরোক্তি শুনিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।

বামা। তবে আপনি অপেক্ষা করুন, কার্য্য সমাধা হইলেই আমি আপনাকে সমাচার দিব।

এই বলিয়া তিনি অপর কক্ষে নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন। হরেন্দ্রনাথ স্বীয় কক্ষে পূর্ব্ববৎ উৎসুকমনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

যেকক্ষে বামাচরণ প্রবিষ্ট হইলেন তথায় দুইটী দীপ জ্বলিতেছে—একটী উজ্জ্বল, অপরটী যাতনায় নির্ব্বাণোন্মুখ—পাণ্ডুবর্ণা কৃশাঙ্গী আলুলায়িতকেশে ভূমিতলে লুণ্ঠিতা, পার্শ্বে বসিয়া এক বৃদ্ধা ঔৎসুক নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছে। দীপ জ্বলিতেছে—উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিতেছে, ধরাশায়িনী রমণীর অন্তরও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিতেছে—মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িয়া পুড়িয়া জ্বলিতেছে। রমণীর দেহ আভরণ-বিরহিত ও ঘর্ম্মাক্ত তথাপি নিহারসিক্ত বাসি চাঁপাফুলের ন্যায় রমণীয়। অঙ্গের আবরণ-বস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে, লজ্জাশীলা অতি কষ্টে তাহা স্বস্থানে টানিয়া দিতেছেন। ক্রমে ক্রমে যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বের ন্যায় অস্ফুট ও কাতরস্বরে কহিলেন, ও মা!—লক্ষ্মি! আমি আর বাঁচিনা, এতকষ্ট কি সহ্য করা যায়!! রমণীকণ্ঠ যাতনাতিশয়ে রুদ্ধ হইল।

পার্শ্ববর্ত্তিনী বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

রমণী এবার ভগ্নস্বরে কহিলেন, ডাক্তার বাবু! আমাকে কি খাওয়ালেন? আমি আপনার কি করিয়াছিলাম,—আমাকে আর কষ্ট দিবেন না,—একবারে মারিয়া ফেল্লুন!

বামাচরণ বাধাদিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, আপনি অত উতলা হবেন না, অনতিবিলম্বেই আপনার এ যাতনা দূর হইবে। বামাচরণ এইমাত্র কহিয়া মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন, রমণীর কাতরোক্তি আর তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল না। তিনি সহসা বহির্গমনের নিমিত্ত কক্ষদ্বার অতিক্রম করিবামাত্র, রমণী মা গো! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বামাচরণ কক্ষমধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, রমণী মূর্চ্ছিতা—সংজ্ঞা নাই, স্পন্দ নাই, গাত্রের আবরণ-বস্ত্র শোণিতার্দ্র হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

ধুতুরা।

১

কেন গো সেজেছ তুমি যৌবনে যোগিনী,
কার ধ্যানে মগ্ন প্রাণে, চেয়ে আছ শূন্য পানে,
কি মন-বিরাগে হ'লে শ্মশান বাসিনী ?

২

ত্যজিয়ে সংসার সার করেছ শ্মশান,
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান ?

৩

যোগিনী দেখিয়ে ভয়ে অলি না সম্ভাষে,
দারুণ তোমার মন, কঠিন তোমার পণ,
অভিলাষ বিসর্জ্জন দেছ অনায়াসে।

৪

পরিমল নাই তুমি তাই কি কাতর,
অযতনে অভিমানে, এসেছ কি এই স্থানে,
এ ভীষণ ভূমে তোমা কে করে আদর ?

৫

কভু কি কোমল প্রাণে পেয়েছ যন্ত্রণা,
কার সনে কয়ে কথা, জানাও মরম ব্যথা,
কাঁদিলে পরাণ তব কে করে সান্ত্বনা ?

৬

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন যৌবন মন, যার তরে সমর্পণ,
আসন্ন সময়ে তারে দেখিতে কি পাবে ?

শ্রীগিঃ—

শিশির।

আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে আমাদের মস্তকের উপরিভাগ হইতে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান শূন্য ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পৃথিবী একটী বাষ্পময় আবরণে আবৃত, ঐ অদৃশ্য বাষ্পময় আবরণকে বায়ু কহে। যখন বাতাস "বয়" তখনই বায়ুর অস্তিত্বের অনুভব হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই পৃথিবী পাঁচটী ভৌতিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এমন কি মানবজাতিও পঞ্চভূতের সমষ্টি এইরূপ কহিয়াছেন এবং এই কারণেই মনুষ্যের মৃত্যু হইলে "পঞ্চত্ব প্রাপ্তি" হইয়াছে বলিয়া থাকে। এই পাঁচটী ভৌতিক পদার্থের নাম ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), অর্থাৎ ইহারা স্বতঃ উৎপন্ন এবং ইহাদিগকে কোনরূপে অন্য কোন পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। আধুনিক রসায়নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, উপরি উক্ত পাঁচটী পদার্থের গুণ স্বতন্ত্র এবং তাহারা ভৌতিক পদার্থ নহে। জল ও বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত অন্যান্য ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। জল অম্লজান (অক্সিজেন) ও উদ্‌জান (হাইড্রোজেন) নামক দুইটী বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে, বায়ু যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন) ও অম্লজানের সংযোগে উৎপন্ন।

উপরি উক্ত দুইটী পদার্থ ব্যতীত বায়ুতে অন্যান্য পদার্থ আছে, তদ্ভিন্ন ইহাতে সচরাচর জলকণা বাষ্পরূপে থাকে। ঐ জলবাষ্পের পরিমাণ সকল অবস্থায় সমান নহে। উত্তাপের তারতম্যানুসারে ও অন্যান্য কারণে উহারও তারতম্য হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শিশির।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে বায়ু জলকণা অধিক পরিমাণে ধারণ করিতে পারে এবং উত্তাপ কম হইলে বায়ুর জলকণাধারণশক্তি হ্রাস হইয়া যায়; সুতরাং ঐ বাষ্প জলকণারূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। ইহাতেই শিশির, কোয়াসা, মেঘ ও বৃষ্টি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। বাষ্প ও বায়ুতে এরূপ নিকট সম্বন্ধ আছে যে পরস্পর পরস্পরকেই ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ কোন বিস্তৃত জলভাগের উপর কিয়ৎক্ষণ বায়ু প্রবাহিত হইলে, উভয়েই উভয়ের কিয়দংশ শোষণ করিয়া লয়। যদি বায়ু ও জলে এরূপ সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে এই সংসার জীবোপযোগী হইত না, কারণ বায়ু জলকণা শূন্য হইলে পৃথিবীতে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং মনুষ্যজাতির পক্ষে বাস করা দুরূহ হইত।

আবার জল বায়ুশূন্য হইলে মৎস্যাদির জীবনধারণ হইত না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ু অম্লজান ও যবাক্ষারজান নামক দুইটী বাষ্পের সংযোগে উৎপন্ন, তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ অম্লজানই জীবের প্রাণরক্ষা করে। নিশ্বাস দ্বারা ঐ বাষ্প আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং তাহারই আভ্যন্তরিক কার্য্য দ্বারা আমাদের শরীর গরম থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, একটী বোতলে অম্লজান ও অপর একটীতে যবক্ষারজান পুরিয়া উভয়েরই মধ্যে একটী করিয়া কীট ছাড়িয়া দিলে অম্লজানের বোতলটীর কীট বাঁচিয়া থাকিবে ও

অপরটীর কীট মরিয়া যাইবে। যদি বায়ুর সহিত জলের মিশ্রণ-শক্তি না থাকিত তাহা হইলে মৎস্যাদি প্রাণরক্ষোপযোগী অম্লজান পাইত না, সুতরাং তাহাদের জীবনরক্ষা অসম্ভব হইত। যদি বল জল অম্লজান ও উদজানের সংযোগে উৎপন্ন তবে ঐ জল হইতেই মৎস্যাদি অম্লজান লইতে পারিত—তাহার উত্তর এই যে, জলে অম্লজান ও উদজান রাসায়নিক আকর্ষণে এরূপ মিলিত যে যন্ত্রসাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক করিতে পারা যায় না। এদিকে বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজান সামান্যরূপে মিশ্রিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক কার্য্য নাই, সুতরাং সহজেই একটী হইতে অপরটীকে পৃথক করিতে পারা যায়; এমন কি সামান্য নিশ্বাস গ্রহণে বায়ু হইতে অম্লজান, যবক্ষারজান হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যে বায়ুতে জলকণার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা একটী সামান্য উদাহরণে বোধগম্য হইতে পারে। সকলেই জানেন গ্রীষ্মকালে ভিজা কাপড় শীঘ্র শুকাইয়া যায় ও বর্ষাকালে কাপড় শুকাইতে অধিক বিলম্ব হয়। ইহার কারণ কি?—গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অধিক হওয়ায় বায়ুর জলকণাধারণ-শক্তি বৃদ্ধি হয়, তদ্ভিন্ন উত্তাপ দ্বারা জল সহজেই বাষ্পরূপে পরিণত হয়। কিন্তু বর্ষাকালে উত্তাপ কম হওয়ায় বায়ুর ঐ শক্তি কম হয়, সুতরাং অধিক জলকণা ধারণ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও অন্যান্য কারণ আছে তাহা বুঝিতে সাধারণ লোকদিগের পক্ষে দুরূহ হইবেক; তবে মোটামুটি এটী স্থির জানিতে হইবেক যে বায়ুতে কিছু না কিছু পরিমাণে জলকণা বাষ্পরূপে থাকে। এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোথা হইতে বায়ুতে এই জলকণা আসিল? ইহার উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। জলের একটী ধর্ম্ম এই যে, সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই বাষ্প-

রূপে পরিণত হয়। তবে কোন কালে অধিক কোন কালে কম। সাংসারিক অন্যান্য নিয়মের ন্যায় ইহারও ইতর বিশেষ আছে। জল অগ্নির তাপে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাষ্পরূপী হয়। এক থালা জল অমনি ফেলিয়া রাখিলে হয়ত দুইমাসে বা অধিক দিনেও বাষ্পরূপী হয় না; আবার যন্ত্রদ্বারা কোন পাত্র বায়ুশূন্য করিলে তন্মধ্যস্থ জল নিমেষমাত্রে বাষ্প হইবে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জল সকল অবস্থাতেই বাষ্প হইতে পারে। এই বিষয় বুঝিতে পারিলে সহজেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের পৃথিবীর বার আনা অংশ জল ও সিকি স্থল, সুতরাং জলের অপ্রতুল নাই। সূর্য্যকিরণে ও অন্যান্য কারণে সমুদ্র, হ্রদ, নদ, নদী ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল অনবরতই বাষ্প হইয়া তদুপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে। বায়ু কদাচ স্থির নহে, ইহা ক্রমাগত একস্থান হইতে অন্যস্থানে, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং ঐ বায়ুতে জলকণা বাষ্পরূপে মিশ্রিত রহিয়াছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে শিশির জন্মিবার প্রকৃত কারণ বিদিত ছিল না। ঐ সনে বিলাতের ডাক্তার ওয়েলস্ মহোদয় নানাবিধ পরীক্ষার পর যথার্থ কারণ আবিষ্কার করেন। তিনি একটী বাগানে মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রিতে এক বাণ্ডিল শুষ্ক পশম রাখিয়া দেন ও পরদিন প্রাতে দেখেন যে, শিশির পড়াতে ঐ পশমের ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, ফাঁকা জায়গায় শিশির অধিক পরিমাণে জন্মে এবং যদি আকাশ ও পৃথিবীস্থ পদার্থের মধ্যে কোন আবরণ থাকে তাহা হইলে শিশির জন্মিবার ব্যাঘাত হয়। এই বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কোন ফাঁকা স্থানে একটী টেবিল পাতিয়া তাহার উপরে কতকগুলি, ও নিম্নে সেই

পরিমাণের আর কতকগুলি পশম রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে দেখেন যে, টেবিলের উপরিস্থিত পশমের ওজন নিম্নস্থ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এই পরীক্ষা যদিও সামান্য বলিয়া বোধ হয় তথাচ ইহা হইতে গুরুতর আবিষ্কার হইয়াছে।

উপরি উক্ত পরীক্ষা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, শিশির বাষ্প রূপে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় না, কারণ তাহা হইলে টেবিলের নিম্নস্থ পশমে অধিক শিশির জন্মিত। শিশির বৃষ্টিরূপে আকাশ হইতেও পড়ে না কারণ পরিষ্কার রাত্রিতেই অধিক পরিমাণে উহা উৎপন্ন হয়। ওয়েল্‌স মহোদয় আরও অনেকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি পশমের পরিবর্ত্তে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেখিয়াছিলেন যে টেবিলের উপরিস্থ উত্তাপ তাহার নিম্নস্থ উত্তাপ অপেক্ষা অনেক কম। আর একদিন মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রিতে তৃণাবৃত ক্ষেত্রে একটী ও তাহার আড়াই হাত উৰ্দ্ধে শূন্যমার্গে আর একটী তদ্রূপ তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেখিয়াছিলেন যে, প্রথমোক্ত তাপমানের পারদ শেষোক্ত অপেক্ষা অনেক নীচে পড়িয়াছে অর্থাৎ প্রথমটীর উত্তাপ দ্বিতীয়ের অপেক্ষা কম। এই সকল পরীক্ষা দ্বারা ওয়েল্‌স মহাত্মা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীস্থ দ্রব্যাদির উত্তাপ হ্রাস হওয়াতে তদুপরিস্থিত বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, ঐ বাষ্প ঠাণ্ডা হইয়া জলবিন্দু রূপে আবির্ভূত হয়; ইহাকেই লোকে শিশির কহে। বাষ্প ঠাণ্ডা হইলে যে জল হয় ইহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক করে না। সকলেই জানেন যে জল গরম করিতে করিতে যখন ধূম উঠে ঐ ধূমের উপর শুষ্ক শীতল কোন ধাতুময় পাত্র ধরিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে ঘর্ম্মের ন্যায় বিন্দু বিন্দু জলকণ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে পৃথিবীর উপরিস্থিত দ্রব্যের উত্তাপ হ্রাস হইয়া শিশির জন্মে। এক তাল মাটি গরম করিয়া রাখিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কেন ঐ মাটীর তাল

ঠাণ্ডা হইল? পণ্ডিতেরা বলেন যে, ঐ মাটীর তাল গরম করিবার সময় উহাতে যে উত্তাপ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা উহা হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন কোন দ্রব্যের উত্তাপ প্রবেশ শক্তি অধিক আর যে দ্রব্য যে পরিমাণে উত্তাপ "গ্রাস" করে সেই পরিমাণে আবার সেই উত্তাপ "বমন" করে;—অর্থাৎ যে দ্রব্যে অধিক উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে সেই দ্রব্য হইতে সেই পরিমাণে উত্তাপ বহির্গত হয়। আমাদের পৃথিবী ও তদুপরিস্থিত তৃণ পত্রাদিরও ঐ গুণ আছে। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ হইতে যে সমস্ত উত্তাপ উহারা গ্রাস করে, সূর্য্য অস্ত গেলে সেই উত্তাপ বমন করে এবং ঐ উদ্গত উত্তাপ শূন্যমার্গে ছড়াইয়া যায়। এমতে পৃথিবীর উপরিস্থ দ্রব্যাদি এত শীতল হয় যে তৎসংলগ্ন বায়ু ঠাণ্ডা হইয়া ঐ বায়ুস্থ বাষ্প জমিয়া জলরূপে পরিণত হয়। *

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সকল কালে বা সকল দিনে সমান রূপ শিশির পড়েনা কেন? আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি পরিষ্কার রাত্রিতে ও ফাঁক জায়গায় শিশির প্রচুর জন্মে, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে কম। তাহার কারণ এই যে, সন্ধ্যার পর পৃথিবী হইতে যে

* ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে একটা কাচের গেলাসে জল পুরিয়া তাহাতে বরফ দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ গেলাসের গাত্রে জলকণা দৃষ্ট হয়। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে গেলাসের ভিতরস্থ জল চুয়াইয়া গাত্রে বহির্গত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে জল ও পাত্র সকলই বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয়, সুতরাং তৎসংলগ্ন বায়ুও ঠাণ্ডা হইয়া তাহাতে যে বাষ্প থাকে ঐ বাষ্প জমিয়া গেলাসের গাত্রে জলবিন্দু রূপে আবির্ভূত হয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শিশির উৎপত্তির ও উপরি উক্ত গেলাসের গাত্রে জলকণা জন্মিবার কারণ একই, তবে পৃথিবী হইতে উত্তাপ উত্থিত হইয়া ঠাণ্ডা হইতে বিলম্ব হয়, গেলাসে বরফ থাকাতে অতি অল্প সময়ে তৎসংলগ্ন বায়ু শীতল হয় এইমাত্র প্রভেদ।

উত্তাপ উত্থিত হয় তাহ মেঘ বা অন্যরূপ প্রতিবন্ধক পাইলে শূন্য-মার্গে ছড়াইতে না পারিয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এমতে তদুপরিস্থ দ্রব্যাদি আবার গরম হয়। বৃষ্টি হইলে পর বর্ষা-কালে মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গুমট গর্ম্মি ও শীত কালে মেঘলা রাত্রিতে কম শীত হইবার ইহাই প্রধান কারণ। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শিশির দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মকালে দিবসের পরিমাণ রাত্রি অপেক্ষা অনেক অধিক, সেইজন্য দিবসে যে পরিমাণ উত্তাপ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয় রাত্রিতে ঐ উত্তাপ বহির্গত হইতে না হইতেই আবার সূর্য্যোদয় হয় সুতরাং শিশির জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

গ্রীসান পণ্ডিত আরিষ্টটল বলিয়া গিয়াছেন যে স্থির রাত্রিতেই শিশির দৃষ্ট হয়, কিন্তু ওয়েলস মহোদয় বলেন যে, যদি আকাশ মেঘশূন্য থাকে তাহা হইলে বাতাস বহিলেও, কিম্বা বায়ুশূন্য রাত্রিতে মেঘ থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণে শিশির জন্মিতে পারে। বস্তুতঃ যদি মেঘ পৃথিবী হইতে অনেক উচ্চে থাকে তাহা হইলে অল্প অল্প বাতাস বহিলেও শিশির জন্মিয়া থাকে; সুতরাং বায়ুর স্থিরতা শিশির জন্মিবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় নহে।

ডাক্তার ওয়েলস আরও বলেন যে, যেদিন প্রাতঃকালে কোয়াসা দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে শিশির প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাহার কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করেন যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে বায়ুতে অধিক জলবাষ্প না থাকিলে প্রাতঃকালে বাতাস কোয়াসা দ্বারা কলুষিত হইতে পারে না। আরও যদি রাত্রিতে মেঘ থাকে ও প্রত্যূষে মেঘ কাটিয়া যায় তাহা হইলেও শিশির অধিক হয়, কারণ মেঘ নিবন্ধন রাত্রিতে বায়ুস্থিত জলবাষ্প যেমন তেমনি থাকে, জমিতে পারে না, প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার হইলেই ঐ বাষ্প জমিয়া যায়।

আবার শিশির সকল দ্রব্যে সমানরূপে জন্মিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে দ্রব্য সূর্য্যকিরণ হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ যে দ্রব্যে উত্তাপ অধিক প্রবিষ্ট হয় সেই দ্রব্যেই শিশির অধিক জন্মে। পৃথিবীর উপরিস্থিত ঘাস ও বৃক্ষলতাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার ইট, প্রস্তর ও কাঁকরাদির এই গুণ কম, এজন্য উহাদের উপর শিশির অধিক জন্মে না।

আবার কতকগুলি দ্রব্য আছে তাহাদের মধ্যে উত্তাপ প্রবিষ্ট হইলে থাকিতে পারে না, উহাদের উপর উত্তাপ পড়িলেই তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে ছড়াইয়া যায় অথবা সেই দ্রব্যের নিকটস্থ নিম্নস্থ বা উপরিস্থ বা পার্শ্বস্থ অন্যান্য দ্রব্যে উত্তাপ প্রদান করে। ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। উহাদের উপর শিশির অধিক জন্মিতে পারে না। কাচ, তুলা, পশম, পালক ও খড় প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য উত্তাপ সম্বন্ধে ধাতুর ঠিক বিপরীত, সুতরাং উহাদের উপর শিশির অধিক জন্মায়।

উচ্চতার তারতম্যানুসারে শিশিরোৎপত্তির তারতম্য হইয়া থাকে। কতকগুলি পশম মাটীর উপর ও সেই পরিমাণে আর কতকগুলি পশম দোতালার ছাতে রাখিলে নীচেকার পশমে শিশির অধিক জন্মিবে। কারণ নিম্ন হইতে সন্ধ্যার পর যে উত্তাপ উত্থিত হয়, ঐ উত্তাপ ঊর্দ্ধে উঠিয়া ছাতের উপরের বায়ু নিম্ন অপেক্ষা গরম রাখে সুতরাং তথায় অধিক শিশির জন্মিতে পারে না।

শিশির প্রাতঃকালেই অধিক দৃষ্ট হয় এবং সূর্য্যোদয় হইলে উত্তাপ বৃদ্ধি সহকারে উহা আবার বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

পৃথিবী হইতে উত্তাপ উত্থিত হইয়া কখন কখন এত ঠাণ্ডা হয় যে শিশির জমিয়া বরফ হইয়া যায়; উহাকে ইংরাজিতে “হোরফ্রষ্ট” (**Hoarfrost**) বলে। ক্রমশঃ

দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রসর।

প্রথমতঃ সকল দর্শনেই সৃষ্টি বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং "অবস্তু দ্বারা বস্তুসিদ্ধি" * "অসৎ হইতে ভাব বেত্তি" কিম্বা "সৎ হইতে অভাব বেত্তি" † কোন সূত্রেই সম্ভব বলিয়া উক্ত হয় নাই। সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় সকলেই লিখিত আছে যে কতিপয় অবিনশ্বর ভূত সমূহ হইতে এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইতে পদার্থ-জ্ঞান বিষয় অনুধীত হইয়াছে। ইয়ুরোপে এই বিষয়ে দুইটী ভিন্নমত প্রচলিত আছে। একদল ভূয়োদর্শন হইতে আমাদিগের জ্ঞানের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন আর একদল আমাদিগের ভূয়োদর্শনাতিক্রান্ত জ্ঞানভূত বিষয়ের অবধারণা স্বীকার করেন। এই দুই বিভিন্ন বাদিত্ব পুরাতন গ্রীসে আরিস্তূতলীয় এবং এলিয়াটিক সম্প্রদায়ে প্রথম দৃষ্ট হয়। আধুনিক ইয়ুরোপে "বস্তু বাদী" ও "নাম বাদী" দিগের (**Realists and Nominalists**) মধ্যে এই পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে। "সঙ্গতিমূলকতা" ও ইন্দ্রিয়-বোধমূলকতা (**Rationalism and Sensationalism**) দর্শনের এই দুইটী বিভিন্ন শাখা বিস্তৃত হইতেছে। লক এবং হার্টলি সম্প্রদায়, মিল, কোমৎ, বেন ও লুইসের ন্যায় বাগ্মিতা এবং দক্ষতা সহকারে মানবজ্ঞানের পরীক্ষামূলক উৎ-

---

* "A thing is not made out of nothing

† "Neither does something arise from nothing, nor does nothing arise from something."

পত্তির পোষকতা করিয়াছেন। আবার ক্যাণ্ট, হ্যামিল্টন এবং কোজিন্ সম্প্রদায় সমুচিত আগ্রহ ও তর্ক দ্বারা আমাদিগের অপরিহার্য্য জ্ঞানবৃত্তির চরম (**transcendental**) উৎপত্তি রক্ষা করিতেছেন। ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে তদনুরূপ দুই প্রধান বৈষম্য ভারতবর্ষীয় দার্শনিক-গণের মধ্যেও লক্ষিত হইবে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহা দেখা যায় যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণ ভূয়োদর্শন ব্যতীত অন্যরূপ জ্ঞানহেতু কল্পনা করেন নাই। যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যাহা শব্দ-বোধ ও উপমান দ্বারা জ্ঞেয় তাহাই আমাদিগের জ্ঞানের সমষ্টি বলিয়া পূর্ব্বতন হিন্দুরা স্বীকার করিয়াগিয়াছেন। নাস্তিক চূড়া-মণি চার্বাক কেবল প্রত্যক্ষের উপর সম্পূর্ণ আস্থা দেখাইয়াছেন এবং অনুমানে কোন নিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। ভারতে চার্বাকের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া কেহ এরূপ মত উদ্ভাবন করেন নাই যে আমাদিগের কতকগুলি জ্ঞানভূত বিষয় স্বতঃসিদ্ধ এবং অখণ্ডনীয়। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে যদ্যপি আমরা কতকগুলি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখি তাহা হইলে আমাদিগের ভূয়োদর্শনসিদ্ধ প্রসঙ্গ সকল হইতে তদসিদ্ধ প্রসঙ্গের অনুমান করিতে পারি।

প্রাচীন হিন্দু ষড়-দর্শনেই প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্য বলিয়া গৃহীত হই-য়াছে। বৈশেষিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ; সাঙ্খ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-বোধ ; ন্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ-বোধ ও উপমান ; মীমাংসায় ও বেদান্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ-বোধ. উপমান, অর্থাপত্তি ও অভাব এই কয়টী যথাক্রমে জ্ঞান-দ্বার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই-রূপে দৃষ্ট হইবে যে "প্রত্যক্ষ" সকলেরই অভিজ্ঞাত ; আর ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে, যে অবশিষ্ট সকলগুলিই অনু-মানের অন্তর্গত। এই অনুমান বিষয়ে হিন্দুরা যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে পদার্থ বিচার, (**Categories**) হেতু-

মীমাংসা (**theory of causation**) এবং তদানুষঙ্গিক ঈশ্বর-তত্ত্ব-নির্ণয় প্রসিদ্ধ। হিন্দুরা এই অনুমানখণ্ডে যে তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আধুনিক ইয়ুরোপের উন্নয়নসাপেক্ষ তর্কভুক্ত; * সাদৃশ্য ও বৈষম্য প্রণালী, ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ † প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মত স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক ইয়ুরোপীয় গবেষণার অনুমোদিত। সেই সকল মতের অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁহারা উক্ত তর্কশাস্ত্রে যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। পদার্থবিচার ও হেতু-মীমাংসা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে নৈয়ায়িকেরা বস্তুবাদী ছিলেন এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে "নামবাদী" কেহই আদরণীয় হন নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সাঙ্খ্য ও বেদান্তের হেতু-মীমাংসায় যে কার্য্যকারণ বিষয়ক পরস্পর সাদৃশ্য বিবৃত আছে তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হ্যামিল্টনের ন্যায় সূক্ষ্ম দার্শনিকও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্ন হেতু-মীমাংসার সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বদ্ধ। বেদান্তে উল্লেখ আছে যে একজন মহাপুরুষ হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সাঙ্খ্যকার এক প্রকৃতি এবং বহু আত্মা স্বীকার করিয়াগিয়াছেন। পাতঞ্জলি সাঙ্খ্যের এই মত গ্রহণে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসায় কথিত আছে, ঈশ্বর শব্দময় এবং মন্ত্রে তাঁহার অধিষ্ঠান।

আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা পরমার্থ, মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং

* Inductive logic.

† "The pervading is predicable of any thing of which pervaded is." ন্যায়।

তর্ক বিদ্যার অনুধ্যানে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের ভূয়সী আলোচনা হইতেছে। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীবতত্ত্ব এবং তদানুষঙ্গিক মিশ্রগণিত, শরীরতত্ত্ব, ছেদবিদ্যা প্রভৃতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধিত হওয়াতে অনেক বিষয়ে নূতন আলোক বিকীরিত হইয়াছে। সেই আলোক প্রভাবে বহু শাস্ত্রীয় তমসাবৃত, গূঢ়, অপরিজ্ঞেয় অংশ সকলের সুন্দর পর্য্যবেক্ষণ হওয়াতে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে যে সকল মহাফলপ্রসবী জ্ঞানতরুর বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং যাহাদিগের কতকগুলি কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া ফলপ্রসবোন্মুখী হইয়াছিল সেই সকল বাল ও কিশোর তরু দুরন্ত-কাল-দংষ্ট হইয়া জর্জরিত অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ নির্ব্বাণোন্মুখ জ্যোতিঃ এখনও হতভাগ্য আর্য্য সন্তানগণের মনে পূর্ব্ব মহাপুরুষগণের রোপণ-কৌশল এবং অপার যত্নের মহিমা ক্ষণে ক্ষণে প্রকটিত করিতেছে। হতভাগ্যেরা থাকিয়া থাকিয়া বিস্মিত ও চকিত হইতেছে—আবার পুনরায় ঘোর অন্ধকার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিতেছে। আমরা সেই দুঃখময় দৃশ্য হইতে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাতীচ্য আলোকময় ভূখণ্ড পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বেই যে "নামবাদী" ও "বস্তুবাদী" নামে সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে শেষোক্তদলের সহিত হিন্দুদার্শনিকগণের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত-দলের নায়ক জর্ম্মনির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্যাণ্ট, দর্শনের উদ্দেশ্য বিষয়ে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত দর্শনশাস্ত্রীয় প্রশ্ন সকল কিরূপে মীমাংসিত হইতেছে, এবং ঐরূপ মীমাংসা বিষয়ে

কোন্ কোন্ দার্শনিকেরা সহায়তা করিয়াছেন তাহার স্বল্প বিবৃতি করিব।

ক্যাণ্ট বলেন যে " আমি কি জানিতে পারি ? আমার কি করা উচিত ? আমি কি আশা করিতে পারি ? " এই তিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শেষোক্ত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা প্রথম প্রশ্নটীর মীমাংসাভূত: যে হেতু সঙ্গত আশা এবং নৈতিক কর্ম্ম, বিশ্বাসের উপর স্থাপিত আছে এবং যদি কোন বিশ্বাসের অন্তর্ভূত বিষয় সম্ভবজ্ঞানের সীমা-মধ্যগত না হয় এবং তদ্বিষয়ক প্রমাণ ভূয়োদর্শনোক্ত বিষয় গুলিকে সম্ভবযোগ্যতার প্রতিভূস্বরূপে প্রতীত না করে তাহা হইলে সেই বিশ্বাস কখনই নিশ্চিত রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

প্রধানতঃ বলিতে হইলে "আমি কি জানিতে পারি? " এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইলে দর্শন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিন্নশাখারূপে প্রভেদ নিরাকৃত হয়। সাধারণতঃ গাণিতিক, পাদার্থিক, কিম্বা জৈবনিক যে কিছু বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায় তাহাতে " আমি কি জানিতে পারি ? " এই প্রশ্নে মানবজাতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিয়াছেন উহা তাহাদেরই সমষ্টি—উহা চিন্তাশীল মনের কার্য্যফল। ঐ সকল মানসিক ব্যাপারভুক্ত প্রধান নিয়ম সকলের মূলভিত্তি অন্বেষণ করাই দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার।

যদি ও দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্যহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যান্য শাখা সমূহ হইতে ইহার ভিন্নতা সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে ইহার অন্তর্ভূত বিষয়ের প্রকৃতি হইতেই দর্শন শাস্ত্র একটী বিজ্ঞান শাখার সহিত দৃঢ় রূপে ও অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। কারণ " আমি কি জানিতে পারি ? " এই প্রশ্নের উত্তর

দিতে হইলে প্রথমে "জ্ঞান" এই শব্দ দ্বারা কি বুঝাইতেছে সেই বিষয়ে বোধ থাকা কর্ত্তব্য, এই বিষয় স্থিরীকৃত হইলে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হই এই বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত; ইহার প্রত্যুত্তরে এই প্রশ্ন উঠে যে জ্ঞাতব্যের সীমা আছে কি না। পরিশেষে "আমরা কি জানিতে পারি?" এই বাক্যে কেবল মাত্র অতীত কিম্বা বর্ত্তমান জ্ঞানের উল্লেখ হইতেছে এমত নহে, আমরা যাহাকে ভবিষ্যজ্ঞান কহি, তাহারও উল্লেখ হইতেছে। আরও ইহা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক আমাদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে আশার চালনায় প্রত্যয় করিবারই বা প্রমাণ কি?

বাহুল্য ব্যতিরেকে ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে যে মানসিক বৃত্তি সমূহের পরীক্ষা এবং উহাদিগের মধ্যে কোন গুলিকে জ্ঞান বলে তাহার নিরূপণ ব্যতিরেকে প্রথম প্রশ্নটী অনুশীলনীয় নহে। দ্বিতীয় প্রশ্নটী ও অন্যরূপে বুঝান যাইতে পারে না, কারণ কেবল জ্ঞানের বৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা কিরূপে জ্ঞান বাড়িতেছে তাহা আবিষ্করণে আশা করিতে পারি। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমোক্ত দুইটীর গবেষণাপ্রাপ্ত যুক্তিসমূহের তর্কভূত।

"আমি কি জানিতে পারি?" এই প্রশ্নটী যে চারিটী প্রশ্নাংশে বিভক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে তিনটীর উত্তর দিতে হইলে আমাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহের যে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহার ফল সমূহ মনস্তত্ত্বে নিহিত আছে।

মনস্তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব কিম্বা জীবন-বিজ্ঞানের এক অংশ। উক্ত বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ হইতে ইহার প্রভেদ এই যে ইহা জীবনের আত্মগত ব্যবহার সমূহের (Psychical phenomena) বর্ণনা করে, পদার্থগত ব্যবহার সকলের (physical phenomena) ইহাতে কোন উল্লেখ থাকে না।　　　　　ক্রমশঃ

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ।

গম্ভীর আরাবে ভেরী ভেদিল গগনে,
বাহিরিল কুলনারী, ধরি হাত সারি সারি,
গাইল মঙ্গল গীত মলিন বদনে ;
কথা না সরিল কার, না ঝরিল অশ্রুধার,
কেবল বহিল শ্বাস, মিশাল পবনে,
নীরবে বিদায় দিল নয়ন নয়নে।

২

কাতার কাতার সেনা আনত আননে,
রাখি প্রাণ কায়া চলে, ফিরিল রমণীদলে,
নূপুর কিঙ্কিণী রোল ভাসে সমীরণে ;
অধীর হৃদয় বীর, শ্বাস হীন রহে স্থির,
অধীর ডাকিল ভেরী গভীর গর্জ্জনে,
নড়িল চলিল ঠাট হল্‌দিঘাট রণে।

৩

ঝন ঝন চলে সেনা কাতার কাতার,
মরমে দারুণ ব্যথা কেহ না কহিল কথা,
রয়েছে কিঙ্কিণী-ধ্বনি শ্রবণে সবার ;
রক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত, দীর্ঘশ্বাস কদাচিত,
কদাচিৎ কেহ করে স্পর্শ তরবার,
পশ্চাৎ ফিরিয়া কেহ না চাহিল আর !

৪

ভৈরব ভেরীর রব আবার অম্বরে,
কাঁপাইয়ে ধর ধর, ডাকে ঘন "অগ্রসর"
চমকিল প্রতিধ্বনি সে ভীষণ স্বরে!
মত্ত তনু বীরমদে, চলে সেনা দ্রুতপদে,
অস্ত্রের ফলক ঝকে নব দিনকরে,
সঘনে কাঁপিল ধরা বীর-পদভরে।

৫

শতমুখে নদ যথা প্রবেশে সাগরে
শতমুখে বহি ঠাট, প্রবেশিল হল্‌দিঘাট,
অদূরে যবন-ধ্বজ ভাতিল অম্বরে;
প্রতাপ সমরে ধীর, চৈতক-আরোহী বীর,
কহিল সম্বোধি সেনা সুগভীর স্বরে,—
"হের দেখ উপনীত যবন সমরে।"

৬

নীরব হইল বীর শ্বাস না বহিল,
নীরব সলিল, স্থল, নীরব অচল, চল,
নীরব গগনে স্থির সমীর হইল।
নীরব রবির কর, পড়িল ধরণীপর,
নীরব বাহিনী, তাপে মরম দহিল,
বারেক নিরখি রবি নীরব রহিল।

৭

হেনকালে অদূরে উঠিল সিংহনাদ,
সাগর যেমতি ঝড়ে, যবন কটক নড়ে,
সাগর কল্লোল জিনি দুন্দুভি-নিনাদ,

প্রাণে জাগে অপমান, মানসিংহ আগুয়ান,
বেষ্টিত শিক্ষিত সেনা হৃদে রণ-সাধ,
উল্লাসে উন্মত্ত সবে আসন্ন বিবাদ।

৮

গভীরে কহিল রাণা—"বিলম্ব কি আর" ;
করি মহা গণ্ডগোল, সমরে বাজিল ঢোল,
"অগ্রসর" ভেরীরব গর্জ্জিল আবার ;
প্রলয় কল্লোল উঠে, বদ্ধ বায়ু যেন ছুটে,
রণরঙ্গে ধায় সেনা ধূলায় আঁধার,
জলদ-গর্জ্জন জিনি ঘন হুহুঙ্কার।

৯

বাধিতে সৈন্যের স্রোত সতর্ক যবন,
শ্রেণীবদ্ধ দৃঢ়মত, বিস্তৃত প্রাচীরবত,
সহস্র কামান করে অনল জৃম্ভন ;
মুখেতে শমন বসে, নাদে গিরিশির খসে,
ধূলা সহ মিলি ধূম ছাইল গগণ,
ঘোর রোল রণঢোল জীমূত-গর্জ্জন।

১০

পুনঃ পুনঃ কালানল চপলা কিরণ,
পুনঃ পুনঃ ভীমনাদ, বাড়িল সমরসাধ,
সিংহনাদ করে রণে রাজপুতগণ ;
ধূলায় দিবস নিশা, প্রকাশ না পায় দিশা,
বীরদাপে এক চাপে করে আক্রমণ,
বারিতে যবন যত্ন করে প্রাণপণ।

১১

সংগ্রামে প্রবেশে রাণা চৈতক বাহন,
তীর তারা উল্কাপ্রায়, বলবান বাজী ধায়,
যথায় বারণপৃষ্ঠে আকুবরনন্দন ;
করিবারে রিপুজয় সমরদীক্ষিত হয়,
করিকরে পদদ্বয় করে উত্তোলন,
রাণা হানে ভল্ল, জিনি দামিনী-গমন।

১২

কাঁপর হইল রণে আকুবরনন্দন,
মুখে হাহাকার রব, ধাইল যবন সব,
প্রাণ উপেক্ষিয়ে করে রাণারে বেষ্টন ;
রাণা করে ঘোর রণ, ধূমহীন হুতাশন,
শত শত পড়ে, ধরা করিয়ে ছাদন,
চারিদিকে ক্ষত্রিয় করিল আক্রমণ।

১৩

ঘোর রণে মিশামিশি ক্ষত্রিয় যবন,
ঘন ঘন হুহুঙ্কার, ঝাঁকে ঝাঁকে তরবার,
উঠে পড়ে মেঘে যেন দামিনী-কিরণ ;
অসংখ্য যবনগণ, অনেক করিল রণ,
ক্ষত্রিয় বিক্রম নারে করিতে বারণ ;
কে বারে সাগরে, বদ্ধ করে সমীরণ ?—

১৪

মানসিংহ কহে সেনা সম্বোধি তখন,
" হের দেখ রণরঙ্গ, যবন হইল ভঙ্গ,
দেখনা সমরে রাণা সাক্ষাৎ শমন ;

কি দেখ কি দেখ আর, রণে হও আগুসার,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব যুদ্ধে দাও মন.
বীর্য্যবান, রাখ মান, রাখ সিংহাসন।"

১৫

"জয় মানসিংহ" শব্দ উঠিল গগণে,
রক্তধারা বহে গায়, প্রতাপ ফিরিয়ে চায়,
গম্ভীরে কহিল বীর সম্বোধি স্বগণে ;—
"হে সেনা সমরদক্ষ, দেখনা বিপক্ষপক্ষ,
কুলাঙ্গার রাজপুত মানসিংহ সনে,
সচল প্রাচীর সম প্রবেশিছে রণে।"

১৬

গম্ভীরে কহিল রাণা, রহিল না আর,
জ্বলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে রাণা-সেনা ধায়,
চারিদিকে রণসিন্ধু, উথলে আবার ;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝণাৎকার, ঘন ঘন হুহুঙ্কার,
রুধির প্রয়াসী অসি মণ্ডল আকার,
ছিন্নশির, ধনুর আকার রক্তধার।

১৭

পুনঃ পুনঃ রাণা-সেনা করে আক্রমণ
মানসিংহ রণ-ধীর, সসৈন্য রহিল স্থির,
না হেলিল না টলিল একটী চরণ ;
ভাবিল প্রতাপ রায়, রণে বিসর্জ্জিব কায়,
প্রবেশিল অরিমাঝে ভেদি সৈন্যগণ,
মেঘমালা মাঝে যেন মধ্যাহ্ন তপন।

১৮

পূর্ণচন্দ্রছটা শিরে ছত্র শোভাপায়,
সেই ছত্র লক্ষ করি, অসংখ্য অসংখ্য অরি,
অস্ত্র বরষিল যেন বারি বরিষায় ;
অরি করি তৃণজ্ঞান, ফিরে রাণা বীর্য্যবান,
ঝলকে দলকে অসি দামিনীর প্রায়,
হস্ত পদ মুণ্ড স্কন্ধ ধরণী লুটায়।

১৯

সংগ্রাম হেরিল দূরে, ঝল্লার সর্দ্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমর দক্ষ,
বিপক্ষ-বেষ্টিত, অঙ্গে বহে রক্তধার ;
রক্ষিতে প্রতাপ রাজে, প্রবেশিল অরিমাঝে ;
শীঘ্র ছত্র লয়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণা জ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার।

২০

অমিত-বিক্রম বীর, ঝল্লার সর্দ্দার,
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার,
শতহস্তে চালে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার ;
অসংখ্য অরির ঘায়, ক্রমে অবসন্ন কায়,
পড়িল সংগ্রাম স্থলে করি মহামার,
বীরসাজে বৈরিমাঝে বীর অবতার।

২১

জ্বলে জ্বলে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান ঘূর্ণবায়ু, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্রমন্থন করি ফণীন্দ্র বিকল ;

ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে,
অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল,
হলদিঘাট ইতিহাসে রহিল কেবল।

শ্রীগিঃ—

উন্মত্ত যুবক।

(শ্রীমতী [illegible] সরস্বতী প্রণীত।)

বসন্তের প্রারম্ভ ; শীতের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। সায়ংমুখ দিনমণির সুবর্ণ কান্তি পশ্চিমাকাশে লাগিয়া রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অবনী ধূসর বস্ত্রে পল্লব-কুসুম-ভূষিত স্বকীয় সৌন্দর্য্যরাশি অবগুণ্ঠনে আবৃত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি সুন্দরী ইন্দীবরোপম সুনীল আকাশরূপ চন্দ্রাতপে ঝাড়, লাণ্ঠন, বেললাণ্ঠন, দুই একটী করিয়া জ্বালিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রাচী হাসিয়া উঠিল। নক্ষত্রাবলী ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে সুখদৃশ্য জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ গোলক উদ্ভাসিত। প্রিয়-সমাগমে কুমুদিনীর আহ্লাদের সীমা নাই—প্রথমে সলজ্জ ঈষৎ হাস্য, পশ্চাৎ অট্টহাসে ঢলিয়া পড়িল। বট অশ্বত্থ প্রভৃতি তরুগণের নবোদ্গত-পল্লবরাজি চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ অমৃতময় রশ্মি মাখিয়া বসন্তবায়ুর সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে রজনী গভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। বিশ্রামার্থ ধরণী, দিবসকার্য্যশ্রান্ত সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিদ্রিতা হইলেন। আকাশ নিঃশব্দ, কেবল দিবাকর-

করদগ্ধা পৃথিবীর তাপ নিবারণার্থ মলয় সমীর শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে কোকিলকাকলী অর্দ্ধ নিদ্রিত জীবগণের কর্ণকুহরে মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে। নিদ্রাকাতর পাদপ-শ্রেণী বাতাভিঘাতচ্ছলে থাকিয়া থাকিয়া তন্দ্রাবেশে শিরঃ কম্পন করিতেছে। সময়ে সময়ে বাতকম্পনে হরিন্মণিনিভ-বৃক্ষ-পত্র-ভ্রষ্ট খদ্যোতিকাপুঞ্জ, চূর্ণীকৃতপতন্নক্ষত্ররাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া দর্শকের মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে। নিশাচর জন্তুগণ ক্ষণে ক্ষণে ভীষণরবে দিগঙ্গনাগণকে জাগরিত করিয়া নিদ্রিতা বসুধারাণীর প্রহরীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

এতাদৃশী সুখময়ী রজনীতে কাহার সুখ নাই? কোন জন এমন হতভাগ্য যে এই শান্তিস্বরূপা, কলধৌতনিভামলচন্দ্রিকাবসনা সর্ব্বরীতেও অসুখী? নরহন্তা, পরশ্রী কাতর, নিন্দুক, বিষময়বিষম-বিষয়সন্তাপতাপিত, প্রোজ্জ্বলিতচিতানলসমপুত্রশোকদগ্ধা জননী, হৃদয়প্রতিমপ্রিয়তমপতিবিয়োগবিধুরা কামিনী, সকলেই সুখী—নিদ্রা শান্তিপ্রদা সকলেরই দুঃখ কাড়িয়া লইয়াছে—সকলেরই হৃদয়ে শান্তির একাধিপত্য। তবে কোন্ অপরাধে ঐ বটবৃক্ষতল-শায়ী যুবক সেই সর্ব্বসন্তাপনাশিনী শান্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, নিদ্রার অপ্রতিহত প্রভাবও ইঁহার নিকট প্রতিহত, যুবা গগণাশক্ত-লোচনে হৃদয়ের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, দিবানিশা বিস্মৃত হইয়াছেন? বয়স অপরিণত, পঞ্চবিংশতিবর্ষের ঊর্দ্ধ নহে। আজিও যৌবনের চিহ্ন সকল সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। এইকালে কতই সুখের আশা মনোমধ্যে উদিত হয়। পৃথিবী নিত্য নূতন ভাব ধারণ করিয়া যুবকের মন মোহিত করিতে থাকে। গুণবৃক্ষকবদ্ধগুণের ন্যায় আশা-রজ্জু নূতন গৃহীকে কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। যুবা সেই সমস্ত নৈসর্গিক সত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কৌষেয় বস্ত্রের পরি-

বর্ত্তে কাষায় পরিধান, অঙ্গরাগের পরিবর্ত্তে ভস্মলেপন, চিকুর বিন্যাসের বিনিময়ে জটাবন্ধন, বাহিরে যৌবন—হৃদয়ে বার্দ্ধক্য, যুবা যৌবনে সন্ন্যাসী। রূপবানের সৌন্দর্য্য লুকাইবার নহে সে যখন যে বেশ ধারণ করে তাহাই সুন্দর—তাহাই মনোহর। মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রমার ন্যায় যুবার ভস্মাচ্ছাদিত সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যুবা বৃক্ষতল হইতে গাত্রোত্থান এবং চকিতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া সমীপস্থ একটী নদীর সৈকতময় কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতীর শীকরসম্পৃক্তমারুতসেবনে যুবা সমস্ত দিনের অধ্বশ্রম বিস্মৃত হইলেন। তাহার স্বচ্ছ সলিল মধ্যে চন্দ্রিকালোক প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। প্রতিবিম্বচ্ছলে তারানাথ প্রেয়সীগণের সহিত অবরোহণ করিয়া যেন জলক্রীড়া করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্রবিম্ব তরঙ্গাঘাতে শতধা বিভক্ত হওয়ায় চঞ্চল-চন্দ্রমাশত-মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া ভাবুকের ভাবস্রোত উচ্ছ্বলিত করিতেছে।

যুবা প্রকৃতির এবম্ভূত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিয়া হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।—অয়ি প্রকৃতে! তোমার ভুবনবিমোহন রূপ চিরপ্রসিদ্ধ, অতি পুরাকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি তোমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। তুমি কত তাপিত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিয়াছ, কিন্তু এই হতভাগ্যের প্রতি এত বিমুখ কেন? তোমার অলোক সামান্য রূপ-লাবণ্যে আমার চিন্তাজর্জ্জরিত অসার হৃদয় আকৃষ্ট হয় না কেন? অদ্য তিনবর্ষ হইল, দেশে দেশে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেছি। অদ্য তিনবর্ষ হইল, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু ও বান্ধবগণের স্নেহরজ্জু ছিন্ন করিয়া

উন্মত্তের বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। অয়ি প্রকৃতে! তোমার সহিত আমার যত পরিচয় এত তো কাহারই সঙ্গে নহে; তোমার প্রদত্ত ফল মূলাদিই আমার প্রধান খাদ্য, তোমার দত্ত তৃণাচ্ছন্ন ভূমিই আমার নিদ্রাতল্প ও উপবেশনার্থ আসন, তোমার দত্ত গিরিগুহা ও বৃক্ষতল আমার বাসগৃহ, তোমার মোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নের উপর সতত ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কৈ হৃদয়ের মধ্যে ক্ষণ-কালের জন্যেও তো স্থান পাইতেছে না? কত পর্ব্বত-শ্রেণী অব-লোকন করিলাম—যাহারা একত্র অবস্থান করিয়া অভ্রংলিহ গ্রীবা-দেশ উন্নত পূর্ব্বক সমস্ত ভূমণ্ডল যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে—যাহাদের তুষারধবলকলেবরে রজতপ্রবাহ স্রোতস্বিনিগণ প্রবাহিত হইয়া হরশিরঃস্খলিতশতধারা জাহ্নবীর শোভা ধারণ করিয়াছে। কতশত শ্বাপদ-মৃগ-বিহঙ্গাদিসঙ্কুল অরণ্যানী পরিদর্শন করিলাম—যাহাতে বিবিধ বর্ণের পাদপরাজি সাদরে প্রিয়তম ব্রততীবিতান অভ্যু-ন্নত শাখারূপ করে উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি অবরোধ করিয়া আরণ্য জন্তুগণের সুরম্য গৃহস্বরূপ হইয়াছে। কত দুর্গম গিরিগুহা দর্শন করিলাম—যাহাতে অমাবস্যা অবিচ্ছেদে চিরকাল অবস্থিতি করি-তেছে। বারিধিতীরস্থ কত শ্যামল শস্যপূর্ণ অসীম প্রান্তর অব-লোকন করিলাম—যাহাদের বাতবিকম্পিত অনন্ত শস্যরাজি অনতি-দূরবর্ত্তী নীলাম্বুধির ঊর্ম্মিমালার অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু তোমার সেই সমস্ত অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় আমার হৃদয়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছে। তোমার যে সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি মনীষিগণ নগ-রের শোভায় উপেক্ষা করিয়া আজীবন বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। জানিলাম বাহ্য বস্তুতে মনুষ্যের তৃপ্তি হইতে পারে না—বাহ্য বস্তু মনুষ্যকে সুখী করিতে

পারে না। সুখ পৃথিবীতে নাই, সুখ মনে। যাহার মনে সুখ আছে সেই সুখী। পর্ণকুটীরবাসী, অসমধরাতলশায়ী, কৃচ্ছ্রলব্ধ-ভিক্ষান্নভোজী দরিদ্র যে সুখের অধিকারী, এই উন্মত্ত বেশধারী, অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি রাজপুত্র সে সুখেও বঞ্চিত। ইঁহার সুধাধ-বলিত-রাজপ্রাসাদ, দুগ্ধফেণনিভকোমলতল্পসজ্জিত হেমময় পল্যঙ্ক, সুধাসার বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য বস্তু, দরিদ্রের পর্ণকুটীরাদির ন্যায় সুখপ্রদ নহে। অশীতিপর বৃদ্ধ, জরার দুর্দ্দম্য শাসনে জর্জ্জরিত, মস্তকে রজততন্তু, অশনে দশনপীড়া, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, এতাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়েও যে টুকু ভোগাশা আছে তাহাতেও আমি বঞ্চিত। বেদ, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটক যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম সুখের সহিত কুত্রাপি সাক্ষাৎ হইল না। বেদবিহিত সূর্য্যাগ্ন্যাদি দেবতাগণের স্তুতিপাঠ, অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়া কলাপের বাহ্যাড়ম্বর, সর্ব্বধর্ম্মের উচ্চ-তম শাখা অধ্যাত্মবিদ্যা কিছুতেই মনের ক্ষোভ নিরাকৃত হইল না। দশনের দর্শন-পিপাসা বলবতী হইল। ক্রমে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম—জানিলাম আশার প্রতারণায় সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইল—শেষে এই হইল যে তার্কিক হইতে গিয়া নাস্তিক হইলাম। নাস্তিকের তমসাচ্ছন্ন নিরাশাময় পরিণাম কি ভয়ানক! জীবন-প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ হইবে। বহুবিধ ভোগ্যপূর্ণ পৃথিবী একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অদ্য আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্রকন্যা বলিয়া যাহাদিগকে স্নেহরজ্জুতে সুদৃঢ় বন্ধন করিতেছি, কল্য ভীষণ-রূপী কাল তাহাদের মর্ম্মভেদী করুণবিলাপে বধির হইয়া আমায় অনন্তকাল-স্রোতে নিক্ষেপ করিবে, আর আমার হৃদয়প্রতিম প্রিয়তম পদার্থগুলিকে দেখিতে পাইবনা। অনন্তকাল-স্রোতে

ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া যাইব কে বলিতে পারে ? আত্মীয়-গণের গগণভেদী আর্ত্তনাদে আমার অনন্ত-নিদ্রা ভঙ্গ হইবেনা। কালের প্রবল স্রোতে আমার নাম পর্য্যন্তও প্রক্ষালিত হইবে। এই প্রকার পরিণাম চিন্তায় আমার ঔদাসিন্য দিন দিন বর্দ্ধিত হই-তেছে। পারলৌকিক আত্মা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন কোন আলোক নাই যে তাহার সাহায্যে অন্ধকারের নিরাস পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্যানুসন্ধানে সক্ষম হই। উপনিষদের আপ্তবাক্যে আমার মত সন্দিগ্ধ ব্যক্তির বিশ্বাস হইতে পারেনা। পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দর্শনসমূহের সারবত্তা আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় না। অতএব আমার মত নাস্তিক পাষণ্ডের সুখ কোথায় ? ঈশ্বর আছেন কি নাই তাহা আমি জানিনা কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি পৃথিবীতে যদি কেহ সুখী থাকে তবে সে আস্তিক। আস্তিকের এমন অবস্থা নাই যাহাতে সে সুখের আশা না করিতে পারে, এমন বিপদ নাই যাহা হইতে উদ্ধারের আশা না করিতে পারে। ঘোরতর সংসার-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ বিপত্তরঙ্গ উল্লম্ফ প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছে, পার্থিব বন্ধু বান্ধব তৎপ্রতিকারে অসমর্থ—এ অবস্থায় নাস্তিকের আশা নাই, ভরসা নাই, নাস্তিক জীবন্মৃত। নাস্তিক বহুদিনের পর জল পথে স্বদেশে অসিতেছে। মায়াবিনী আশা কখন স্নেহময়ী জননীর বেশে হৃদয়-প্রসূন তনয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অমৃতময় বাক্যে কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল ; কখন বা প্রণয়-প্রতিমা প্রেয়সীর বেশে নাস্তিকের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া স্বকীয় বিরহ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল ; কখন বা পুত্র কন্যার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার চিত্ত-ক্ষেত্রে নিবেশিত করিয়া স্বদেশদর্শনাভিলাষ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। অকস্মাৎ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জলদ-জাল আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করিল। প্রবল ঝটিকা,

আশ্রিত ক্ষুদ্র তরণিখানিকে তাহার জীবনের সহিত নানাস্থানে উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতে লাগিল। সনির্ঘোষ-বিজ্জুচ্ছলে মৃত্যু যেন ক্ষণে ক্ষণে উৎকট হাস্য করিতে লাগিল। নিরুপায় ভয়াভিভূত নাস্তিক ক্ষণে মূর্চ্ছা ক্ষণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে মৃত্যুলোকে ও জীবলোকে যাতায়াত করিতে লাগিল। এসময়ে এমন কোন পার্থিব বন্ধু নাই যে তাহার জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। প্রবল ঝটিকা তাহার জীবনের সহিত স্বদেশদর্শনের আশা উড়াইয়া ফেলিল। কিন্তু আস্তিকের সুখময় জীবনে এমন কোন বিপদ নাই যাহা হইতে সে উদ্ধারের আশা না করিতে পারে—এমন কোন নিরাশা নাই যাহাতে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ অভিভূত হয়। যখন সে অগাধ বিপদ-সলিলে নিমগ্ন হইয়া পার্থিব বন্ধুবান্ধবের দুর্লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হয়, তখন স্বর্গীয় বন্ধু তাহার পবিত্র হৃদয়মন্দিরে উপস্থিত হইয়া অমৃতময় প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে থাকেন। নাস্তিকের ন্যায় তাহার জীবনরক্ষার ভার নিজের হস্তে নাই। সে বিশ্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করে। কেবল ঐহিক সুখই তাহার হৃদয়ের অভিলষনীয় নহে। নাস্তিকের ন্যায় তাহার পরকাল অন্ধকারপূর্ণ নহে। কতশত বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি ঐহিক সুখ বিসর্জন পূর্ব্বক পারলৌকিক সুখের আশায় বিমুগ্ধ হইয়া আজীবন অতি কঠোরব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সুখ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। আমার পরলোকে বিশ্বাস নাই। জগৎ-কারণ ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বস্ত নহি। অখণ্ডনীয় নানা তর্কজালে বেষ্টিত হইয়া দিনদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছি। এমন কোন ব্যক্তি পাইলামনা, যিনি আমার তর্কজাল ছিন্ন করিয়া যথার্থ সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অপরিচিত

পথে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া এই হতভাগ্যের ধন্যবাদের পাত্র হয়েন। যুবা এই প্রকারে হৃদয়াবেগ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতে করিতে পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিত-হইলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল, ক্রমশঃ হস্ত পদাদি অবশ হইতে লাগিল। যুবা উপায়ান্তর না দেখিয়া তরঙ্গিণীর অগাধ সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন। উৎক্ষিপ্ত জল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল—উন্মত্ত যুবক অদৃশ্য।

ক্রমশঃ

রজনী-প্রভাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে আবরণ উন্মোচন করিল, রমণীর পার্শ্বভাগে রক্তাভ-স্বচ্ছচর্ম্মাবৃত এক গোলাকার পদার্থ বামাচরণের নয়নগোচর হইল। তিনি সত্বরে উহা নখদ্বারা চিরিয়া ফেলিলেন—অদ্ভুত দৃশ্য! যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মন হর্ষ ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল—এক বৃন্তে দুইটী অপরিস্ফুট প্রসূন—একটী সতেজ ও রক্তাভ, অপরটী মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ—একাধারে সদ্যজাত শিশুদ্বয়—কন্যা জীবিতা, পুত্র শবকল্প। বামাচরণ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না: একবার ভাবিলেন, হরেন্দ্রনাথকে এ বিষয় জানাইলে ভাল হয়: তাঁহার সন্তান, তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করা যাইবে—কিন্তু তিনি কি ভাল বুঝিবেন?—না: এখন তাঁহার মন অস্থির, কি বুঝিতে কি বুঝিবেন, সুতরাং তাঁহাকে জানাইলে বিশেষ ফল দর্শিবে না। আবার ভাবিলেন, আমি তাঁহাকে স্বয়ং সমাচার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এক্ষণে সংবাদ না দিলে, হয়ত হরেন্দ্রনাথ

বিরক্ত হইবেন আর আমারই বা কথা ঠিক রহিল কৈ ? তবে তাঁহাকে সমাচার দিতে হইল—কিন্তু হরেন্দ্রনাথ এবিষয় শুনিলে মনে ব্যথা পাইবেন, সদ্যজাত শিশু হইলে কি হয় ? তাঁহার পুত্রত বটে—তাঁহার মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিবে। ভাল, আমি না বলিলে কি তিনি শুনিতে পাইবেন না ?—পাইতে পারেন ; তবে আমি কেন তাঁহার মনে দুঃখ দিব ? ; পুনরায় ভাবিলেন, সূতিকাগারে বহুক্ষণ মৃতশিশু রাখা অকর্ত্তব্য : প্রসূতি সংজ্ঞালাভ করিলে বিষম গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে কে এই মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করিবে, কেই বা ইহাকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে ?—লক্ষ্মী পারিবে কি ?—না : সে স্ত্রীলোক তাহাতে আবার বৃদ্ধা, এত রাত্রে শ্মশানে যাইতে তাহার ভয় হইবে, লক্ষ্মী পারিবে না। পরিজন মধ্যে কাহাকেও জাগরিত করিলে হয় না ? সহৃদয় বামাচরণের মন বলিল " না " : তাহারা সুখে নিদ্রা যাইতেছে, জাগাইলে তাহাদের কষ্ট হইবে ; তবে আমিই লইয়া যাই ?—অসম্ভব : প্রসূতির নিকট এক্ষণে আমার অবস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক।

সহসা নৈশগগণে ঘনঘটার গভীর গর্জ্জন বামাচরণের শ্রবণ-গোচর হইল। তিনি কক্ষদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, আকাশে চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, কৌমুদী নিবিয়া গিয়াছে, কেবল এক প্রকাণ্ডকায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, শূন্যপথে ভীষণ পিচাশের ন্যায় দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাসে ও শ্রুতিকঠোরনাদে অট্টালিকা, উপবন, বন ও তরঙ্গিণীর অগাধজল কম্পিত ও আলোড়িত করিতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে অট্টহাসে তিমিরাবৃত জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছে। বামাচরণ দ্বার-পার্শ্বে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কে হরিল?

এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; আকাশে কতকগুলি কাল মেঘ এখনও দাঁড়াইয়া আছে—সঙ্গীগণ তাহাদের ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এক্ষণে কে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া স্বস্থানে লইয়া যাইবে, ভাবিয়া শূন্য পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদেব পুনঃ প্রকাশিত হইয়া রজত ছটায় দশদিক আলোকিত করিতেছেন; নক্ষত্ররাজি অসংখ্য হিরক খণ্ডের ন্যায় আকাশে ছড়ান রহিয়াছে—বারিশিক্ত-বৃক্ষ-পত্র-সমূহ মৃদু পবন-হিল্লোলে দুলিতেছে ও চন্দ্ররশ্মি-সংযোগে ঝিকৃমিক্ করিতেছে। মেদিনীপুরের রাজপথ এক্ষণে পরিষ্কৃত—বৃষ্টির জলে ধূলা ও তৃণখণ্ডসমূহ ধুইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত: এক জন বলবান পুরুষ দুই হস্তে শ্বেত বস্ত্রাবৃত কি এক পদার্থ বক্ষে ধারণ করিয়া এই রাজপথ অতিক্রম পূর্ব্বক একটি সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে বন—গুল্মলতাসমাকীর্ণ নিবিড় বন, অদূরে তরঙ্গিণী-উপকূলে এক বিশাল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। এই প্রান্তরের এক ভাগ শ্মশান—মেদিনীপুরবাসী জনগণের জীবলীলাবসানে সাধারণ বিরামভূমি। বলিষ্ঠকায় পুরুষ অনবরত চলিতেছেন, বিরাম নাই তথাপি পথ আর ফুরায় না। তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন, শ্মশানভূমিও যেন সঙ্গে সঙ্গে ততই অগ্রসর হইতেছিল।

ধীরে ধীরে এক খানি কালমেঘ আসিয়া চন্দ্রের উপর পড়িল, আলোক অন্ধকারে মিশিয়া ধরাতলস্থ বস্তুনিচয় অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। পথিক সাবধান পূর্ব্বক চলিতেছেন, সহসা কি শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, শব্দ—

অলীক—ভ্রমমাত্র এবং পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার সেই শব্দ—সেই সাবধান-পূর্ব্বক-মনুষ্য-পদসঞ্চার-শব্দ—তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি একমনে শুনিলেন, শব্দ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে; চলিতে চলিতে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, মানবাকৃতি ছায়ামাত্র অদূরে অগ্রসর হইতেছে। পথিক সোৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেও? ছায়া নিরুত্তর—এক বিস্তৃত বটবৃক্ষের ছায়ার সহিত মিশিয়া অদৃশ্য হইল।

এই পথে আর দ্বিতীয় বৃক্ষ নাই সুতরাং দিবাভাগে শ্মশান-যাত্রীরা এই তরুবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আতপতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইত। পথিক সন্দিগ্ধচিত্তে বৃক্ষতল বিশেষ নিরীক্ষণ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, এবার চক্ষু আমাকে প্রতারণা করিয়াছে, রাত্রি-জাগরণ ও শ্রমাতিশয়-বশতঃ আমার ভ্রম জন্মিতেছে—যাহা শুনিলাম বা দেখিলাম তাহা উষ্ণীকৃত মস্তিষ্কের ভ্রমাত্মক প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, কি ভাবিয়া বিজন পথিমধ্যে একাকী দণ্ডায়মান হইলেন, পুনরায় অগ্রসর হইতে পা উঠিল না, মনে ভয়-সঞ্চার হইল ও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শূন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কখন কাহারও অপকার করি নাই বরং যথাসাধ্য উপকার করিয়াছি তবে অপরে কেন আমার অপকার করিবে?—দস্যু?—তাহা হইতে পারে না: যেহেতু মেদিনীপুর সুশাসিত। তবে আমার মনে এই অনৈসর্গিক ভাব কি নিমিত্ত উদিত হইতেছে, কি নিমিত্তই বা আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে?

ইত্যবসরে কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এক শাণিত ছুরিকা সজোরে বসাইয়া দিল। অস্ত্র তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল এবং হৃদয়ের উষ্ণশোণিত পান করিয়া তাঁহার ধৈর্য্যাপহরণ

করিল। পথিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, বক্ষঃস্থিত ধবল পদার্থ তাঁহার বক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিল। তিনি হত্যাকারীর প্রতি সাশ্রুনয়নে চাহিয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন, এই কি উপকারের প্রত্যুপকার হইল? তোমার মনে এত ছিল জা-নি-লে—পথিক সংজ্ঞা হারাইলেন, প্রাণবায়ু উড়িয়াগিয়া অনন্ত-বায়ুতে বিলীন হইল, শবের উপর শব পড়িয়া রহিল। বামাচরণ পরের উপকার করিতে গিয়া অমূল্য নিধি হারাইলেন—পরোপকার-যজ্ঞে নিজ প্রাণ বলিপ্রদান করিলেন।

হত্যাকারী পলায়ন করিবার নিমিত্ত ফিরিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ কোথা হইতে এক ত্রিশূলধারিণী শ্যামাঙ্গী আসিয়া তাহার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল ও বামাচরণের মৃতদেহ দেখাইয়া কহিল, কি এ?

ঘাতুক কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সভয়ে বিস্ফারিত নেত্রে এক পদ হটিয়া গেল, পরে শ্যামাঙ্গীর কোমল হস্ত হইতে নিজ হস্ত সবলে ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে রাজপথাভিমুখে পলায়ন করিল।

ত্রিশূলধারিণী উচ্চহাস্যে কহিল, পলাইলে কি হইবে? আমি তোমাকে চিনিয়াছি, আজ না হয় কাল আমার হস্তে আসিতে হইবে।

প্রাণপণে ছুটিয়া ক্রমে ক্রমে হত্যাকারী অদৃশ্য হইল, ভৈরবীর শূন্যদৃষ্টি তদনুসরণে নিবৃত্ত হইয়া মৃত বামাচরণের মুখের উপর ফিরিয়া আসিল। ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া ভৈরবীর কমলদলসদৃশ নেত্রযুগলে আর বারিবিন্দু থাকিতে পারিল না, টলমল করিয়া গড়াইয়া পড়িল। ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সে দাঁড়াইতে না পারিয়া শবের মস্তকপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ভৈরবী সযত্নে বামা-চরণের মস্তক অঙ্কোপরি তুলিয়া লইয়া তাহার গলা জড়াইয়া অজস্র কাঁদিতে লাগিল, পরে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—শবের মস্তক পুনরায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

সেই গভীর রজনীতে, সেই জনশূন্য পথিমধ্যে উন্মাদিনী ভৈরবীর মুখে শোক ও নৈরাশ্য দেদীপ্যমান—নয়ন গগণপ্রান্তে ন্যস্ত, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বক্ষঃস্থল উঠিতেছে ও নামিতেছে আবার উঠিয়া উঠিয়া নামিয়া যাইতেছে। সে শূন্যপ্রান্তে চন্দ্র হাসিতেছে দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না; রোষকষায়িতলোচনে চন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, কলঙ্কি! তোর সমক্ষে আমার লজ্জা কি? তুই এবিষয় প্রকাশ করিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। মরণ আর কি, আবার হাস্‌ছেন; আপনার হৃদয়ে কলঙ্ক ভরা রহিয়াছে, তাই লইয়াই থাক্—তা নয়: এতদিন আমায় পুড়্‌য়ে বুঝি সাধ মেটেনি—দেখ্‌বি মজা?—বলিয়া ভৈরবী যেমন হস্তস্থিত ত্রিশূল চন্দ্রের প্রতি লক্ষ করিয়া তুলিতে যাইবে, অমনি উহা বামাচরণের বক্ষঃস্থিত শ্বেতবস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়াগেল। ভৈরবী নিম্নে চাহিবামাত্র তাহার হস্তস্থিত ত্রিশূল বামাচরণের পার্শ্বদেশে খসিয়া পড়িল, সে দেখিল বস্ত্রমধ্যে একটী সদ্যজাত মৃতকায় শিশু পড়িয়া রহিয়াছে। প্রস্তর-গঠিত বিস্ময়ের প্রতিকৃতির ন্যায় সে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল, বিজন পথিমধ্যে স্বর্ণস্তূপ দেখিলেও এতদূর বিস্মিতা হইত না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৈরবীর বিস্ময়বেগে হ্রাস হইয়া কৌতুহল জন্মিল—এতরাত্রে কাহার এই সদ্যজাত শিশু লইয়া বামাচরণ একাকী শ্মশানাভিমুখে যাইতেছিলেন?—মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। ভৈরবী নির্নিমেষনয়নে শিশুর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল, যে সেই সুকুমার মুখ ক্রমে ক্রমে নবকান্তি ধারণ করিতেছে, পাণ্ডুবর্ণে রক্তিমাভা আসিয়া অল্পে অল্পে মিলিত হইতেছে।

দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রসর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে রূপ দেহের ছেদবিদ্যা আছে সেই রূপ মনেরও ছেদবিদ্যা আছে। মনস্তত্ত্ববিৎ মানসিক বৃত্তি সমূহ অন্তর্ব্বোধের রূঢ় অবস্থা সমূহে বিশ্লিষ্ট করেন, দেহচ্ছেদবিৎ দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সূক্ষ্ম চর্ম্মসমূহে এবং সূক্ষ্ম চর্ম্মসমূহ অণু সকলে বিভক্ত করেন। এক জন সরল রূঢ়াংশসমূহ হইতে জটিল বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের পরিণতি অনুধাবন করেন ; অন্য জন চিন্তার সরল উপাদান হইতে জটিল কল্পনা সকলের সৃষ্টি অনুবর্ত্তন করেন। যেরূপ দেহচ্ছেদবিৎ শারীরক্রিয়াসকল কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন সেইরূপ মনস্তত্ত্ববিৎ মানসিকবৃত্তি সকলের অনুধ্যান করেন।

বলিতে কি "শরীর তত্ত্ব" ও "মনস্তত্ত্বের" মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে। কেহই সংশয় করেন না যে অন্তত: বিশেষ বিশেষ শারীরেন্দ্রিয়ক ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহের উপর কতিপয় মানসিক অবস্থা নির্ভর করে। চক্ষু না থাকিলে দর্শন হয় না, কর্ণ না থাকিলে শ্রবণ হয় না। যদ্যপি মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎপত্তি বিষয় যথার্থতঃ দর্শন-শাস্ত্রীয় প্রশ্ন হয় তাহা হইলে যে দার্শনিক ইন্দ্রিয়বোধের পরিবর্ত্তন (physiology of sensation) অবগত না হইয়া সেই প্রশ্ন সাধন করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহার স্বকীয় বিষয়ের কখন সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। উহা কোন শরীরতত্ত্ববিদের "বল-বিজ্ঞান" নিয়ম সকল অনবগত হইয়া গতিক্রিয়া নিরূপণ কিম্বা রসায়নের কিছু মাত্র না জানিয়া শ্বাসক্রিয়া নিরূপণ করার ন্যায় অসম্ভব।

আমরা যে সকল কারণে শরীর-তত্ত্বকে বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করি সেই সকল কারণে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান-পদযোগ্য ; এবং যে গবেষণা-প্রণালী এক প্রকার ব্যবহার সকলের যথার্থ সম্বন্ধ সমূহে বিশদ করিয়া দেয় তাহা অন্য প্রকার ব্যবহার সমূহে (Phenomena) সমফলদায়ী হইবে। যেহেতু দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ আত্মতত্ত্ব-নির্ণীত সত্য সকলের ন্যায়িক ফল প্রকাশক এবং মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা হইতে ইহার অন্তর্ভূত বিষয় মাত্রে ভিন্ন কিন্তু উভয়ের গবেষণা-প্রণালীতে কোন প্রভেদ নাই ; ইহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে যে দার্শনিকেরা যে অনুসারে অল্পতর সুগম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ বুঝিতে পারিবেন, দর্শন শাস্ত্রীয় অনুসন্ধানে সেই অনুসারে কৃতকার্য্য হইবেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদের সৌরজগত কাণ্ড সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে যে তাঁহার পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞান থাকা উচিত তাহা বুঝাইতে যেরূপ বহুল যুক্তির আবশ্যকতা করে না সেইরূপ উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে কোন বিশেষ প্রমাণের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ডেকার্ট, স্পাইনোজা, ক্যাণ্ট এবং আধুনিক অন্যান্য দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রে যে স্থায়ী উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা পদার্থবিদ্যার গূঢ় মর্ম্ম সবিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। এমন কি ডেকার্ট ও ক্যাণ্টের ন্যায় কেহ কেহ উক্ত বিদ্যার অধিকাংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। "প্রত্যক্ষবাদ"-আবিষ্কারক কোমৎ বিজ্ঞান বিষয়ক অক্ষমতার সহিত দর্শনশাস্ত্রীয় যোগ্যতার কতদূর অসদ্ভাব তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। বস্তুতঃ দর্শন রূপ দেবমন্দিরের বিজ্ঞান বাপী স্বরূপ। যে কেহ উহার জলে চক্ষু প্রক্ষালন ও অন্তঃশুদ্ধি না করিয়াছেন তিনি কোন ক্রমেই অভীষ্ট দর্শনে সক্ষম হয়েন নাই।

যদিও উল্লিখিত বিষয়গুলি সহজেই অনুমেয় তত্রাচ তাহাদিগের যাথার্থ্য সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। এমন কি দর্শন শাস্ত্রাধ্যায়িগণ মনস্তত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ব বিষয়ক উপকারিতায় বঞ্চিত। পরিশুদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে জ্ঞানেচ্ছাভক্ত কতিপয় অবশ্যম্ভাবী চিরপ্রসিদ্ধ সত্যের উপর নির্ভর করে এবং ঐ সকল সত্য না জানা থাকিলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণ অসম্ভব। এই কারণে তাঁহারা উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের শিক্ষা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। যাঁহারা পরিশুদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক নহেন তাঁহারা এ আপত্তির প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যদি পর্য্যবেক্ষকের মনে "আকর্ষণ" নিয়ম উদিত না থাকে তাহা হইলে কি তিনি প্রস্তর-খণ্ড-পতন পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন না?

অপর দিকে প্রত্যক্ষ বাদীরা (তাঁহারা যতদূর তাঁহাদিগের গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করেন) স্পষ্টতঃ বলেন যে মানসিক বৃত্তি সমূহের পর্য্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্র একটী ভ্রম মাত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের উচ্ছিষ্টাংশ সকলের বুদ্বুদময় উপদর্শন। কিন্তু যদ্যপি কোম্‌ৎকে জিজ্ঞাসা করা যাইত যে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন (**Physiologic cerebrale**) বাক্যের অর্থ কি? সাধারণতঃ লোকে যাহাকে মনস্তত্ত্ব বলে তাহা ভিন্ন উহার অর্থ আর কি হইতে পারে? এবং যে অন্তর্গত পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে অসম্ভব বলিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ইহা অনুমোদন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না যে মনস্তত্ত্বশাস্ত্রকে গর্হিত বাক্যে উল্লেখ করিতে গিয়া কেবল গম্ভীর ভাবে অর্থহীন বাক্য বলিতে ছিলেন। স্কচ দার্শনিক হিউম প্রথমে ইহা আবিষ্কার করেন যে দর্শন শাস্ত্র

মনস্তত্ত্বের উপর স্থাপিত এবং মানসিক বৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপের সন্ধান, পদার্থবিদ্যাবিষয়িনী গবেষণা সদৃশ নিয়মাবলী অনুসারে করণীয়। তিনি বলিয়াছেন তাহা না হইলে "নৈতিক দর্শনবিৎ" "প্রাকৃতিক দর্শনবিদের" ন্যায় প্রকৃত ও অসংশয়নীয় সত্য সকল প্রাপ্ত হইবেন না।

সকল বিজ্ঞানেরই কল্পনা লইয়া সূত্রপাত। অনেক বিষয় অপ্রমাণিত হইলেও সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। সেইগুলি ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কোন বিষয় শিখিতে চাহেন তাঁহাদিগের সেইগুলি অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক উন্নতি উহার কল্পনা সকলের সমালোচনার উপর এবং অসার ও অসত্য অংশ সকলের বর্জনের উপর নির্ভর করে।

দর্শনশাস্ত্রও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ন্যায় উক্তপথ অবলম্বন করিয়াছে। ইয়ুরোপে গভীর অনুধ্যান বিষয়ে প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ দার্শনিক ডেকার্ট মহান্ উপকার করিয়াছিলেন। তিনি "সম্ভবতা" বিষয়ের সমালোচনা দ্বারা আধুনিক ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। ডেকার্টোত্থিত গবেষণার আদর্শফল এই যে একটী বিষয়ের কেবল কোন মাত্র সংশয় থাকিতে পারে না, কারণ যে কেহ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবেন তাহাতে তাহার পোষকতাই করা হইবে। সে বিষয়টী "ক্ষনিক অন্তর্বোধ" (Momentary consciousness) এ বিষয়টী সম্পূর্ণ সত্য; ইহাতে কোন সংশয় উত্থাপন করা অসম্ভব। অন্য প্রকার "সম্ভবনীয়তা" যথার্থ কি অযথার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। লক এবং বর্কলি দর্শনশাস্ত্রীয় সমালোচনা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যাহা বিশদ, পরিস্কৃত ও সহজেই বোধগম্য তদ্ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ না করিয়া ডেকার্টীয় অভিমত অনুধাবন করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদিগের

পূর্ব্বতন মহাপুরুষ যে সকল কল্পিত অংশ অপরিত্যক্ত রাখিয়া ছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হিউমও এই পথ অনুসরণ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। ক্যাণ্টের সহিত যদিও তাঁহার বিশেষ বিশেষ অংশে সাদৃশ্য উপলক্ষিত হয় না, উভয়ের উদ্দেশ্যগত যে কোন ভিন্নতা ছিল না তাহা হিউমের "মানবপ্রকৃতি" (**Human nature**) এবং ক্যাণ্টের "সমালোচক দর্শন" (**Critical philosophy**) যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইতে পারে।

এক্ষণে ইহা দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে "শরীর-তত্ত্বের" জ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই শরীর-তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানাভাবে আমাদিগের "মনস্তত্ত্ব" বিষয়ে বিশদ জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই। মনস্তত্ত্বের সহিত দর্শনশাস্ত্রের কিরূপ নৈকট্য তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভূয়োদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ এই দুইটী অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালীতে যেরূপ আদরণীয়, মনস্তত্ত্বেও সেইরূপ আদরণীয় হওয়া উচিত। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিসাধনে দীক্ষিত তাঁহারা যদি এই কয়টী বিষয়ের কার্য্যকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে যে তাঁহাদিগের কৃতকার্য্য হই-বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীলঃ

বিজ্ঞান ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম।

মনুষ্য-স্বভাব ধর্ম্মশীল। আদিম বর্ব্বরজাতি হইতে উচ্চতম সভ্যজাতি অবধি সকলেই একটী না একটী ধর্ম্মের অনুশীলন

করিয়া থাকেন। নাস্তিকদল সাতিশয় স্বল্পসংখ্যক, তদ্ভিন্ন অপর সমুদয় লোকেই কোন না কোন ধর্ম্ম প্রধান মানিয়া তদনুসারে ঈশ্বরোপাসনা করেন। এই বিবিধরূপ ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলিন স্বাভাবিক, কতকগুলিন কল্পিত এবং কয়েকটী প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদিগের কোনটীর সহিত কোনটীর তারতম্য বা ইতর-বিশেষ করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিম্বা একটীর প্রশংসা-বাদের নিমিত্ত অপরটীর অপযশ করা মানস নহে, কেবল আমরা ইহাই অনুধাবনে প্রবৃত্ত, যে বিজ্ঞানের প্রচার ও বিকাশ দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অবস্থার কিরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিবস হইতে এইরূপ সংস্কার ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে যে বাইবেলোক্তধর্ম্ম বিজ্ঞা-নের তেজ আর সহ্য করিতে পারে না এবং ঐ বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও প্রচারে যীশুখৃষ্টের দেবাভিমান মলিন হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যতত্ত্ব (**Anthropology**) এবং ভূতত্ত্ব (**Geology**) ঐ মহামান্য ধর্ম্মের মূলে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে এবং ঐ পীড়ায় কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম পৃথিবীর সকলাংশেই এই বিস্তীর্ণ বৃক্ষ শুষ্কপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি এপ্রিল ও মে মাসের " বেঙ্গল-মেগেজিন " নামক পত্রে রেভারেণ্ড মিল্নী সাহেব ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার বোধে বিজ্ঞানালোকে বাইবেলাদিষ্ট ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইতেছে। তিনি বলেন "প্রকৃতি ও প্রত্যাদিষ্ট-ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল ঈশ্বরের হস্তলিখিত একখানি পুস্তকের দুইটী খণ্ড মাত্র, সুতরাং তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে পর-স্পরের অসদ্ভাব বা বৈষম্য থাকা অসম্ভব এবং তাহা লক্ষিতও হয় না"। আমরাও এই কথা শত সহস্র বার স্বীকার করি যে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের সহিত স্বভাবের একতিল মাত্রও বিভিন্নভাব বা বিরোধ থাকা সম্ভব নহে। যদি ঐ রূপ ভাব কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মে

দৃষ্ট হয় তৎক্ষণাৎ আমরা সেই ধর্ম্মকে অপবিত্র ও অলীক ধর্ম্ম বলিতে সঙ্কোচ করিব না।

বাইবেল-কথিত ধর্ম্মের অবস্থা বিশিষ্টরূপ কোমল। উহা ঈশ্বরের বাগুক্ত ধর্ম্ম বলিয়া বাচ্য। অতএব তাহার মধ্যে একটীও বাক্য মিথ্যা বা অস্বাভাবিক প্রমাণ হইলে অন্যগুলির আর দাঁড়াইবার স্থল নাই। ঐ সমস্ত বাক্যগুলি একটী সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানের ন্যায়। যতক্ষণ সকলগুলি স্থির ভাবে আছে ততক্ষণ তাহারা পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও দৃঢ়, কিন্তু যদি তাহার একটী নিম্নস্থিত ধাপ সম্পূর্ণ রূপ ভঙ্গ করা যায় তাহা হইলে অন্য সমস্ত গুলি যে বিকট শব্দের সহিত ভূমিসাৎ হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কোন রূপ আশ্রয় বা চাড়া অবলম্বনের দ্বারা যেমন সোপানের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু দিবসের জন্য খাড়া রাখা যাইতে পারে মাত্র, সেইরূপ ইদানীন্তন কতকগুলিন খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-যাজকগণ তাহাদিগের ধর্ম্মস্বরূপ সোপানের প্রতি ঠেস যোজনা করিয়া কোন গতিকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন। তাহার আর সে শ্রীনাই, পূর্ব্বকালীন সৌন্দর্য্য নাই, সেইরূপ দৃঢ়তা নাই, তাদৃশী সহনশীলতা নাই; কেবল একটী কদর্য্য স্তুপ মাত্র দণ্ডায়মান আছে। অপর পক্ষে তাহাদিগের দত্ত আশ্রয়গুলিন বিশেষ রহস্যপ্রদ। তাহাদিগের যখন যে কথাটী যুক্তি বা বিচার দ্বারা রক্ষাকরা অসম্ভব বোধ হইল তখন নিরুপায়ে বাইবেল অনু-বাদককে যারপর নাই গালি দেওয়া হইল; অথবা তাহাতেও না পারিলে ঐ গুলিন কল্পনা স্বীকার করিয়া সেই সমুদয় ত্যাগ-করা হয়। গেলিলীও ইত্যাদি পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান আলোচনার লিখিত খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তে যেরূপ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু এক্ষণে সেই সমুদয় মত নির্ব্বিবাদে বাইবেল অনুগত মত বোধে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা একবারও জ্ঞান

করেন না যে ঐ রূপ কর্ত্তন করিতে করিতে একবারে নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু আমরা মিল্‌নী সাহেবের সাহস, ঋজুতা ও সততার শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি স্বয়ং উপরোক্ত অবলম্বনগুলিন নিতান্ত অপকৃষ্ট ও অযোগ্য জ্ঞানে সেই সকল লুকোচুরি পরিত্যাগ করিয়া মহাবল বিজ্ঞানেরই আশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন অতএব তাঁহার বাক্য শ্রোতব্য ও বিচার্য্য বোধে আমরা তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে বাইবেলোক্ত বাক্য মধ্যে একটিমাত্র অপ্রাকৃতিক সপ্রমাণ হইলে তাহার আর দণ্ডায়মান থাকিবার স্থল নাই। ধর্ম্ম মনুষ্যের নিমিত্ত; মনুষ্যের ত্রাণ ও উদ্ধারের কারণ ধর্ম্মের প্রয়োজন। এক্ষণে মনুষ্য-সৃজন-বিষয়ক ধর্ম্মোক্ত কথা-গুলিন যে প্রধান বাক্য, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আইস আমরা বাইবেলের মতে মনুষ্যের জন্ম বৃত্তান্ত কিরূপ এবং তাহা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য হয় তাহা দেখি। বাইবেলে কথিত আছে সৃষ্টির সর্ব্বশেষে ঈশ্বর দুইটী মনুষ্য সৃজন করেন—একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী। এই বাক্যটী স্বতন্ত্র গ্রহণ করিলে নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। এমন জ্ঞান হয় ঈশ্বর কেবল দুইটী মনুষ্য সৃজন করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ জগৎমধ্যে কি তিনি দুইটী মাত্র নিজ স্নেহাস্পদ জীব সৃষ্টি করিয়া নিরস্ত রহিলেন? মনে কর, তাহাই সত্য। কিন্তু বাইবেলোক্ত অন্যান্য বাক্যের সহিত তাহার কিরূপ ঐক্য হয়? আবার মনুষ্য জাতির সৃষ্টি যে অন্যান্য অনেক জীব জন্তু অপেক্ষা পরে হইয়াছে তাহা বিজ্ঞানের অনুমোদিত বটে কিন্তু তাহা যে সকলের শেষে ঘটিল তাহার স্থিরতা কি? পুনর্ব্বার যদি তাহাও স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আবার মানব-সৃজন-কাল

বাইবেলোক্ত ছয় সহস্র বৎসরের মধ্যেই ধার্য্য করিতে হইবে। মিল্‌নী সাহেব বলেন "যে ভূতত্ত্ব ও সৌর্য্য প্রকৃতির দ্বারা প্রায় স্থির হইয়াছে যে পৃথিবী কখনই কোটী বৎসর সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং মানব-সর্গ ছয় সহস্র বৎসরের মধ্যে হওয়ার সম্ভব এবং বাইবেল-বাক্য সত্য ও যুক্তি সিদ্ধ"। মনে কর মিল্‌নী সাহেবের কথা স্বীকার করিলাম। পরন্তু কোটী বৎসর না হইলেই যে ছয় সহস্র বৎসরের মধ্যেই ঘটিবেক তাহা কোন্ রূপ যুক্তি? সে যাহা হউক যখন আমরা ঐ বাক্য স্বীকার করিলাম তখন তাহার তর্ক অপ্রয়োজনীয়। এখন স্থির হইল মানব-সৃজন ছয় সহস্র বৎসরের অন্তর্গত। দেখ সকল যুক্তি মতেই (মিল্‌নী সাহেবের মতেও) ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে অর্থাৎ চারি সহস্র বৎসর কালের মধ্যে জীব-জাতিধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত ও নিত্য থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ইজিপ্তের প্রাচীন মামিসকল (**Mummies**) এক্ষণকার তদ্দেশীয় মানব শরীর হইতে কোন রূপ ভিন্নভাব দেখা যায় না। পুরাতন নিনিভের প্রাচীরের অঙ্কিত উষ্ট্র যেরূপ এখনও তদ্দেশীয় উষ্ট্র সেইরূপ দেখা যায়, তাহারও কোন রূপান্তর দৃষ্ট হয় না। অতএব জীব-জাতি-ধর্ম্ম নিত্য স্থির হইল। অপিচ বাইবেলেও উক্ত আছে যে জাতি-মাত্রেই স্বরূপ সন্তুতি প্রসব করিতে থাকিবে। এক্ষণে এই কয়েকটী কথা একত্রে মনে করিতে হইলে মনোমধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং তাহার খণ্ডনেরও উপায় দেখা যায় না। যদি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেবল মাত্র একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীর সৃজন হইল, যদি তাঁহারা ক্রমান্বয়ে আত্ম-স্বরূপ সন্তান সন্তুতি উৎপন্ন করিতে থাকিলেন, যদি সমুদায় ঐতিহাসিক কাল জীব-জাতিধর্ম্ম নিত্য ও সমান রহিল, তবে মানবজাতি মধ্যে উপস্থিত বৈষম্য ও বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপে

ঘটিল? যদি উক্ত চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে কোন রূপ পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় না হইল তবে অবশিষ্ট দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এতাধিক প্রাকৃতিক ও মানসিক বিভিন্নতা কি প্রকারে সম্ভব হইল? আমরা এই বাক্য গুলিনের মধ্যে ঐক্যতা সংঘটনের কোন যুক্তি দেখিতে পাই না।

মানবজাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বংশের শরীরগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ ও অসাদৃশ্য এতাদৃশ বিস্তীর্ণ দেখা যায় যে তাহা কেবল জলবায়ুর ভাবান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারেনা। ঐ সমুদায় গুলিন শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে নানা প্রকার বংশ বোধ হয়, কিন্তু আমরা প্রধান একজন মানব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতানুসারে সেই গুলিন পাঁচটী মাত্র শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। উক্ত প্রোফেসর ব্লুমেনবেক মনুষ্য-জাতিকে পঞ্চটী ভিন্ন ভিন্ন বংশে বিভাগ করিয়াছেন। পরন্তু ডাক্তার পৃচার্ড তাহাতেও ক্ষান্ত না থাকিয়া মানবগণকে সাতটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বংশে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। আবার প্রোফেসর আগাসিজ ঐ শ্রেণী সমুদায় অসম্পূর্ণ জ্ঞানে মানবগণকে অষ্টশ্রেণী বদ্ধ করিয়াছেন। আমরা স্বল্পত্বাৎ পঞ্চশ্রেণী গ্রহণ করিলাম। ঐ সকল বংশের বিশেষ চিহ্নগুলিন দিতেছি ঃ—

১ ম। ককেসেন বংশ—তাহাদিগের মস্তক বৃহৎ, ললাট উচ্চ ও বিস্তীর্ণ, মুখ ছোট ও বাদামে, এবং তাহাদিগের আকৃতি প্রায় ভিন্নরূপ, হাঁটী স্বল্প, নাসিকা বাঁশির ন্যায়, চিবুক গোল ও ভরাট। দন্তগুলিন সমান ও সুন্দরভাবে স্থাপিত, রঙ গৌরবর্ণ এবং চুল অতি প্রচুর। তাহাদিগের মানসিক ক্ষমতা অসীম বলিয়া বোধ হয়।

২ য়। মোঙ্গলিয়ান—তাহাদিগের মস্তক চতুষ্কোণপ্রায়, নাসিকা চাপা ও খাঁদা, গণ্ডাস্থি লম্বা, মুখ বিস্তীর্ণ ও চ্যাপটা, চিবুক ছোট, ভ্রু অতি সামান্য ও চক্ষুর লোম অতি বিরল, ঠোঁট পুরু, কর্ণ লম্বা

এবং মস্তকের চুল স্বল্প কিন্তু কঠিন। তাহাদিগের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বা বাদামে। তাহাদিগের মধ্যে মানসিকবৃত্তি কাহার অতীব তীক্ষ্ণ আবার অনেকে একেবারে অসভ্য।

৩য়। ইথিওপিয়ান—ইহাদিগের মস্তকের খুলি অতি ছোট, কসাস্থি লম্বা, ললাট গোড়েন ও নিচু, নাসা মোটা ও চ্যাপ্‌টা, চিবুকদেশ কিঞ্চিৎ গভীর এবং দন্তগুলিন ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে স্থিত। ঠোঁট অতিশয় পুরু, মস্তকের চুল কোঁকড়া এবং পশোমের ন্যায়। রঙ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদিগের মানসিক শক্তি অত্যন্ত সামান্য, এবং উন্নতশীল বলিয়া বোধ হয় না। উহারা মনুষ্যমধ্যে অতি হীন বংশ।

৪র্থ। পুরাতন মার্কীন—মোঙ্গলিয়ানদিগের সহিত ইহাদিগের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু ইহাদিগের রঙ লালবর্ণ এবং পরস্পরের রূপের ভিন্নতাও লক্ষিত হয়। তাহাদিগের গণ্ডদেশ তীক্ষ্ণ, ললাট নিচু। তাহাদিগের মানসিক শক্তি সামান্য বটে কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা অনেক উন্নত-শীল জ্ঞান হয়।

৫ম। মালয়—ইহাদিগের মস্তক অপ্রসস্ত ও গোড়েন, মুখের অস্থিগুলিন লম্বা ও তীক্ষ্ণ, হাঁটী বৃহৎ, নাসিকা ভরাট ও প্রসস্ত, রঙ শ্যামবর্ণ। তাহাদিগের মানসিক শক্তি মধ্যম—ককেসেন বংশ অপেক্ষা ন্যূন কিন্তু ইথিওপিয়ান বংশ অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ ও উন্নতশীল।

আবার এই পঞ্চবংশ মধ্যে অস্থির গঠনেরও অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে এই সকল মানববংশগত বৈষম্য ও অসাদৃশ্য ঐক্যবংশ হইতে কিরূপে সম্ভব হয়? ঐক্যবংশমতাবলম্বিগণ অনেক তর্কে এই পর্য্যন্ত স্থির করিলেন, যে কল্পনা করিলে উপস্থিত বিভিন্নতা ঐক্যবংশ প্রশ্ন হইতে এক কালীন অসম্ভব নহে। ঐক্যবংশ কল্পনা করিলেও করা যাইতে পারে। ডাক্তার পৃচার্ড এই ঐক্যবংশ

মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রধান নায়ক, তিনিও সাহস পূর্ব্বক নিশ্চয় কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না,—তিনিও “এইটি নিতান্ত অসম্ভব নহে” এইরূপ নঞর্থক সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। কেবল জল-বায়ুর ভাবান্তর দ্বারা দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে যে ঐ রূপ বৈষম্য সম্ভব, অন্যান্য অবস্থার সহিত চিন্তা করিলে আমরা কোন ক্রমেই তাহার কল্পনা করিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন ঐতিহাসিক চারিহাজার বৎসর কালের মধ্যে ঐরূপ কোন ঘটনার অনুমাত্রও দৃষ্ট হয় না, বরং তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে জীব-জাতি-প্রকৃতি নিত্য, তাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইজিপ্ত কবর মধ্যে যে রূপ মানব কপোল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহার সহিত ইদানীন্তন ঐ জাতির করোটীর কোন রূপ বিপর্য্যয় দেখা যায় না। পুরাতন কেল্টিকজাতি, যাহাদিগের অস্থি সকল ব্রিটনে মৃত্তিকাবৎ পাওয়া যায়, তাহাদিগের সহিত এখনকার কেল্টিকদিগের কোন বৈষম্য দেখা যায় না। মিসিসিপি ও পিরুর নিকটবর্ত্তী কবরান্তর্গত অস্থিগুলিন পরিদর্শন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে মার্কিনজাতিও পিতৃ পিতামহ পরম্পরা একই রূপ আকার ও গঠন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অপিচ ইহাও দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল মানব বংশের মধ্যে মানসিক বৈষম্য প্রাকৃতিক প্রভেদের ন্যায় অনেক কালাবধি দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহাও একাল পর্য্যন্ত নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল ভাবে স্থির রহিয়াছে! আবার এই প্রকার জীব-জাতিগত বিশেষগুণ ও গঠন গুলিন যে নিত্য তাহা বাইবেলেও উক্ত আছে, এবং মিলনীসাহেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই জীবগত ধর্ম্মটী যে নিত্য তাহা আমরাও সচরাচর দেখিতে পাই। এক্ষণে অনেক অনুসন্ধান দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জলবায়ু দ্বারা মানববর্ণের ব্যত্যয়

হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা অস্থিগত বৈষম্যের কোন কারণ দেখা যায় না, এবং ঐ জলবায়ু দ্বারা বর্ণভেদ অতি সামান্য রূপ পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাহা আবার চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না।

অতঃপর মিল্‌নীসাহেব বলেন, মনুষ্য জন্ম বাইবেল উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ছয় সহস্র বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইল যে চারি সহস্র বৎসর কালের মধ্যে ঐ সকল মানববংশের ভিতর কোনরূপ প্রাকৃতিক বা মানসিক বৈষম্য বা বিপর্য্যয় ঘটে নাই, এবং ঐ যুগের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেরও কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তবে কি অবশিষ্ট দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এতাদৃশ বিপর্য্যয় বাস্তবিক ঘটিল! এই বাক্যটী যে অসম্ভব ও অলীক তাহা স্বতঃ সিদ্ধ, ইহা আমাদিগের কল্পনাশক্তির অতীত এবং যারপর নাই হাস্যপ্রদ। মানববংশগুলিন একবংশ স্থির করিতে হইলে মনুষ্যের জন্মকাল আরও কোটী বৎসর পূর্ব্বে স্থির করা আবশ্যক; প্রাকৃতিক নিয়মগুলিন অনিত্য ইহাও ধার্য্য করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টী যদি নিত্য স্থির হয়, তাহা হইলে উপস্থিত বৈষম্যের সামঞ্জস্যের নিমিত্ত শত সহস্র কোটী বৎসর কল্পনা করিলেও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। পরন্তু বাইবেল ঐ রূপ অসঙ্গত কথাই স্থির করিয়াছেন এবং রেভরেণ্ড সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন; এক্ষণে আর প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের উপায় কি? এই ছয় সহস্র বৎসর কাল মধ্যে প্রাগুক্ত অবস্থায় একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী হইতে এই বিস্তীর্ণ জগৎ এবম্বিধ জনাকীর্ণ হওয়া অসম্ভব এবং তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সঙ্গত নহে। বাইবেলোক্ত মনুষ্যসৃজন-ইতিহাস উপকথা মাত্র সপ্রমাণ হইতেছে। মানবজাতির সৃজন কালীন অনেকগুলিন পুরুষ ও অনেকগুলিন স্ত্রী যে সৃষ্ট হইয়াছিল তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই।

এই কথাটী বিজ্ঞানের অভিহিত ও প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সঙ্গত। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দানব গন্ধর্ব মানব ইত্যাদি বংশ গুলি স্বতন্ত্র, এবং ভিন্ন কালীক সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা যদিও মনুবংশকেই কেবল মানব পদ বাচ্য করিয়াছেন কিন্তু ঐ মনুবংশ আর্য্যবংশ বা পূর্ব্বোক্ত ককেসেন বংশ বলিয়া স্থির হইয়াছে। সামান্যতঃ উপযু্যক্ত দানব ও গন্ধর্ব সর্গও মনুষ্য মধ্যে গণ্য। "বিষ্ণুপুরাণানুসারে সাধারণত: সর্ব্ব প্রকার নর জাতির নাম 'অর্বাকস্রোত' কেন না মানবের দেহ উন্নত বিধায় তাহার ভুক্ত অন্ন জল অধোদেশে সঞ্চারিত হয়"। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে দানব দৈত্য গন্ধর্ব ইত্যাদিও 'অর্বাকস্রোত' মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, যেহেতুক তাহাদিগেরও অবয়ব উন্নত ; সুতরাং বিষ্ণুপুরাণমতে তাহারাও মানব পদবাচ্য। "ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীনকালীন শাস্ত্রে যখন আর্য্যকুলকে দানা ও যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ববংশ হইতে স্বতন্ত্র বংশ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তখন এমন অনুমান করা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ সেই আদিকালে সকলেরই ইহা সত্যরূপ জানা ছিল যে মনুর বংশ স্বতন্ত্র এবং দানব ও রক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সর প্রভৃতি জাতি সকল স্বতন্ত্র গোত্রীয়।" আবার সপ্তর্ষি সর্গ ইতিহাসও আমাদিগের মতের সমর্থন করিতেছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মানবজাতি একটী বংশ হইতে উৎপন্ন নহে, তাহারা স্বতন্ত্র বংশ হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। অপিতু ইহাও সম্ভব যে মানব-জাতির এক একটী বংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৃজন হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাতেও আমাদিগের মতে কোন দোষ স্পর্শ হয় না, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

পুনরপি ভাষা তত্ত্বের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে ভূমণ্ডলস্থ অনেক গুলি ভাষা স্বতন্ত্র এবং তাহাদিগের মধ্যে একটীকে অন্যটী

হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে না। অনেকগুলিন ভাষা যে আদিম ও স্বতন্ত্র তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রায় এক রূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও মধ্যে দুই মত আছে বটে কিন্তু প্রতিপক্ষ মত এক্ষণে প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। সুচতুর বাইবেল লেখক প্রতিবাদ মতের সমর্থন নিমিত্ত একটী অত্যদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব বোধে টাওয়ার অব বেবলের (**Tower of Babel**) অদ্ভুত ইতিহাস কল্পনা করা হইয়াছে; অতএব বাইবেল লেখক পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন ভাষা সকল কোন একটী সাধারণ নিয়মের বশীভূত নহে। সুতরাং ভাষা তত্ত্বেও মানব বংশ গুলিন সতন্ত্র গোত্রীয় বলিয়া অনুমান হয়।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় হয়, যে বাইবেলোক্ত মানব-সৃজন-ইতিহাস অলীক ও অপ্রাকৃতিক। সুতরাং তদুক্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ সহনে অক্ষম এবং ঐ বিজ্ঞানালোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম দিন দিন মলিন ও অদৃশ্য রূপ হইতেছে। একারণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কখন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হয় না।

(ক্রমঃ)

কোন ভদ্র মহিলা দর্শনে।

কে তুমি রমণী-রত্ন দেখা দিলে আসিরে
শরতের রাকা-চাঁদ মুখে পরকাশি রে।
মৃদু মৃদু হাসিটী যে লেগে আছে অধরে
কৌমুদী তিমির-হরা মম চিত্ত-অম্বরে।
অলঙ্কার-শূন্য দেহে কি চারু শোভন রে

স্বভাব সৌন্দর্য্যে বল কি করে মণ্ডন রে।
কারুশীলা প্রকৃতি গো কত রূপ-রাশিতে
সাজায়েছে মন-সাধে ধরা-তমঃ নাশিতে।
মূর্ত্তিমতী সরলতা মর্ত্ত্যেতে উদয় রে
ঋজুতা শিখাতে নরে হেন বোধ হয় রে।
সরল হৃদয় যার নিষ্কপট মতি রে
কি সুধা না বরষয়ে তার নেত্র-জ্যোতি রে।
কপট মনুষ্য ওরে তোরা আসি দেখ রে
স্নিগ্ধ চারু ছবিখানি মন-পটে লেখ রে।
কেন এত অধোমুখ বল না আমায় রে
তব মুখ হেরি পাছে চাঁদ লাজ পায় রে
তাই বুঝি নত-মুখী নয়ন ধরায় রে ?
লাজ-রাগ মাঝে মাঝে বদন রঞ্জায় রে
পদ্মেতে গোলাপ ফুটি যেন লয় পায় রে।
নেত্রের পলক নড়ে কিবা শোভা তায় রে
পঙ্কজে ভ্রমর দুটী নড়িয়া বেড়ায় রে।
যৌবন-কুসুমে দেহ শোভিত হয়েছে রে
মাধবী লতায় ফুল ফুটিয়া রয়েছে রে।
কাহার ঘরণী তুমি বল তুমি কার রে
শোভিয়াছ পাশে থাকি কোন সহকার রে।
কণ্টকেতে ভরা মরু ধরণী হইত রে
রমণী-কুসুম যদি সৌরভ না দিত রে।
কোকিল-গঞ্জিত কণ্ঠে সুললিত গাও রে
শোকেতে তাপিত তনু অমৃতে জুড়াও রে।

শ্রীভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আধ্‌পাগ্‌লার পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "নলিনী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অভাগার কিছুতেই মঙ্গল নাই। কোথায় আমি এই নিদাঘসন্ধ্যায় গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে লেখনীকরে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দুই এক পংক্তি আঁচড়াইতে বসিলাম না গোড়াতেই বাধা পড়িল! পত্র লিখিতে বসিয়াই দেখি যাঁহাকে পত্র লিখিব তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না—"নলিনীর" সম্পাদক নাই। বালককালে দিদিমার মুখে প্রবাদ বচন শুনিয়াছি "রাম না হইতে রামায়ণ" এও দেখি সেইরূপ অদ্ভুত-ব্যাপার—সম্পাদক নাই অথচ পত্রিকা। যাহোক্ আমার মত এমন বিভ্রাটে কেহ কি আর কখন পড়িয়াছেন? (কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি—গাঁয় না মানে আপনি মোড়ল)। পত্র লিখিতে বসিয়া, কাগজ কলম মসী সকল আহরণ করিয়া, মনকে পত্রলিখনোপযোগী অবস্থায় আনীত করিয়া তার পর কেহ কি কাহাকে পত্র লিখিব এই কথা ভাবিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন? কপালে যাই থাক্ যখন পত্র লিখিব বলিয়া বসিয়াছি, তখন না লিখিয়া উঠিব না—বাঙ্গালীর ছেলে "শরীর পতন বা মন্ত্রের সাধন"। অতএব পত্রারম্ভে কোন অজ্ঞাত-নামা সম্পাদক মহোদয়কে উদ্দেশ করিয়া অথবা "যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে" ইত্যাদি বচন স্মরণ করিয়া "নলিনীর" প্রকাশককেই এই পত্র লিখিতে বসিলাম।—

দেখিতেছি, পত্রের নাম "নলিনী"। পড়িলে বোধ হয় যেন একখানা নাটক বা নভেল। আজি কালি দেশে যেরূপ কামিনী যামিনী ভামিনী ভূতিনী পেত্নী প্রভৃতি "ইনী" আখ্যের পুস্তক

কোন বিখ্যাতনামা নিদ্রাপহারী কর্ম্মনাশা (বিশেষ চেয়ারারূঢ় কেরাণীর) কীটের সন্তুতিবত্ বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রসূত হইতেছে, তাহাতে এ পত্রিকা হাতে পাইয়া আমার বস্তুতঃই সেই ভ্রম জন্মিয়াছিল। যাউক, মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়াছেন ঃ—

"What is in a name? What we call a rose
By any other name would smell as sweet."

তখন মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি নিশীথ-তৈলধ্বংসী বঙ্গীয় যুবকের নাম লইয়া বড় একটা বাড়াবাড়ি করা ভাল দেখায় না। কিন্তু বলিতে ক্রোধে শরীর কম্পিত হইতেছে (লেখনীই বা স্খলিত হইয়া পড়ে) "নলিনীর" প্রথম প্রবন্ধ কি না শিশির? কোন্ অরসিক এ পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন (লাইবেলের ভয় আছে তা না হ'লে প্রকাশককেও এক হাত নিতাম ছাড়িয়া কথা কহিতাম না)? সাহিত্যকাননে কোন্ দিগ্‌গেজ যুটিয়া কোমলা অল্পপ্রাণা "নলিনী"কে নখরবিদারিত করিয়াছে! নির্ম্মম! নিষ্ঠুর! সম্পাদককুলগ্লানি! শুধু যে ইহাতে নলিনীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে তাহা নহে—কিন্তু কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের স্বভাবোক্তিরও যে সেইসঙ্গে একোদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাও কি চ'খে আঙ্গুল দিয়া (আমার মত) দেখাইবার লোক ছিল না?—

অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুম্
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ
হিমসেক বিপত্তি রত্রমে
নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা।

বৃথা কালিদাস তোমার লেখনী ধারণ! তোমার রঘুবংশ (অন্ততঃ অজ-বিলাপটুকু) অতল জলে নিমগ্ন হউক! নলিনীতে আর শিশিরে যে স্বাভাবিক শত্রুতা তোমায় কে শিখাইয়াছিল? আজি তুমি

বাঁচিয়া থাকিলে এই নব্য সম্পাদকের পদপ্রান্তে বসিয়া নূতন করিয়া উপদেশ লইতে তোমায় পরামর্শ দিতাম!

নলিনী ত বাহির করিলেন (আপনি যে নিষ্কর্ম্মা তাহা ইহাতেই প্রমাণ) এখন আপনার এ সাহিত্য জগতের নলিনীতে গ্রাহকরূপ ভ্রমর কি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া জুটিতেছে? (মধু ত গড়াইয়া পড়িতেছে তাহা শিশিরে আর দর্শন শাস্ত্রের কচ্‌কচিতেই বুঝিয়াছি)। এ নলিনী একে শিশিরসিক্তা তায় সাহিত্যামোদী সুধীগণের কৃপা কটাক্ষ-পাত না হইলে, দিনকর-করবিরহে পদ্মিনীবৎ ইহা (ঈশ্বর তা না করুন) শুকাইবার সম্ভাবনা। আমি একটু ছিটা ফোঁটা মন্ত্রতন্ত্র জানি, বলেন ত আপনার শরণাগত হই, মাঝে মাঝে নলিনীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার যত্ন করি। আমার এ ব্যবসায় সখের—আমি পেসাদার নহি। আপনার সৌভাগ্য যে কোনরূপ মাদক সেবন আমার অভ্যস্ত নহে—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অহিফেন চাহিয়া আপনাকে বিব্রত করিব না। যশোলিপ্সাও আমার নাই—আশঙ্কা করিবেন না যে আমি কোন দিন বেনামী নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া ফণা তুলিয়া আপনাকে দংশন করিব। তবে লিখি কেন? লিখি ত অগ্নিগর্ব্বে না দিয়া আপনার গর্ব্বে নিবেদন করিতে বসিয়াছি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে আমার একটু ছিট্ আছে,—হাসিবেন না,—নিজমুখে বলিতেছি বলিয়া কথাটা অলীক মনে করিবেন না। মাঝে মাঝে মন কেমন উদাস হয়—প্রাণের ভিতর হু হু করে—ঘরে থাকিতে পারি না—রাত্রে নিদ্রার পরিবর্ত্তে ঘুরিয়া বেড়ানই ভাল লাগে। এইরূপ সময়ে জনশূন্য রাজপথে,—অমানিশার অন্ধকারে বা পূর্ণিমার কৌমুদীতে—প্রাবৃট্‌সন্ধ্যায় বা নিদাঘনিশীথে—গঙ্গাতীরে বা উদ্যানের অভ্যন্তরে কি ছাই-ভস্ম মনে মনে বকিতে বকিতে ঘুরিয়া বেড়াই। সেই এলো-মেলো ছাইভস্ম কথাগুলো আজি সাদাকালোয় করিব ভাবিয়াছি।

এ গুলোকে পাগলের প্রলাপই বলুন, আর সংসারারণ্যে মনুষ্য-মশার ভন্‌ভনানিই বলুন, আর আমার মাথামুণ্ডই বলুন, আপনার নিকট পাঠাইতেছি—ভাল লাগে পত্রস্থ করিবেন—ভাল না হয় ছিন্ন-কাগজাধারে নিক্ষেপ করিবেন। আমার দুই সমান। আমার লিখিয়াই সুখ—মনের ভার কতকটা লঘু হয়—লিখ্‌তে লিখ্‌তে মনের একাগ্রতা বশতঃ দিব্য ঘুম আসে। পত্রস্থ না করেন ত কথাই নাই—কিন্তু করিলে আপনার লাভ বড় একটা দেখিতে পাইনা—তবে কে জানে এ রসে নলিনীতে ভ্রমর না যুটুক, দুই একটি ভেন্‌ভেনে মাছিও অন্ততঃ আসিয়া উকি ঝুকি মারিতে পারে। ফাঁদ পাতিয়া রাখিবেন—যাই আসা অমনি ধরা।

আত্ম-পরিচয় ত দিলাম। এখন দেখুন আপনার সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিবে কি না। তোষামোদপূর্ণ লোকের মনরাখা কথা আমার নিকট পাইবেন না—আমার যখন যা মনে আসিবে তাহাই বলিব। তার সাক্ষী এই পত্রের আগাগোড়াই আপনাকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়াছি। পাগল হওয়ায় আর কোন লাভ থাকুক আর নাই থাকুক—যাকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালাগালি দেওয়ার বড় সুবিধা। যতই কেন পাগল কটূক্তি করুক না, লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। "সত্যম্ ব্রূয়াত্ প্রিয়ম্‌ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যম-প্রিয়ং" একথা পাগলের জন্য নহে—অপ্রিয় সত্য ত পদে আছে, অপ্রিয় মিথ্যা বলাও পাগলের অধিকার। আমিত উপরেই বলিয়াছি আমার ছিট্ আছে,—যা কিছু বলি গায় মাখিবেন না। তাহ'লেই আমাদের আর মনোভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিবে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি পরিচয় দিব না—ঠিকানাও লিখিয়া দিব না—তাহ'লে কি আর রক্ষা থাকবে?—আপনি হয়ত কোনদিন আমার নামে লাইবেল আনিয়া বসিবেন, নয় আইন নিজ হস্তে লইয়া মারের চোটে আমার

পাগ্‌লামি ছাড়াইয়া দিবেন—বিনা পয়সায় রোজার কায করিয়া দিবেন—তা আমি চাই না। আমার পত্রগুলি নলিনীর কার্য্যালয়ে পাঠাইব— গ্রাহ্য হইল কি না তা পর সংখ্যার নলিনীতেই ধরা পড়িবে —আর আপনাকে এগুলির বিনিময়ে অহিফেন পাঠাইতে হইবে না, ঠিকানা জানায় আপনার প্রয়োজন কি? তবে আজি এই পর্য্যন্ত। আবার সাক্ষাৎ হইবে এই আশায়—

থাকিলাম আমি
আপনার একান্ত
শ্রীআধ্‌পাগ্‌লা।

পুঃ।—সেদিন প্রদোষকালে গ্রীষ্মাতিশয়-বশতঃ পথে পথে বেড়াইতেছি এমন সময়ে একজন ধনীর একখানি চতুরশ্ববাহিতস্যন্দন তীরবৎ বেগে আমার পাশ দিয়া দৌড়িয়া গেল। আর একটু হইলে হয়ত আমার পৃষ্ঠ স্যন্দন-চালক মহোদয়ের বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইত, নতুবা আমাকে চিরদিনের মত পাগললীলা সংবরণ করিতে হইত। ক্ষেপা মন—একটা ফাঁড়া উতরিয়া গেলাম এ কথা ভাবা দূরে থাকুক হঠাৎ বলিয়া উঠিল "সুখ কি?" এইরূপ গাড়ী চড়িয়া দরিদ্র পথিকদিগের প্রাণ বিপন্ন করিয়া বড়মানুষী করাই কি সুখ? মনে যাহা উঠিল সেগুলি আজ আপনাকে লিখিয়া পাঠাইলাম।—

সুখ।

সুখ কি? এ জগৎ-সংসারে কি সুখ আছে? কবিদিগকে এ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কবি যখন যেটাকে বাড়াইতে বা কমাইতে বসেন তখন স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল খুঁজিয়া তাহার উপকরণ যোগাড় করেন।

কোন কোন কবি বলেন প্রণয়ে—প্রণয়ের প্রথম চুম্বনেই স্বর্গীয় সুখ। *

আবার সেই কবিরাই পৃথিবীতে সুখ নাই স্থির করিয়া উহাকে দুঃখের আগার, অরণ্য, অশ্রুপূর্ণ উপত্যকা (**Vale of Tears**) প্রভৃতি আখ্যা দান করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে পাত্রভেদে সুখের প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কবির হৃদয়েরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নানারসে ভাববিন্যাস করিয়া জগদ্বাসীজনের হৃদয়ে সুধা ঢালিয়া দিয়া ভাবরসে জগৎ মোহিত করিয়াই সুখ;—সে রসে তিনি নিজে বিগলিত হয়েন না—তাঁহার জীবনে ওরূপ ভাবলহরীলীলার কোন নূতনতা নাই; কিন্তু যিনি পাঠ করেন তাঁহার হৃদয় কবির প্রতিবর্ণে নাচিয়া উঠে--নিজের অস্তিত্ব, সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া একতান মনে কবির অযত্নসম্ভূত ভাবামৃত পান করিয়া উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হন—এই পাঠকের সুখ। কুসুমের ফুটিয়াই সুখ—কেননা মনুষ্য-পদ যে সকল নিবিড় অরণ্যানী কখন কলঙ্কিত করে নাই, তথায়ও ফুটিয়া রাজোদ্যানে যেমন তেমনি বিটপশোভা সম্বর্দ্ধন করে—তেমনি অকাতরে সৌগন্ধরত্ন ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করে—কৈ নিজের লাবণ্যে সে কখন মোহিত হয় কি?—নিজের সুগন্ধ সে কখন প্রাণ ভরিয়া পান করে কি? কোকিলের গান গাইয়া—চতুর্দ্দিকে স্বরতরঙ্গ ভাসা-ইয়া—আকাশমণ্ডল ও ধরণীতল ছাইয়া—জগৎ মাতাইয়া সুখ;—কোন্ মনুষ্য জীবন ধরিয়া বলিতে পারে যে সে কালকণ্ঠের অপ্সরানিন্দিত তানের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত লয়প্রাপ্ত হয় নাই? কোকি-লের গাহিয়াই সুখ—তা না হইলে সে দেশ কাল পাত্র বিচার-শূন্য হইয়া যখন তখন যেথায় সেথায় মনের স্ফূর্ত্তিতে গাইত না—কুহু কুহু

* Eden revives in the first kiss of love.—Byron.

Love is heaven and heaven is love.—Scott.

কুহু। নিজের স্বরের মাধুরী কত তাহা যদি অবোধ পাখীর বোধ থাকিত তাহা হইলে আমাদের অগ্রে সে অল্প-প্রাণ বিহঙ্গ নিজের কুহুরবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত—তাহাকে আর কুহু কুহু করিয়া দুঃখী মানবের দুঃখবর্দ্ধন করিতে হইত না। পূর্ণিমার শশী, আকাশমণ্ডল ও জগৎসংসার আলোকিত করিয়া—জলে কুমুদিনীকে হাসাইয়া—নিজে যে জগন্মোহন হাসি হাসেন ;—সারা দিনের আতপ-দগ্ধ জীবকুলকে শীতল রশ্মিদানে যে স্নিগ্ধ করেন ;—মানবের মনে যে কত শত কমনীয় ভাবের সৃষ্টি করেন ;—ঐ মৃদুমধুরহাসী জগদুন্মাদকারী কলঙ্কীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি ;—মধুরহাসিকে মধুরতর করিয়া—শীতরশ্মিছটা প্রচুরতর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করিয়া—ভাবে ঢল ঢল হইয়া আকাশবিমানে দুলিতে দুলিতে তিনি উত্তর করিবেন—কিরণ দেওয়া আমার স্বভাব—আমার কিরণ দেওয়াই সুখ।—শুধু স্বভাব বলিয়াও নয়, আমি আলোক পরিচ্ছদে না সাজাইলে আমার রজনীসুন্দরীর এ বাহার হয় কৈ ?—সপত্নী কুমুদিনী জলে আমার মনোহর হাসি হাসে কৈ ?—তা না হইলে, এত সুখ না থাকিলে, আমি আমার এ সৌন্দর্য্য লুকাইয়া রাখিতাম—রজনীর অঞ্চলের পার্শ্বে লুকাইতাম। ঐ যে সরোবরে ফুল্লকমলিনী ভাসিতেছে,—হেলিয়া দুলিয়া লাবণ্যমালায় নীলজলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া নাচিতেছে,—একবার পত্রের আড়ালে অবগুণ্ঠনবতী বঙ্গসুন্দরীর ন্যায় রূপের ছটা লুকাইতেছে—বিদ্যুদ্দামবৎ কটাক্ষ হানিতেছে,—আবার পরিস্ফুট দেখা দিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে ;—আপনার ভাবে আপনি ভোর—উহার জলে ফুটিয়া জলের শোভা সম্পাদন করিয়া লোকমনোহরণ করিয়াই সুখ।—গুন্ গুন্ গুঞ্জনকারী ভ্রমরের চাটুবাণী শুনিয়া তাহার রসালাপে ভুলিয়া তাহাকে মধু দান করিয়া যদি উহার সুখ হইত তাহা হইলে সুযোগ পাইয়া রসিকরাজকে দলমধ্যে আবদ্ধ করিয়া

তাহার ধৃষ্টতার শাস্তি দিত না। যেমন জড়প্রকৃতিতে মনুষ্যেতেও তেমনি। অলোকসামান্যা সুন্দরী কটাক্ষে বিজলী হানিতেছে—যৌবনের ভরে, রূপের ভরে, দেহযষ্টি ঈষদানত—দেহের লাবণ্যে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি ও পদার্থ মাত্রকে লাবণ্যযুক্ত করিতেছে,—কিবা ফুল্লেন্দীবর-তুল্য নেত্র—কিবা সুবঙ্কিম গ্রীবা—কিবা অঙ্গের বলনি—কিবা সুন্দর চাহনি!—রূপে যৌবনে উজ্জ্বলে মধুরে মিলন!—রূপের ছটা বিকাশ করিয়াই—রূপদাবাগ্নিতে পুরুষপতঙ্গ দগ্ধ করিয়াই—কটাক্ষবাণে জগজ্জয়ী হইয়াই উহার সুখ। অপরে যাহা বলে বলুক, এরূপ তরুণীর প্রণয়লাভ বা প্রণয়দান গৌণ উদ্দেশ্য।—কান্তিমৎ স্বর্ণ-নির্ম্মিত বপুখানি লোকের নেত্রের সমক্ষে ধরা, রসমাখা গরিমাময় ভাবে "চোখ আছে যাদের দেখ্ এরূপের কি অপূর্ব্ব কান্তি, কি অতুল মহিমা" বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাসে কথিত আছে, সেকন্দরসাহ তৎকালে পরিচিত সমস্ত দেশ জয় করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন "এ জগৎ অতীব সঙ্কীর্ণ, আমার বাহুবল হেথায় সমগ্র প্রসর পাইল না।" এই লোকমোহিনীও জগজ্জয় করিলে বলিবে "হায় এ অতুল রূপ-রাশি কয়জন দেখিল—কয়স্থানেই বা ইহা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিল?" প্রণয়ে যাহার প্রয়াস তাহার একে লাখ—লাখে এক নহে।

বড় কথা হইতে ছোট কথায় নামিয়া দেখ ফলাহারপ্রিয় লুচিমণ্ডা-প্রয়াসী ব্রাহ্মণের ফলাহার পাইলে সুখ—তদুপরি রজত-খণ্ড দক্ষিণা পাইলে ততোধিক সুখ। বেত্রতাড়িত বালক্রীড়ামোদী পাঠশালের ছাত্রদিগের ছুটি হইলেই সুখ—পাঠশালায় থাকা তাহাদের পক্ষে যম যাতনার অধিক। ছোট ছোট স্কুলের বালকদের শিক্ষকের পীড়াতেই সুখ কেননা সেদিন পড়াও হইবে না অথচ বাটীতে গিয়া পড় পড় শব্দে জ্বালাতন হইতেও হইবে না। মসী-জীবী স্বল্প-বেতন

শ্বেতাঙ্গ-লাঞ্ছিত অভাগা কেরাণীর রবিবারের আগমনেই সুখ কেননা সপ্তাহের কঠিন হংস-পুচ্ছচালনের পর একদিন দেহমন বিশ্রাম করিতে পায়। বঙ্গীয় যুবকের মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ শ্রবণে সুখ কেননা ঐ শব্দের সঙ্গে তালে তালে তাহার হৃদয়-তন্ত্রী নাচিয়া উঠে—স্বভাবতঃই প্রেয়সীর মৃদু-মধুর-নিনাদী চরণ দুখানির তালে তালে পতন স্মৃতিপথে উদিত হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের নবীনাবস্থাব সমস্ত সুখের কথা চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে নবীভূত করিয়া ফেলে।

পরিবর্ত্তনে আবার অনেকে সুখ অনুভব করেন—যাহা আছে তাহার বিপর্য্যয় ঘটনেই (ভালর জন্য কি মন্দের জন্য সে বিষয়ে বিচার করিতে তাঁহারা অক্ষম বা পারিলেও করেন না) অনেকের সুখ বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে বাঙ্গালীবাবুরা বিলাতে গিয়াই (যে মহোদয়গণ বিলাতের নাম ভূগোলেতিহাসে পড়িয়াই ইংরেজ পরিচ্ছদধারী হন তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে আমরা সাহস করি না) আর্য্যপরিচ্ছদ ধুতী উড়ানী পরিত্যাগ করিয়া হ্যাট্‌কোটধারী হইবেন কেন? অন্ন ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া পরমোপকারী নিরীহ গোজাতির উচ্ছেদসাধনব্রতারূঢ় হইবেন কেন?—মাতৃস্তন্যের সহিত শিক্ষিত ভাষা দূর করিয়া বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ভাষাকে মাতৃভাষার স্থানীয় করিবেন কেন? পরিবর্ত্তন-প্রিয়তাবশতঃই সেদিন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত জয়ডঙ্কা বাদিত হয়—আনন্দলহরীতে দেশ ভাসিয়া যায়। দেশের লোক জাতীয়োৎসবে যতটুকু যোগ না দিয়া থাকেন এ কাল্পনিক (অন্ততঃ ফলদ্বারা অপরীক্ষিত) আমোদে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে হৃদয়ের সহিত যোগ দিলেন। নগরে নগরে

মহাসভা আহূত হইল—বক্তৃতার জ্বলন্ত উৎসাহে দেশশুদ্ধ লোকে (বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের অপ্রাপ্তবয়ঃ অজাতশ্মশ্রু বালকগণ) উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সে আনন্দনিনাদ—সে বিজয়ভেরীবাদ্য আজিও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

* * * *
* * * *
* * *

মানবমাত্রেরই আশাতেই সুখ। আশা কুহকিনী সুবর্ণময় তুলিকা হস্তে লইয়া বিবিধ বর্ণে পৃথিবীর দ্রব্যজাত রঞ্জিত করিয়া মানবের চক্ষুঃ, মন, প্রাণ মোহিত করে। আশা আঁধারের আলোক,—দুঃখে সুখ,—মরীচিকায় জল, সৃজন করিয়া মানবের সহিত নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে। মানবরূপ পুত্তলিকে এ সংসারের পুত্তলনাচে নাচাইবার একমাত্র কর্ত্রী—আশা। আশা তারটী ধরিয়া মানুষকে ইচ্ছানুরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে। জ্ঞানহারা অবোধ মানব যাদুকরীর আপাতমনোরম মোহে মুগ্ধ হইয়া সে তার ছিঁড়িতে চায় না,—অথবা চাহিলেও মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় শক্তিহীন হইয়া পড়ে। আশা সংসারের একমাত্র বন্ধন—ইচ্ছা হইলেই গড়িতেছে, ইচ্ছা হইলেই আবার ভাঙ্গিতেছে। বালক যেমন পুত্তলকে ক্রীড়াকালে আদরের সহিত কখন ক্রোড়ে, কখন বা বক্ষে, ধারণ করিয়া, আবার বালস্বভাবচপলতা বশতঃ তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করে—আশাও তেমনি মানবক্রীড়নককে লইয়া আকাশের চাঁদ হাতে দিয়া বহুযত্নে তাহাকে মাথায় তুলিয়া আবার খেয়াল চাপিলেই হতাশের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে।—বালক্রীড়াসক্ত শিশুর ন্যায় তখন তাহার একটুও মমতা হয় না! আশার প্রভাবেই প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা পতির সহিত পুনর্ম্মিলনের পথ চাহিয়া দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে।

আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি।

মেঘদূতম্।

পতি হরকোপানলে ভস্মীভূত হইলে আকাশ বাণীতে বিশ্বাস-রূপ আশা অবলম্বন করিয়াই মনোজপ্রিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। পুনর্ম্মিলনের আশাতেই মেঘদূতের যক্ষ কষ্টে ও নির্ব্বাসনে স্বামীশাপা-বসানাবধি অপেক্ষা করিয়া মেঘকে বার্ত্তাবহপদে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। অকালে সংসারের সার পতি-ধন কুটিল কাল কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে অপহৃত হইলে নববৈধব্যকাতরা জীবনের মমতা শূন্যা কুলবালাকে আশাই আসিয়া কাণে কাণে বলে "শিশুসন্তানটীর লালন পালন ভার গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ কর—কালে ঐ তোমার দুঃখ দূর করিবে।" ধূলি-ধূসরা অমনি ভূতলশয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠে—আলুলায়িত কুন্তল আবার একত্র করে—জীবনে পুনরায় স্পৃহাবতী হয়—এবং যে সংসারকে পূর্ব্বক্ষণে মহাশ্মশান বোধ করিয়াছিল তাহাকেই আবার কত সুন্দর বলিয়া অভাগীর অনুভূতি হয়। আশাপ্রতারিতে! সাবধান!—আবার হয়ত সাতরাজার ধন মাণিক নয়নপুত্তলী অঞ্চলের নিধি পুত্রটীকে বহুকষ্টে বর্দ্ধিত করিয়া কালের করাল ক্রোড়ে শায়িত করিয়া অমনি করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে হইবে—শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে—হৃদয়ের পরতে পরতে ধু ধু করিয়া শ্মশান বহ্নি জ্বলিবে—রাবণের চুল্লীর ন্যায় তাহা আর এ জীবনে নিবিবে না। যে বিদ্যা-মহার্ণবের কূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি বলিয়া মহাত্মা সার আইজাক্ নিউটন আত্মবিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, স্পর্দ্ধী বিদ্যাপ্রার্থীও আশার উপর ভর করিয়া সেই মহার্ণবের জল-গণ্ডূষ পাইবার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করে। সাম্রাজ্যত্যাগী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আশার সহায়েই

হঠাৎ এল্বাদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ধূমকেতুর ন্যায় শত দিবসমাত্র দ্বিতীয়-বার রাজ্যশাসন করিবার জন্য সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের রাজন্যমণ্ডলীকে স্ব স্ব সিংহাসনে টলাইয়াছিলেন। হায়! সেই অবোধ মানব-জেতা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার মত বীরাগ্রগণ্যও আশার মোহ এড়াইতে অক্ষম—অদূরদর্শী ক্ষুদ্রপ্রাণী পরাক্রমগর্ব্বী মানব-কীট বুঝিতে পারে নাই যে এল্বাদ্বীপ পরিত্যাগ করাই তাহার কাল হইবে—ফরাসী ঈগল্ বৃটিশ সিংহের পদদলিত হইয়া দূরসাগর তরঙ্গ-তাড়িত হেলেনা দ্বীপে সেই অদ্ভুত বীরলীলা—সেই ইয়ুরোপ-গগণে ধূমকেতু-লীলা সম্বরণ করিবে। আশার উপর নির্ভর করিয়াই যবন স্বর্ণভূমি ভারতে আসিতে সাহসী হইয়া লুব্ধ শৃগালের মত শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে—সপ্তদশ সৈনিক কর্ত্তৃক বঙ্গাধিকারে সে বিজয় তৃষা অর্থলালসা পর্য্যবসিত হয়—ভারতবাসীর—বঙ্গবাসীর শোণিত-স্রোতো-মধ্যে তাহাদের জয়পতাকা নিখাত হয়। আশামায়াবিনীই কুহকজাল বিস্তার করিয়া সমস্ত ভারতসাম্রাজ্যরূপ প্রলোভন দেখাইয়া বণিকমণ্ডলীর সেনানী ক্লাই-ভ্কে সোনার বাঙ্গালায় আকর্ষণ করিয়া আনে। আশার সাহায্যেই ক্লাইভ্ জয়ের উপর জয়লাভ করিয়া পলাশীর "গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকাননে" শিবির সন্নিবেশ করেন—আশার কুহকে মুগ্ধ পাপিষ্ঠ বিশ্বাসহন্তা মিরজাফরের সহায়ে বলীয়ান্ হইয়া পরদিন প্রাতে সাগর তরঙ্গবৎ অসংখ্য নবাবসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে বিজয় লক্ষ্মীকে ক্রোড়স্থা করেন।

যাউক, পাগলের মন—কি বলিতে বলিতে কি বলিয়াছি। ধান ভানিতে শিবের গীত আনিয়া ফেলিয়াছি!

অনেক যশোলিপ্সু কবি ও সদ্‌বক্তা, দার্শনিক ও রাজনীতিবেত্তা-যশের মন্দিরে একটু স্থান লাভ করা সুখের চরমোৎকর্ষ মনে করেন। সেই উদ্দেশে তাঁহারা যশের মন্দিরাভিমুখে যাত্রীর স্রোত বৰ্দ্ধিত করিয়া,—কণ্টকপূর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া,—(কেহ বা রক্ত-স্রোতের মধ্যদিয়া গিয়া),—যাত্রীর জনতা-নিষ্পীড়িত হইয়া মন্দিরের সন্নিকটে পৌছেন।—পৌছিয়া দেখেন এত যত্নের পর তাঁহারা এক সমুন্নত গিরির পাদদেশে মাত্র উপস্থিত—সেই গিরির শিখরোপরি তাঁহাদের উপাস্য দেবতার মন্দির বিরাজিত! কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা সেই দুর্গম গিরিদেহে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন—ভগ্নপদ ধূল্যবলুণ্ঠিত, গিরি-দেহ-স্খলিত পূৰ্ব্ববর্ত্তী যাত্রীদের সানুতাপ আর্ত্তনাদেও তাঁহারা ভগ্নোদ্যম হন না। কিন্তু হায়, কয়জন সে গিরির শিখরদেশে আরোহণ করেন—কয়জনই বা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া যশের ভেরীতে স্ব স্ব নাম নিনাদিত হইতে শুনেন!!

কৃপণের ধন-সঞ্চয়েই সুখ। সর্ব্বসুখে বঞ্চিত তৃষাপ্রতারিত হতভাগ্য রাশি রাশি অর্থসংগ্রহ করিয়াও পরিতুষ্ট নহে—মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আজীবন অর্থসংগ্রহেই ব্যস্ত।—অর্থই তাহার উপাস্য দেবতা—অর্থই ধর্ম্ম—অর্থই স্বর্গ। মূর্খ আপনাকে বঞ্চিত করিয়া, পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির কষ্টে অন্ধ হইয়া, দেশের হিতে বিমুখ হইয়া—দিনান্তে সাবধানে গোপনে সঞ্চিত অর্থরাশি দর্শন করিয়াই সুখলাভ করে—কি জীবনে কি মরণে তাহার কপৰ্দ্দকও তাহার নিজকার্য্যে আসেনা। তোষামোদপ্রিয় নির্ব্বোধ ধনবান ব্যক্তি চাটুকার বেষ্টিত হইয়া অযথা প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়াই সুখী

হয়। অর্থমদে মত্ত বিবেক্ শূন্য পশু বুঝিতে পারে না যে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে চাটুকারেরাও অন্তর্ধান করিবে—যে বসন্তের আগমনে কোকিল আসে, সেই বসন্তাপগমে আবার কোকিল অন্তর্হিত হয়—তখন দুঃখ-দারিদ্র্য ও অনুতাপের ক্রন্দনই অভাগার সম্বল হইবে।

ধার্ম্মিকের ধর্ম্মাচরণেই সুখ। সংসার-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর-সহবাসে তিনি কালযাপন করেন। ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য।—ঈশ্বরারাধনাতেই তাঁহার একমাত্র সুখ। এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ইহ জীবনেই স্বর্গীয়সুখ অনুভব করেন। তাঁহার পক্ষে ইহ পরলোক দুই এক। পুরাতন আর্য্য ঋষিগণ এই সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই, অনন্যকর্ম্মা হইয়া হিমালয়ের তুষারধবল সমুন্নত শিখরে স্বর্ণ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে, গহন কাননে বা জনশূন্য প্রান্তরে, জগৎস্রষ্টার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া এ নর-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। হয়ত, আর্য্য ঋষিগণের প্রণবোচ্চারণপূত এইরূপ অনেক নির্জ্জন স্বভাব-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ স্থান অদ্যাপি আধুনিক জনগণের আদৌ নেত্রপথবর্ত্তী হয় নাই।

আর আমি এই হতভাগ্য সুখ সুখ করিয়া ঘুরিতেছি, সুখ কোথায় তা ত খুঁজিয়া পাইনা। বাল্যে যে সকল সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছি, আজি সে সকল কোথায়? কল্পনা-সহায়ে বিরলে বসিয়া যে সকল রমণীর সুখের ছবি আঁকিতাম, যে সকল মনোরম অট্টালিকা গড়িতাম, সে সকলই বা কোথায়? ক্রূর কাল কঠিন নির্ম্মম হস্তে সে সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। তাহাদের স্থানে সেই নয়ন-প্রীতিকর দৃশ্য সকলের পরিবর্ত্তে এখন চারিদিকে আঁধার দেখিতেছি। যে জীবনকে স্বচ্ছ-সলিলা, নলিনীসনাথা সুখ-সরসী মনে করিয়াছিলাম, তাহা কপাল ক্রমে মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে। যাহাকে কল-

পুষ্প-শোভিত তরুলতামণ্ডিত সুখসেব্য উপবন মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহা আফ্রিকার মহামরুর ন্যায় চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে। কোথায় সে সকল আশা, যাহারা উচ্চতায় আকাশকেও পরাজিত করিয়াছিল?—কোথায় সে মনের ভাব, যাহাতে পার্থিব-দ্রব্যজাত নূতনতর বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত? কোথায় সে বাল্য-বন্ধুত্ব, যাহাতে সংসার স্বর্গধাম বলিয়া অনুভূত হইত? কোথায় সে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন—কোথায় সে স্নেহ-মাখা ঢল ঢল ভাব? প্রতিধ্বনি বলে—কোথায়? আমি যে সেই—এ জগৎ সংসারও যে সেই—এত সুখের আশা যে স্বপ্নমাত্র, তাহা প্রমাণ-সত্ত্বেও প্রত্যয় হয়না। আমিও যদি সেই, মনও যদি সেই, তবে এমন হইল কেন?—তবে এ জীর্ণ আজ শাখাপ্রশাখা শূন্য, পত্রফলপুষ্পবিবর্জ্জিত মৃত [illegible]এর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে কেন?—তবে কেন [illegible] লোক নাই—এ মনে উৎসাহ নাই—এ দেহে পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি নাই? হায়! অন্তর্যামী ভিন্ন এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?

এ সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি সুখের আশায় কত কি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সুখত আমার কপালে ঘটিয়া উঠিলনা। মৃদু মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া লোকের মনে কত সুখোদয় হয়, ভাবে ভোর হইয়া শ্রোতা নেত্র-যুগল দিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন। সঙ্গীতের স্বর্গীয় মাধুরীতে যে না মোহিত হয় সে মনুষ্যই নয়, তাহার হৃদয় কদাপি মানবীয় উপকরণে গঠিত নহে। তাই কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি প্রশ্নচ্ছলে বলিয়াছেন:—

"Is there a heart th[at] music cannot melt?"

তাই আমাদের [illegible]য় চিরপ্রথিত বচন "গানাৎপরতরো নহি" মান[illegible] কথা দূরে থাকুক, ইতর প্রাণীরাও সঙ্গীতরসে মুগ্ধ। মনুষ্য-

জাতির চিরশত্রু দ্বিতীয় কালের অবতার সর্পজাতি পর্য্যন্ত সঙ্গীতের মোহে শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আপনা হইতেই মনুষ্যের জালে পতিত হয়। যে সঙ্গীতের এত মনোহারিণী শক্তি, তাহাতে আমার হৃদয় সুখে উথলিয়া উঠে কৈ? তাহাতে ভাব-সমুদ্র-মথিত হয় বটে, কিন্তু সে মন্থনে শুদ্ধ অমিশ্র অমৃত উঠে কৈ? সে মধুরিমা ও বিষমাখা, তাহাতে হৃদয়ে উৎসাহ অপেক্ষা অধিকতর ব্যথা জন্মে; তাহার প্রতি লয়ে মনে হয়, যেন কি হারাইয়াছি—যেন কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অভাব হইয়াছে—যেন হৃদয়ের তন্ত্রী ছিন্ন হইয়াছে, তাই সঙ্গীতের সুমধুর কোমল তানে উহাতে তদনুকারী কোমল প্রতিধ্বনি হয় না। এ দুঃখ কারে জানাই? এ মর্ম্মবেদন কে বুঝে?—আ[illegible] কি নাই, তা আমি নিজে স্থির করিতে অক্ষম, অন্যে কে তাহা [illegible]য় করিয়া দিবে? লোকালয়ে প্রাণ কেমন করিলে নির্জ্জনে [illegible] কিন্তু তথা[illegible]ও স্থির হইতে পারিনা। মনে যে কত কি চিন্তা উদিত হয়, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য আবার লোকালয়ে মিশি। এ সংসার-অরণ্যে দুঃখ-দাবদগ্ধ কুরঙ্গবৎ ছট্ ফট্ করিয়া আর বেড়াইতে পারিনা—আর এ সুখতৃষায় রাতদিন ভাজা ভাজা হইতে পারিনা—এ শ্মশান-বহ্নি হৃদয়ে আর বহন করিতে পারিনা।

শুনিয়াছি, শরচ্চন্দ্রের সুকোমল রশ্মিছটা অবলোকন করিয়া লোকের মনে সুখার্ণব উদ্বেল হইয়া উঠে।—আমার মনে সে ভাব হয় কৈ? চন্দ্রমার ও রসভরা হাসি আমার বিষময় বোধহয় কেন? বোধহয় যেন ও হাসি ব্যঙ্গের হাসি—শশী যেন উচ্চস্থান হইতে উপহাস করিয়া বলিতেছেন, "ক্ষুদ্র মানব! তুই সুখ সুখ করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিস্, দ্যাখ্ আমার সুখ কত! এই অনন্ত আকাশ আমার সিংহাসন—এ সিংহাসন যে সকল অমূল্য অসংখ্য রত্ন- খতে

খচিত, মানব তাহা দূর হইতে দেখিয়াই বিস্মিত হয়! কি ছার এ সিংহাসনের কাছে মানব সম্রাট্ সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসন! কোথায় এ উজ্জ্বল হীরকসকলের কাছে নিষ্প্রভ পার্থিব কোহিনূর!”

ছি শশী! তোমার এই কায? দুঃখী দেখিয়া কোথায় পরদুঃখ-কাতরতায় ব্যাকুল হইবে, না—হাসিয়াই বিকল? দেবকুলে জন্মিয়াও কি তোমার চরিত্র স্বার্থপর মানবের দোষ-স্পৃষ্ট হইয়াছে? হাস, প্রাণ ভরিয়া হাস, যত পার অবসর পাইয়া উপহাস করিয়া লও। তোমারও একদিন আসিবে, যখন আকাশ-সিংহাসন নিবিড় তমসের হস্তে দিয়া তোমায় লুকাইতে হইবে—ও মনো-মোহন রূপ দেখিয়া কুমুদিনীও ভুলিবেনা, সুন্দরীও গরবের হাসি হাসিবেনা। এ বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা পক্ষপাত-শূন্য। আমি ক্ষুদ্র মানবকীট, আমাকেও যেমন আজি চ'খের জলে ভাসিতে হইতেছে, উচ্চাকাশ-বিহারী লোক-প্রাণ তোমাকেও একদিন তেমনি করিয়া কাঁদিতে হইবে—তখন এ ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও গগণের গায় দৃষ্টিগোচর হইবে না।

সুখের অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে ভাগীরথী-তীরে যখনই যাই, কেবল সেই জলের অনন্ত কুলকুলই শ্রুতিগোচর হয়। এ কুলকুল-রব আমার দুঃখে দুঃখ-প্রকাশ, কি গরবিণী তটিনীর আনন্দোচ্ছ্বাস, তাহা তাহার ও আমার সৃষ্টিকর্ত্তার গোচর। সে মৃদুমধুর কুলকুল-রব শুনিয়া, তীরস্থ তরুলতার সন্ধ্যাকালীন শোভা—প্রাসাদময়ীনগরীর দূর-বিস্তৃত সৌধমালার অপূর্ব্ব শ্রী—গ্যাস-মালায় সজ্জিত প্রশস্ত রাজপথের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া, মন মোহিত হইয়াও হয় না—কেমন পোড়া মন, শান্ত হইয়াও হয় না। মন! অদূরে ঐ সেতু দেখি, গরবিণী সুরতরঙ্গিণী বৃটিশ্ দাসত্বের নিগড়-স্বরূপ কেমন অপূর্ব্ব সেতু বক্ষে ধারণ করিতেছে; পতি-মিলনে বাধাপ্ত পাইয়া অভি

মানিনী অপমানে অধীরা হইয়া দেহ স্ফীত করিতেছে—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া সেতুমূলে আঘাত করিতেছে; সেতুর উপর দিয়া অশ্ব, যান ও মনুষ্যের স্রোত অবিরল প্রবাহিত হইতেছে; উভয় পার্শ্বস্থ আলোকমালার প্রতিবিম্ব ঊর্ম্মিমালায় পড়িয়া অসংখ্য দীপাবলিতে পরিণত হইতেছে; নিম্ন প্রদেশে মাঝীরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম লইয়া কেমন কৌশলে নৌকা বাহিয়া যাইতেছে;—দেখ কেমন তালে তালে দাঁড়পতনের ছপ্ ছপ্ শব্দ মহানগরীর দূরাগত শান্ত কোলাহলসঙ্গে মিশিতেছে! ওদিকে কাণ পাতিয়া শুন দেখি, মন্দান্দোলিত গঙ্গাবক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী কেমন দ্রুত তরতরশব্দে ভাগীরথীর ... জল ভেদ করিয়া ছুটিতেছে; উহার ছাদের উপর বসিয়া একজন আরোহ... মনের স্ফূর্ত্তিতে কেমন সুমিষ্ট গীতলহরী ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে। ঐ জ্যোৎস্নাসিক্ত নৈশ আকাশ—ঐ শ্বেত স্ফটিকময় জলে চন্দ্রনক্ষত্রের প্রতিবিম্ব—ঐ কৌমুদী-মিলনে গঙ্গার চল চল ভাব—তাহার সঙ্গে ঐ সুস্বর সঙ্গীতলহরী—এমন "উজ্জ্বলে মধুরে মিলন" দেখিয়াও কি তুমি মুগ্ধ হইবে না?—মুহূর্ত্তের জন্যও নিজদুঃখ ভুলিবে না?—পাগল মন তবু বুঝে কৈ? কেবল ইচ্ছা করে গঙ্গার কুল্ কুল্ শব্দের সহিত ক্রন্দনের স্বর মিলাইয়া গঙ্গার অনন্ত প্রবাহে চক্ষের জল মিশাই—এ নীরবে ক্রন্দন মনুষ্যে না জানিতে পারে। মা! আর কেন? এ সংসারের সুখ ত যথেষ্ট হইয়াছে, এখন ক্রোড়ে একটু স্থান দিবে কি? প্রকৃতি-সুন্দরীর এই মধুর কান্তি দেখিতে দেখিতে, জগৎ-সংসারের এই শান্তিবিরাজিত ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, একবার বিশ্বপাতাকে স্মরণ করিয়া, তোমার অতলজলে ঝাঁপ দিয়া এ হৃদয়ের জ্বালা চিরদিনের তরে নিবাই—এ অসার জীবন যাঁহার দত্ত, তাঁহার হস্তে পুনঃসমর্পণ করি। মা! এ দেহে ত কখন কাহারও কোন

উপকার হয় নাই, অন্তে যদি ইহা মকরকুম্ভীরাদিরও ভক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও ইহা কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইবে। আমি মরিলে ক্ষতি কার? সংসারের? যে সমাজ-সমষ্টির মধ্যে শূন্যমাত্র, যাহাতে সমাজের কোন প্রয়োজন নাই, তাহার জীবন মরণ সংসারের পক্ষে সমান।—আত্মীয় স্বজনের? আমার কেহ নাই, ত আমার জন্য কাঁদিবে কে? কাঁদিবার, তত্ত্ব লইবার, যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে আমি শূন্য-হৃদয়ে সংসারে মমতাশূন্য হইয়া হাটে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইতাম না।

না—মরা ত হইবে না। একে ত আত্ম-হত্যা [illegible] বল ঐ কেননা আমার জীবন যাঁহার নিকট পাইয়াছি তিনি না খত পর্য্যন্ত এ গচ্ছিত ধন যত্নে রক্ষা করিতে হইবে; তাতে আব. অকস্মাৎ জানিয়া শুনিয়া চিরদিনের মত অনন্ত আঁধারে আত্ম-বিসর্জ্জন—স্মরণেও হৃদয় ত্রাসে কাঁপিয়া উঠে—আমা হইতে ত তাহা হইবে না! কিন্তু মনে যে অবিশ্রান্ত অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার হাত কোথায় গেলে এড়াই? তবে জগদীশ! এ কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় পথভ্রান্ত পাগলকে সুপথ দেখাইয়া দেও। এই শুষ্ক ফল-পুষ্পহীন জীবন-মরুতে সুখের সরসী আবির্ভূত কর—তাহাতে ফুল্ল কমলিনী বিকাশিত কর—দেখিয়া মনপ্রাণ মুগ্ধ হউক। অন্ততঃ একদিনের তরেও শান্তিজল দিয়া এ দাবাগ্নি নিবৃত্ত কর—এ নৈরাশ্যে আশার সঞ্চার কর—এ ভগ্ন-পিঞ্জরে কলনাদী বিহঙ্গের সৃষ্টি কর—এ শ্মশানে শিখাবিস্তারী, দিগন্তব্যাপী চিতা-নল শমিত কর—যে চিতানল চিরদিন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—যাহার বিরাম নাই, হ্রাস নাই, অন্ত নাই—এ শীততুহিন-পীড়িত বল্লরীকে বসন্তবায়ুহিল্লোলে পুনর্জ্জীবিত কর—এ প্রাবৃট্ অমানিশায় শারদ-জ্যোৎস্নার বিকাশ কর—এ হৃদয়ের হলাহল সুধায় পরিণত কর—

এ দুঃখের আধারে সুখের আবির্ভাব কর—এ হতভাগ্য বুঝিয়া চরিতার্থ হউক এ জীবনে "সুখ কি"।

প্রলাপ।

১

মন।
তবে তুই যাইবি কোথায়?
থাকিবে এ বাসে যদি, কাঁদিবি রে নিরবধি,
জানিনা ত তবে তোর কি হবে উপায়,
ধন-যৌবন-সুখে, বিসর্জ্জিবি কোন্ দুখে,
সোনার সংসার বল্ সঁপিবি কাহার,
তোর আর কে আছে হেথায়?

২

কেন তুই হইলি এমন?
কে তোরে কি করিল, এ বাদ কে সাধিল,
ভাবিস্ কাহার তরে তুই সর্ব্বক্ষণ?
নির্ম্মল অম্বর-চিতে, কোথা হ'তে আচম্বিতে,
সহসা এ ঘনঘটা দিল দরশন?—
নাহি মান প্রবোধ বচন।

৩

বিচ্ছেদে যে বিষম যন্ত্রণা,
জানিতাম যদি হায়, কভু কি সে ললনায়,
সঁপিতাম তোরে, শুনে প্রেমের মন্ত্রণা?
কে জানে এমন হবে, চির দিন জ্বালা রবে,
দু'দিনে পিরীতি যাবে করিয়ে ছলনা,
কে জানে প্রণয় বিড়ম্বনা!

৪

ভাল আমি (ই) যেন অপরাধী ;
(না জেনে না বুঝিয়ে,　　　অনুরাগে মজিয়ে,
এখন তাহার লাগি দিবানিশি কাঁদি ,)
তোর কি রে এই কাজ,　　　তেযাগি আমায় আজ,
তার জন্য হতে চাও মোর প্রতিবাদী ?—
সে কি সাধে, আমি যত সাধি ?

৫

এ বিকার কেন রে তোমার ?
শুনি ত সকলে কয়,　　　এ [illegible]
হ'ল কি তা তোর ভাগে
বিলাস মন্দির ধরা,
দেখেও হয় না কি রে সুখের
বিপরীত সব অভাগার ?

৬

দেখে দেখে তোর দুঃখরাশি,
জানি না কি করিব,　　　কোথা গিয়ে রহিব,
ভাল জ্বালা হ'ল মোর তোরে ভালবাসি ;
তোর তরে কি এখন,　　　সব দিব বিসর্জ্জন,
ভাই বন্ধু পরিজন প্রিয় প্রতিবাসী,
তোরে লয়ে হব কি সন্ন্যাসী ?

ন

শিশির।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শীতকালে বিলাতে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে

যে পরিমাণ ঠাণ্ডা হইলে জল জমিয়া যায়, বাগানের বায়ু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক শীতল হইলে "হোরফ্রষ্ট" জমিয়া বৃক্ষাদির অঙ্কুর ও ছোট ছোট তৃণ লতাদি নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন সন্ধ্যার সময় পৃথিবী হইতে উত্তাপ বহির্গত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহার ঠিক উপরিস্থিত বায়ুর উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় এবং কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। ওয়েলস মহোদয়ের তাপমান পরীক্ষা বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে যদি বৃক্ষলতাদির উপর কোন আবরণ
'ন্য ঊর্ণনাভের জাল থাকিলেও কোন
ঐ আবরণ নিবন্ধন উত্তাপ বহির্গত
র্ন হইতে পারেনা। এই সম্বন্ধে আমরা
পণ্ডিতবর ওয়েলস সাহেবের "শিশির সম্বন্ধীয়" প্রস্তাব হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—"যখন আমি শিশির জন্মিবার প্রকৃত কারণ বিদিত ছিলাম না, তখন বাগানের মালিরা শীতল বায়ুর হস্ত হইতে ছোট ছোট তৃণ লতাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল উপায় উদ্ভাবন করে, তাহা দেখিয়া তাহাদের মূঢ়তার জন্য কতবার মনে মনে হাসিয়াছি। তখন ভাবিতাম যে মাদুর বা তদনুরূপ অন্যান্য আবরণ, উহাদিগকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, তাহাদের অপকার ভিন্ন উপকার করে না। কিন্তু যখন শিখিলাম যে পরিষ্কার ও স্থির রাত্রিতে পৃথিবীর উপরিস্থ দ্রব্যাদি হইতে উত্তাপ বহির্গত হইয়া উহাদিগকে শীতল করে, তখন যে উপায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে ঘৃণা করিয়াছিলাম, সেই উপায়ের শুভদায়িত্ব বুঝিতে পারিলাম।"

বঙ্গদেশে স্বাভাবিক বরফ জন্মায় না, কিন্তু এদেশে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিবার প্রথা আছে এবং যদি না থাকে তাহা হইলে সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা সকল সময়ে দুঃসাধ্য। শীতকালে পরিষ্কার রাত্রিতে কোন ফাঁকা জায়গায় একটী ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহার কিয়দংশ খড় বা তুঁষ দ্বারা পরিপূর্ণ করতঃ, তদুপরি একখানি চিটকাল পাত্র (নূতন মৃণ্ময় পাত্র যথা "সরা") জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া তৎপর দিবস প্রাতে বারির পরিবর্ত্তে ঐ পাত্রে একখানি বরফ দৃষ্ট হইবে। তাহার কারণ এই যে রাত্রিতে ঐ জল হইতে উত্তাপ উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়। যদি বল ঐ পাত্র মৃত্তিকা সংলগ্ন থাকায় পৃথিবী হইতে যে উত্তাপ উত্থিত হয় তাহা দ্বারা আবার গরম হইবে সুতরাং বরফ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তাহার উত্তর এই যে ঐ পাত্রের নিম্নে খড় থাকাতে পৃথিবী হইতে উত্থিত উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। অমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খড় তুঁষাদিরা তাহাদের সংলগ্ন দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে উত্তাপ প্রদান করিতে পারেনা। এই শ্রেণীভুক্ত বস্তুগুলিকে "নন্-কন্ডকৃটার" (Non conductor) কহে এবং যাহাদের উত্তাপ সম্বন্ধে খড়তুঁষাদির বিপরীত গুণ, তাহাদিগকে (Conductor) "কন্ডকৃটার" বলে।

আমরা কৃত্রিম বরফ জন্মিবার যে উপায় দর্শাইলাম উহা ওয়েলস মহোদয়ের স্বকপোল কল্পিত।

প্রোফেসার টিন্ডল বলেন, যে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত রাত্রি শুদ্ধ পরিষ্কার হইলেই হইবে না, কিন্তু তৎসমভিব্যাহারে বায়ু শুষ্ক থাকা আবশ্যক। স্যার রবার্ট বার্কার বলিয়াছেন, যেসকল রাত্রি স্থির ও পরিষ্কার ও যাহাতে রাত্রি দুই

প্রহরের পর শিশির জন্মায় না, ঐ সকল রাত্রিই বরফ জমিবার পক্ষে অনুকূল; অর্থাৎ ঐ সকল রাত্রিতে জমীর বাষ্প অপেক্ষাকৃত ন্যূন থাকে। যাহারা কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করে তাহারা রাত্রিতে দুই তিন বার পাত্রের খড় বদলাইয়া দেয়। ওয়েলস সাহেব বলিয়াছেন, যে খড়ের উপর শিশির পড়িয়া ভিজিয়া যাওয়ায় উহাদের একদ্রব্য হইতে অন্যদ্রব্যে উত্তাপ প্রদান না করিবার যে গুণ আছে, তাহা কথঞ্চিৎ কমিয়া যায়। টিণ্ডল সাহেব, ওয়েলস সাহেবের অনুমোদন করিয়া বলেন, যে ভিজা খড় হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, ঐ বাষ্প পাত্রের উপর আবরণের কাজ করায় জল ঠাণ্ডা হইতে পারে না।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে এইরূপে প্রতি শীতকালে বরফ প্রস্তুত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ নগরে প্রায় ২০০ বিঘা প্রশস্ত একটী মাঠ আছে, উহাকে বরফখানা বলে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি শীতকালে সেইখানে বরফ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যে যে দিবস অত্যন্ত শীত পড়ে, সেই সেই দিবস প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত লোকজন ঐ বিস্তৃত মাঠে খড় বিছাইয়া তদুপরি লক্ষ লক্ষ খুরি পাতিয়া জল দিয়া রাখে। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে ঐ সমস্ত খুরির জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। ঐ বরফ শুভ্র হয় না, খুরিতে ময়লা থাকাতে ও অপরিষ্কার জল নিবন্ধন বরফও ময়লা হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলেই ঐ বরফ তুলিয়া বড় বড় কলসীতে জমা করে ও একটী বড় অন্ধকার গর্ত্তে ফেলিয়া রাখে এবং গ্রীষ্মকালে ঐ বরফ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে হুগলীতেও ঐরূপে বরফ প্রস্তুত হইত।

শ্রীআশুতোষ বসু; বি, এ।

রজনী-প্রভাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভৈরবী সহসা চমকিল: শিশু-দেহ স্পন্দিত হইতেছে—আরক্তিম-চম্পক-নিভ ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি থাকিয়া থাকিয়া উত্থিত হইতেছে। কৌতুহলবশা সন্নতাঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিল যে, সেই কুসুম কলিকায় এখনও সুধাবিন্দু রহিয়াছে—সেই নবোদিত-শশাঙ্ক-রেখার সুষমা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই—সেই ক্ষুদ্র সুবর্ণ মন্দিরে জীবন-প্রদীপ এখনও নিবিয়া যায় নাই। অলক্ষিত ভাবে স্নেহ তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া শিশুর প্রতি মমতা জন্মাইয়া দিল—সুস্নিগ্ধ শিশু-দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইতে ভৈরবীর বাসনা হইল।

স্নেহ! তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তোমার সুকোমল গুণে বিশ্বচরাচর আবদ্ধ! তোমার অবস্থানে, সৃষ্টিস্থিতি—অপগমে, প্রলয় অনিবার্য্য! তুমি জড় দেহে আছ বলিয়া, লৌহ চুম্বকপ্রতি ধাবমান হয়; বারি দুগ্ধের সহিত মিশিয়া যায়; বৃক্ষলতাদি মূলদ্বারা রসাহরণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে; সৌর জগতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে—বিশ্ব, চরাচর বস্তুনিচয়কে, হৃদয়োপরি স্থান দিয়া রাখিয়াছে!—তুমি স্থাবর শরীরে আকর্ষণ-শক্তি! মানব-হৃদয়ে বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রণয়, প্রেম প্রভৃতি বিবিধ রূপে বিরাজমান! যে হৃদয়ে তুমি নাই, সে হৃদয়ই নহে—যাহার সে হৃদয় সে পিশাচাধম! তুমি অতুল কুহকী!—জগতে কঠোরব্রতা-

চারী তাপসবৃন্দও তোমার মায়ায় মুগ্ধ—তাপসবর কণ্ব ও রাজর্ষি-ভরত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ!

ভৈরবী আজ ঋষিযুগলের অনুবর্ত্তিনী হইল—তাহার স্ত্রীজনসুলভ সুকোমল হৃদয় ক্রমশঃ স্নেহের কুহকে বিজড়িত হইয়া পড়িল। সে থাকিতে পারিল না—দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সযত্নে শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইল। আনন্দোচ্ছ্বাসে শিশুভিন্ন তাহার আর কিছুই মনে স্থান পাইল না—সে মর্ম্মভেদী ভীষণ হত্যাকাণ্ড বিস্মৃতা হইল, বিদ্রূপকারী চন্দ্রকে ভুলিল এবং তাহার প্রিয়সহচর ত্রিশূলাস্ত্রকেও ভূমি হইতে তুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেল। ভৈরবী আর সেই বিজন পথি মধ্যে দাঁড়াইল না—শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—ছুটিতে ছুটিতে প্রাণ ভরিয়া কোকিলকণ্ঠে গাইল :—

" কার কণ্ঠমালা ছিঁড়ি সই! হারাল রতন?
মন প্রাণ জুড়াইল হৃদয়ে করি ধারণ,—
সই এ অমূল্য ধন! "

গীতিবিমুগ্ধা প্রতিধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে গগণের শূন্যোদর পূর্ণ করিয়া গাইয়া উঠিল :—

" মন প্রাণ জুড়াইল হৃদয়ে করি ধারণ,—
সই এ অমূল্য ধন! "

দ্রুতবেগে ছুটিয়া ভৈরবী অদৃশ্যা হইল—নিশানাথও নিশাজাগরণে অলসে অবস হইয়া পশ্চিমাচলে ঢলিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০—

বিজয়কৃষ্ণ।

অপ্রতিহতবেগে নিরন্তর অনন্ত-কাল-সঙ্গমে ছুটিতেছে—কাল-স্রোত; তদুপরি জীবন-তরি ভাসমানা। যদি সুনিপুণ নাবিক হও—সুচারুরূপে হালি ধরিতে পার, মেঘ দেখিয়া অভ্রান্তচিত্তে মীমাংসা করিতে পার যে উহার অন্তরালে ভয়ঙ্করী বাত্যা প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিতেছে বা আসিবার সম্ভাবনা নাই—তবে তরঙ্গাঘাতে নাচিতে নাচিতে, হেলিতে দুলিতে, অভিলষিত মনোহর কুসুমাস্তৃত উপ-কূলে উত্তীর্ণ হইবে, নতুবা ক্ষুদ্র তরণীখানি উপলসঙ্কুল-মরুতট-প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনন্ত-কাল-গর্ভে প্রবিষ্ট হইবে। সহৃদয় বামাচরণ সুনিপুণ নাবিক ছিলেন—নিজগুণে পরিশ্রম সহ-কারে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদোক্ত যামিনীতে তাঁহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইল—হত্যাকারীর ছায়া-মেঘ দেখিয়াও সমুপস্থিত-বিপদ-মীমাংসাকরণে ভ্রান্তি জন্মিল: ক্ষণভঙ্গুর জীবন-তরিও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অনন্তকাল-গর্ভে নিহিত হইল। বিজয়-কৃষ্ণ ব্যতীত বামাচরণের "আপনার" বলিতে এই সংসারে অপর কেহই ছিল না—পরিজনমধ্যে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতি, আশৈ-শব তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। বামাচরণ বিজয়কৃষ্ণকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন, নিজ ব্যয়ে লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন এবং যাহাতে বিজয়ের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিজয় তাঁহার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কোন দিবস বিশেষ কার্য্যানুরোধে বামা-চরণ স্বয়ং রোগীদিগকে দেখিতে যাইতে না পারিলে, বিজয়কে

প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিতেন—তিনি যে রূপ* ঔষধ পথ্যাদি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বামাচরণ মনে মনে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইতেন। হরেন্দ্রনাথ বামাচরণের অনুরোধে বিজয়কে নিজ পারিবারিক সহকারী চিকিৎসকপদে নিয়োজিত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

হত্যাকাণ্ডের পর দিবস হইতে মেদিনীপুরস্থ কেহই বিজয়কৃষ্ণকে দেখিতে পায় নাই—তিনি এক নিভৃতকক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিতেন। কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ভৃত্য-প্রমুখাৎ শুনিতে পাইত যে “বাবু অতিশয় শোক পাইয়াছেন, রাত দিন কাঁদিতেছেন, এক্ষণে তাঁহার যে রূপ অবস্থা তাহাতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব।”—দর্শনাকাঙ্ক্ষী সুতরাং হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। বস্তুতঃ উপকৃত বিজয়কৃষ্ণ যে সহোদর সম উপকারী বামাচরণের বিয়োগ জন্য শোকাভিভূত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। শোক! তুমি সহস্র-দিবাকর-প্রখর-তাপে মণ্ডিত! তোমার অপ্রতিহতগতি! তুমি দয়ালেশ-শূন্য! মায়া-সখ! যেখানে মায়া সেই স্থানেই তুমি। সংসারে যাবতীয় প্রাণী মায়ার বশবর্ত্তী, অতএব তোমারও অধীন। অনন্তকালব্যাপী হুতাশন যে হৃদয় স্বল্পমাত্র তাপিত করিতে অক্ষম, তুমি মুহূর্ত্তে তাহা দগ্ধ কর! যে অগ্নিশিখা, তুমি মনোমন্দিরে জ্বালাইয়া দাও, তাহা সময়-স্রোত ব্যতীত অপর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে! পতিপুত্র-বিয়োগ-বিধুরা স্নেহময়ী ললনা নয়নাসারে ধরণী সিঞ্চন করিতেছে, কে তাহাকে শান্তিপ্রদান করিতে পারে?—একমাত্র সময়! অকপট-বান্ধবপ্রেম-বঞ্চিত জনকে কে ভুলাইতে পারে, যে এই সংসার নিতান্ত স্বার্থপর নহে? —সেই একমাত্র সময়! অতএব সময়, তুমিই ধন্য! যিনি পরলোকগত

পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, পতি, পত্নি বা বন্ধু বিয়োগ হেতু শোকাভিভূত হইয়া অনশনে জীবন-যাপন করিতে ছিলেন, যাঁহার হৃদয়ে সুখের লেশমাত্র আলোক উদ্ভাসিত হইতে পারিত না এবং যিনি সংসারকে জীর্ণারণ্য মরুভূমির ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন— সময়-প্রভাবে, পানাহার তাঁহারই তৃপ্তি সাধন করে, হৃদয় পুনরায় সুখ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে এবং সংসার নবরাগে রঞ্জিত হইয়া তাঁহারই মনপ্রাণ হরণ করে! সময়ে বিজয়কৃষ্ণের তাহাই ঘটিল—ধীরে ধীরে ধীরে চারি পাঁচ মাস গত হইল—বিজয় শোকাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন-সমাজে মুখ দেখাইলেন, কিন্তু সে মুখ পূর্ব্বের ন্যায় নহে—কিঞ্চিৎ গম্ভীর ও আনত। বিজয় বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন: বামাচরণের উইল বাহির হইল— জজ সাহেবের বিচারে সাব্যস্থ হইল, বিজয়কৃষ্ণ মৃত বামাচরণের সমগ্র বিষয়াধিকারী। সুখ বা দুঃখ কখনও একাকী আগমন করে না—বিজয়কৃষ্ণ স্বল্পকাল মধ্যে হরেন্দ্রনাথের পারিবারিক চিকিৎসক পদেও নিযুক্ত হইলেন। বিজয়কে প্রাপ্ত হইয়া পুরবাসীবর্গ বামাচরণের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল—কাল-প্র... জন-শ্রুতির শতজিহ্বা হত্যা-বিষয়ের আলোচনায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। মেদিনীপুরস্থ শান্তি-রক্ষকগণ নানাবিধ উপায়োদ্ভাবন করিয়াও এ পর্য্যন্ত হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতা হইতে একজন সুচতুর গোয়েন্দা আনয়ন পূর্ব্বক "আসামীর অন্বেষণে" নিয়োজিত করিলেন। সে নানাবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হত্যাকারীর সর্ব্বনাশের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——oo——

বিসের ভাবনা ?

কোন অসুখ হইয়াছে কি ?—হরেন্দ্র নাথের স্ত্রী সুরবালা উৎসুক-কণ্ঠে হরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরেন্দ্রনাথ শয়নকক্ষে একখানি সুরম্য পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া মহাকবি সেক্সপিয়র রচিত ম্যাকবেথ্ নামক দৃশ্যকাব্য শূন্য-মনে অস্ফুট স্বরে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার নয়নযুগল নিম্ন-লিখিত পংক্তিনিচয়োপরি সন্নিবিষ্ট—সজল ও অর্দ্ধনিমীলিত :—

"————That his virtues
Will plead like angels, trumpet-tongued, against
The deep damnation of his taking off :
And pity, like a naked newborn babe,
Striding the blast, or heaven's cherubin, horsed
Upon the sightless couriers of the air,
Shall blow the horrid deed in every eye,
That tears shall drown the wind."

হরেন্দ্রনাথের কর্ণকুহরে সুরবালার চির-পরিচিত, হৃদয়োল্লাসকারী, সুমিষ্ট স্বর প্রবেশ করিল না—তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শূন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন—উল্লিখিত প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

সুরবালা মনে করিলেন—হয়ত হরেন্দ্রনাথ তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই—একমনে পাঠকরিতেছেন : একমন দুই বিষয়ে কিরূপে সন্নিবেশিত হইতে পারে ? সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদুচ্চৈঃস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন অসুখ হইয়াছে কি ?

হরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় নিস্তব্ধ।

সহৃদয়া সুরবালা হরেন্দ্রনাথের হস্তস্থিত পুস্তকের পার্শ্বভাগ দিয়া তাঁহার তদবস্থা দর্শন পূর্ব্বক বিস্মিতা হইলেন, স্নেহ বশতঃ নানা প্রকার আশঙ্কা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে কোমল করপল্লব দ্বারা হরেন্দ্রনাথের পদযুগল ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—বল বল, আমার মাথা খাও, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?

হরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে বারি ধারা কর্ণমূল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল—তিনি সহসা মনোবেগ সম্বরণ করিয়া কহিয়া উঠিলেন—কাহার অসুখ?

সুরবালা বলিলেন—তোমার?

হরেন্দ্রনাথ পুনরপি অন্যমনে কেবল কহিলেন—হুঁ।

সুর। তবে বিজয় বাবুকে সমাচার পাঠান হয় নাই কেন?

হ। না।

সুরবালা বুঝিতে পারিলেন আবার হরেন্দ্রনাথের মন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। মনে মনে ভাবিলেন এই ছাই ভস্ম পুস্তক যতক্ষণ হরেন্দ্রনাথের হস্তে থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার মন পাওয়া যাইবে না। এই [illegible] বশতঃ তাঁহার হস্ত হইতে সেই অমূল্য রত্নাধার গ্রন্থখানি কাড়িয়া লইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

পুস্তক পতনের শব্দে হরেন্দ্রনাথের চমক হইল, তিনি "আহা বলিয়া সাগ্রহে গ্রন্থখানি তুলিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী টেবিলের উপর রাখিলেন ও সুরবালার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সুরবালার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য শোভা পাইতেছিল—সে হাস্য অন্ধকারাবৃত রজনীতে খদ্যোতিকার ক্ষীণালোকের ন্যায়—কৃষ্ণকায় জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন গগণে ক্ষণপ্রভার ক্ষণ-দীপ্তির ন্যায়—ক্ষণে উদ্ভাসিত, পরক্ষণে পরিব্যাপ্ত কালিমায় বিলীন। সুরবালা সেই হাসি হাসিয়া হরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন আমার কথা শুনিবে

কি? পুনরায় যদ্যপি আমার কথার ঠিক উত্তর না পাই তাহা হইলে ঐ পোড়া বইকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁশাই নদীর গলে মালা পরাইয়া দিব।

হ। কেন; আমি কি তোমার কথা শুনি নাই?

সু। যত শুনিয়াছ তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; এখন বল দেখি তোমার কি শারীরিক কোন অসুখ হইয়াছে?

হ। না—তুমি কি প্রকারে জানিলে?

সু। তোমার রকম দেখে—কয়েক দিন হইল তুমি ভাল করিয়া কথা কহ না, পানাহারে পূর্ব্বের ন্যায় রুচি নাই—সদাই যেন বিমর্ষ।

হ। তাহার কি অন্য কোন কারণ হইতে পারে না?

ক্রমশঃ

নির্ঝরিণী। *

—ঃ০ঃ—

গান করে মধুর স্বরে।

বয়ে যাও নির্ঝরিণী, কার রমণী, প্রভাতে এ প্রান্তরে।
ছিলে মগ্নমনে, গহন বনে, উদা[illegible]
তুমি বিমলবারি, সুধার ধারা, জন্ম কেন পাথরে?
দোলা হেলা, লীলা খেলা, চলেছ প্রমোদভরে;—
নিয়ে সোনার ভূষণ, রবির কিরণ, পরেছ থরে থরে।
ফলে ফুলে তরুদলে, দু'ধারে নয়ন ঝরে;—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি, ডেকে কারে অন্তরে?
দিয়ে আপন শরীর, অমৃত নীর, তোষ তৃষা-কাতরে;—
তুমি অপার সীমা, কার মহিমা, করুণা দেখাও নরে।

শ্রীগিঃ—

* বাউলের সুর।

বর্ণমালা।

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সময় আমরা প্রথমেই অ, আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ ও ক, খ প্রভৃতি হলবর্ণ পড়িয়াছি এবং ইংরাজী শিক্ষায় **A, B, C** প্রভৃতি বর্ণমালা (**Alphabet**) পড়িয়াছি। কিন্তু এই দুই প্রকার বর্ণমালার অক্ষর বিন্যাসের উপর আমরা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। বস্তুতঃ ইউরোপীয় ও আরবীয় বর্ণমালার অক্ষর বিন্যাসের প্রণালী নাই, যৌক্তিকতা নাই, বিন্যাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমাদের বর্ণমালার অক্ষর বিন্যাসে বিলক্ষণ বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা ও পারিপাট্য আছে। সংস্কৃত বর্ণমালা সৌখিন ও সুরুচিশীল ব্যক্তির উদ্যান স্বরূপ, ইউরোপীয় ও আরবীয় বর্ণমালা অরণ্যের আগাছার শ্রেণী স্বরূপ।

পরম্পরাগত উপন্যাস আছে যে ইউরোপীয় ও আরবীয় বর্ণমালা প্রথম ফিনিসিয়া দেশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল উদ্ভাবিত হয়; আমাদের বর্ণমালা কোন্ কালে হইয়াছে তাহার কোন নির্ণয় নাই, নির্ণয় করিবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এই মাত্র নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে আমাদের ক, খ, গ, ঘ—এল্‌ফা, বিটা প্রভৃতির অনেক পূর্ব্বে কল্পিত হইয়াছে। আর ইহাও নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে এল্‌ফা, বিটা অথবা আলেফ, বে প্রভৃতি বর্ণমালা চিন্তাশীল ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের কল্পিত নহে, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণের চিন্তাশীলতার ও সভ্যতার একটী আশ্চর্য্য ও অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিদ্যা ও বুদ্ধির গৌরব দেখাইবা স্পর্দ্ধা

করিয়া থাকি, কিন্তু আবার ইহাও বলি যে তাঁহারা বিজ্ঞান জাঁনি-তেন না। এই প্রস্তাবে দেখা যাউক বর্ণমালা বিন্যাসে তাঁহা-দের বিজ্ঞানচর্চ্চার ও চিন্তাশীলতার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U V. W. X. Y. Z.—ইহা ইংরাজী ও উচ্চসভ্য ইউরোপের বর্ণমালা। ইহাই গ্রিসের, পৃথিবীর অধীশ্বরী রোমের, " চিহ্নিত জাতি " ইহুদী দিগের এবং আরবদিগের বর্ণমালা ; তাহাদের পরস্পরে যে প্রভেদ আছে তাহা এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকারক নহে। ইহার মধ্যে প্রথম অক্ষর (**A**) স্বরবর্ণ, তিনটী ব্যঞ্জনের পর আর একটী (**E**) স্বর আছে, আবার তিনটীর পর আর একটী (**I**) স্বর আছে। তাহার পর পাঁচটী ব্যঞ্জন আবার একটী স্বর (**O**) ; আবার পাঁচটী ব্যঞ্জন তাহার পর একটী স্বর (**U**), অবশেষে তিনটী ব্যঞ্জন ও তাহাদের অন্তরে অন্তরে দুইটী মিশ্র স্বর (**W** ও **Y**) আছে। অর্থাৎ ছাব্বিশটী অক্ষরের মধ্যে পাঁচটী বিশুদ্ধ স্বর ও দুইটী মিশ্র স্বর, সাত জায়-গায় সাত অবস্থায় নিবেশিত আছে। এই সাতটী স্বর ও বাকি উনিশটী ব্যঞ্জন পৃথক পৃথক করিয়া একত্রে রাখাই কর্ত্তব্য ছিল। আমাদের বর্ণমালায় ইহাদিগকে পৃথক রাখা হইয়াছে, তাহা সক-লেই জানেন। কিন্তু কেবল ইহাই নহে—অ, আ প্রভৃতি অক্ষর গণের বিন্যাস সম্বন্ধেও বিলক্ষণ গুণপণা আছে। স্বরবর্ণের বিন্যাস দ্বারা ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা নাই, সুতরাং আড়ম্বরে ক্ষান্ত থাকিলাম ; পাঠকগণেরাও একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহার গুণপণা বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

B, C, D, এই তিনটী অক্ষরকে পরে পরে রাখা হইয়াছে কেন ? **B** (ব) ওষ্ঠ্যবর্ণ, **C** (স) দন্ত্যবর্ণ, এবং **D** (ড) মূর্দ্ধন্য-

বর্ণ ; ইহাদের উচ্চারণ স্থান পৃথক্, ইহারা পৃথক্ শ্রেণীর বর্ণ ও ইহাদের কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। **F. G. H. J. K.** এই পাঁচটী অক্ষরের পরস্পরের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহাদের মধ্যে **K** (ক) কণ্ঠ্যবর্ণ ও কোমল (**Soft**), ইহার দুইটীর পূর্ব্বে **G** (গ) কণ্ঠ্য-বর্ণ (**Hard**) নিবেশিত। **F** (ফ) ওষ্ঠ্যবর্ণ। আবার কয়েকটী অক্ষরের পর **P** (প) একটী ওষ্ঠ্যবর্ণ। এইরূপ ইউরোপীয় বর্ণ-মালার অক্ষর বিন্যাসের কোন প্রণালী নাই, কোন রীতি নাই, একটী অক্ষরের পর অপরটী কেন আসিল, অন্য একটী আসিলনা কেন তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, ইহার মাথামুণ্ড কিছুই নাই। কি আরবীয়, কি পারস্য, কি ইথিওপিক্, কি হিব্রু, কি গ্রীক্, সকল বর্ণমালার এই দুর্দ্দশা। সংস্কৃত বর্ণ-মালা, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচারের পূর্ব্বে যে ইউরোপে ভাষা-বিজ্ঞানের অঙ্কুর হয় নাই তাহা বিচিত্র নহে। আর ইউরোপীয়গণ যে ভাষা-বিজ্ঞানকে বিষম গুরুতর মনে করিবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান পাঁচ ;—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ। কণ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরিক যন্ত্র, ওষ্ঠ সকলের উপরে ; সুতরাং এই পাঁচটী পরে পরে নিবেশিত হইল। বর্ণমালার সকল অক্ষরই এই পাঁচটীর একটী নয় একটী স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমতঃ শব্দের উচ্চারণস্থান নির্দ্ধারিত করেন, তাহার পর তাঁহারা প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন। সভ্যতার প্রথমাবস্থায় ইহা অতি সামান্য কার্য্য নহে ; এমন কি ইহা কিরূপ গুরুতর তাহা পাঠকমাত্রেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাহা হউক সেই মহাত্মাগণের প্রণালীর উপর এরূপ লক্ষ্য ছিল যে বালকগণের শিক্ষার্থ বর্ণমালা লিখিবার পূর্ব্বে

তাঁহারা উচ্চারণস্থানানুসারে প্রথমতঃ স্বর ও ব্যঞ্জন পৃথক্ করিয়া লন। তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ গুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা—

১। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ কণ্ঠ্যবর্ণ।

২। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ তালব্যবর্ণ।

৩। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ মূর্দ্ধন্যবর্ণ।

৪। ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স দন্ত্যবর্ণ।

৫। প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্যবর্ণ।

ব অন্তঃস্থ দন্ত্যৌষ্ঠ্য।

হ কণ্ঠ্যবর্ণ বটে কিন্তু অন্যান্য কণ্ঠ্যবর্ণের সহিত ইহার উচ্চারণের প্রভেদ আছে, ইংরাজীতে ইহাকে **Aspirate** বলে। য ও অন্তঃস্থ ব এই দুই বর্ণকে স্বরও বলা যায় ব্যঞ্জনও বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে **Semi vowels** বলে। র ও লর প্রকৃতিও পৃথক, ইংরাজীতে ইহাদিগকে **Liquids** বলে। য, র, ল, ব কে অন্তঃস্থ বর্ণও বলা যায়; শ, ষ, সও তদ্রূপ পৃথক, ইহাদিগকে **Sibilants** উষ্মবর্ণ বলে। এতন্নিমিত্ত মহাত্মা আর্য্যগণ প্রথমতঃ ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণ উচ্চারণস্থানানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নিবেশিত করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহারা অন্তঃস্থবর্ণ য, র, ল, ব গুলিকে উচ্চারণ স্থানানুসারে বসাইয়াছেন, তৎপরে উচ্চারণ স্থানানুসারে উষ্মবর্ণ বসাইয়া অবশেষে হ দিয়াছেন। আমাদের বর্ণমালায় বর্ণ সমুদয়ের স্থান নিবেশ সম্বন্ধে কতদূর গুণপণা আছে, তাহা অপরাপর বর্ণমালার সহিত তুলনা করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিলেই পাঠকগণের সম্যক্ প্রতীতি হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক কি নিয়মে প্রত্যেক বর্গের পাঁচটী বর্ণ নিবেশিত হইয়াছে, ও তাহাদের নিবেশ সম্বন্ধে কোন প্রণালী আছে কি না? ইহাতেও দৃষ্ট হইবে যে বর্গের প্রথম বর্ণ ক, চ, ট, ত ও প,

এক জাতীয় ও তাহারা সকলেই কোমল (**Soft**), বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ খ, ছ, ঠ, থ ও ফও তদ্রূপ একজাতীয় এবং ইহারাও কোমল অথচ (**Aspirated soft**); বর্গের তৃতীয় বর্ণ, গ, জ, ড, দ ও ব কঠোর (**Hard**); চতুর্থ বর্ণ গুলি উক্ত রূপ ও তাহারা **Aspirated hard,** এবং পঞ্চম বর্ণগুলি কিঞ্চিৎ সানুনাসিক।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মাত্রেরই প্রারম্ভে বর্ণসংকলনের একটী সূত্র আছে, তাহাকে শিবসূত্র বলে এবং কথিত আছে যে মহাদেব স্বয়ং ঐ সূত্রের আবিষ্কার করেন। "এতানি সূত্রানি মহাদেবাদধিগতানি।" ইহাতে যে বর্ণ সংকলন আছে তাহা ব্যাকরণশিক্ষার উপযোগী এবং তাহাতেই দেখা যাইবে সংস্কৃত বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক নিয়মে বিরচিত। অনেকেই এই সূত্র না জানিতে পারেন, তজ্জন্য তাহার ব্যঞ্জনবর্ণাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। হ, য, ব, র, ল। ঞ, ণ, ন, ঙ, ম। ঝ, ঢ, ধ, ঘ, ভ। জ, ড, দ, গ, ব। ছ, ঠ, থ খ, ফ। চ, ট, ত, ক, প। শ, স, ষ।" এই সূত্রের বর্ণনিবেশের সহিত বর্ণমালার বর্ণনিবেশের তারতম্য দেখিলেই উভয়েরই প্রণালী বুঝা যাইবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বর্ণমালার প্রণালীর সম্বন্ধে যৌক্তিক প্রশংসা করিয়াছি এবং আমাদের বর্ণমালা যে পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত জাতির বর্ণমালা হইতে উৎকৃষ্ট তাহার একাংশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখান আমাদের আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে এই বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির বর্ণমালা অপর সমস্ত জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। সিন্ধুনদীর অপর পার্শ্বস্থ সকল জাতিরই এক প্রকারের দোষপূর্ণ বর্ণমালা। তথায় সভ্যতার অভাব ছিল না ও নাই, তথায় প্রাচীন কালেও বিজ্ঞানালোচনার

ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে; তত্তদ্দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরও অভাব ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আসিরিয়া, পারস্য, গ্রিশ, রোম, আরব্য, ও বর্ত্তমান ইউরোপ কোন দেশেই কেহ আদিম ফিনিশিয়ান্ বর্ণমালার প্রণালীগত দোষ সমুদয় সংশোধনার্থ যত্নবান্ হন নাই।

ক্রমশঃ

জীবন-বিজ্ঞান।

প্রথম প্রস্তাব।

জীবোৎপত্তি।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডল অসংখ্য প্রাণিগণের আবাসস্থান। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার, শরীর-গঠন এবং জীবনোপায় প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একবিন্দু জলকণাতে সহস্র সহস্র কীটাণু বিচরণ করিতেছে। অতল জলধিগর্ভে শতাধিকহস্ত তিমি মৎস্য অবস্থিতি করিতেছে। কোন জীবের শরীর-নির্ম্মাণ এমত সরল যে, একমাত্র যন্ত্র দ্বারায় তাহাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। অপর পক্ষে কোন কোন জীবের শরীর এরূপ জটিল ও বহুল-যন্ত্র-নির্ম্মিত যে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যন্ত্র সমূহের যথার্থ কার্য্য অদ্যাবধি নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। কোন জীব আজন্মকাল আকাশ-মার্গে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কেহ বা তিমিরময়

ভূগর্ভে নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় পতিত রহিয়াছে! কোন জীব সমীরণ সদৃশ দ্রুতগামী, কোন জীব এরূপ জড় যে স্বেচ্ছায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেও অক্ষম। কোন জীবের স্পর্শমাত্রে প্রাণ বিয়োগ হয়, কাহাকেও বা শত খণ্ডে কর্ত্তন করিলেও একটী একটী খণ্ড পুনরায় ভিন্ন জীবরূপে পরিণত হয়। ফলতঃ জীব-সৃষ্টি বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর অপার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন: অতএব জীবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুশীলন অত্যন্ত কৌতুকাবহ ও জ্ঞান প্রদায়ক।

এই প্রস্তাবের প্রথম অঙ্কে জীবোৎপত্তি আলোচিত হইবে। জীবোৎপত্তি সম্বন্ধীয় অনুশীলন প্রধানতঃ শাখাদ্বয়ে বিভক্ত। প্রথমতঃ সকল প্রকার বা কয়েক প্রকার জীব আদিতে সমুৎপন্ন হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বর সকল প্রকার জীব স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন কিম্বা কয়েক অথবা এক প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়া জল বায়ু প্রভৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন অন্যান্য প্রকারে পরিণত হইয়াছে।

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে গলিত মৃতদেহ হইতে বিবিধ কীট উদ্ভাবিত হয়। তদ্দর্শনে সহসা প্রতীতি জন্মিতে পারে যে জীবের স্বয়মুৎপত্তি অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস যে ভ্রমমূলক তাহা প্রতীচীন বিজ্ঞানবিৎগণের গবেষণার দ্বারায় বিংশতি বৎসর হইল সিদ্ধান্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইটালি নিবাসী প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর প্রসিদ্ধ রিডাই এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রতীচীন বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মাত্রেরই জীবের স্বয়মুৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল। রিডাই মহোদয় এক খণ্ড মাংস অতি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দেখিলেন যে মাংসখণ্ড গলিত হইয়া

সপ্তাহ অতীত হইলেও তাহাতে কোন জীবের চিহ্ন মাত্র পাওয়া গেল না ; অপরন্তু আর একখণ্ড মাংস বিনা আচ্ছাদনে রাখিয়া দিলে কতক দিনের মধ্যেই মাংসখণ্ড কীটাকীর্ণ দৃষ্ট হইল। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমিত হইল যে বাস্তবিক মাংস গলিত হইলে কীট উৎপত্তি হয় না। আচ্ছাদনহীন মাংস পড়িয়া থাকিলে বিবিধ কীট আহার অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের ডিম্ব ঐ মাংসে সংলগ্ন হইলে সূর্য্যোত্তাপে ফুটিয়া কীট হয়। ইচ্ছা করিলে সকলেই উক্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একখণ্ড মৎস্য অথবা ছাগমাংস কোন স্থানে রাখিয়া দিলে, অতি শীঘ্রই অসংখ্য মক্ষিকা আসিয়া উপস্থিত হয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ মাংসখণ্ড শুভ্রবর্নবিন্দ্বাচ্ছাদিত দৃষ্ট হইবে। ঐ বিন্দু সমূহ মক্ষিকার ডিম্ব মাত্র। সূর্য্যোত্তাপে অনতিবিলম্বে ঐ ডিম্ব সকল ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকা উৎপন্ন হয়।

উক্ত সময় হইতে কয়েক বৎসর পণ্ডিতবর রিডাইয়ের মত অনুমোদিত হইতে লাগিল। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হইলে উক্ত মতের যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। জলপূর্ণ পাত্রে তৃণ লতাদি ফেলিয়া রাখিলে, এবং কতিপয় দিবস পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে ঐ জল পরীক্ষা করিলে উহাতে শত শত কীটাণু দৃষ্ট হয়।

ইহাতে প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিৎগণের এইরূপ ধারণা হইতে লাগিল যে জীবের স্বয়মুৎপত্তি অসম্ভব নহে। পণ্ডিতবর নিডহাম, (**Needham**) ও সুবিখ্যাত বুফ্‌ফং (**Buffon**) এই মতের প্রধান অনুমোদক ছিলেন এবং তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে প্রাণিদেহ অথবা উদ্ভিদ, জলে সিক্ত করিয়া আচ্ছাদন-বিহীন রাখিলে, বায়ু-সংযোগে অসংখ্য কীটাণু উৎপন্ন হয়।

তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত নিম্ন লিখিত কল্পনামূলক। তাঁহারা বলেন যে উদ্ভিদ অথবা জীবের মৃত্যু হইলে, উক্ত মৃত উদ্ভিদের অথবা জীবের জীবনী-শক্তির হ্রাস না হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহাতে অবস্থান করে। জল ও বায়ু উক্ত সুষুপ্ত জীবনী শক্তির উদ্দীপক; তন্নিবন্ধন জল ও বায়ু সংযোগে তাহা হইতে বিবিধ কীটাণু উৎপন্ন হয়। কল্পনাটী মনোগ্রাহী বটে কিন্তু ইহাতে যেসকল গুণ থাকিলে কল্পনার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় তাহার অভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যেহেতুক পণ্ডিতদ্বয় পরীক্ষা দ্বারায় প্রতীত করিতে পারেন নাই, যে উক্ত কল্পিত কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত উদ্ভিদ অথবা জীব-দেহ হইতে, জল বায়ু সংযোগে কীটাণু উৎপন্ন হইতে পারে না; এবং অন্য কোন দৃষ্টান্ত দ্বারায়ও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই যে উক্ত কল্পিত কারণ বাস্তবিক প্রকৃত কারণ (Vera causæ)। বুফ্ফণের সমকালিক প্রাকৃতিকবিদ্যাবিশারদ ইস্পলাঞ্জিনী (Spallanzini) ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন এবং বুফ্ফণের মতোচ্ছেদ ও নিজ মত-স্থাপন বিষয়ে যত্ন সহকারে বিবিধ পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অগ্নি দ্বারায় উত্তপ্ত জল কোন পাত্র-মধ্যে রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিলে সেই জলে কীটাণু উৎপন্ন হয় না। সহজেই উপলব্ধি হইবে যে উক্ত পরীক্ষা দ্বারায় বুফ্ফণের মত অপ্রমেয় হইতে পারে না; কারণ জল ও বায়ু উত্তপ্ত হইলে, তাহাদের গুণের অন্যথা হইয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও বায়ুর যে গুণ থাকাতে কীটাণুর উৎপত্তি হয়, উত্তপ্ত হইলে তাহার হ্রাস অথবা ধ্বংশ হইয়া যাইতে পারে। তথাচ বুফ্ফণের মত পণ্ডিতসমাজে ক্রমে ক্রমে হতাদর হইতে লাগিল; কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের কোন প্রকার নিশ্চয়সিদ্ধান্ত না হওয়ায়

তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত ফল প্রদর্শিত হইল।

যে যে ফাণ্টে (Infusion) বহির্বায়ুসংযোগে কীটাণু উৎপন্ন করে তাহা ফারণহিটের ২১২° পরিমাণে উত্তপ্ত করিলে জীবোৎপাদনশক্তি-বিহীন হইয়া যায়। ঐ ফাণ্ট উত্তপ্ত না করিলেও পাত্রের মুখের সহিত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত নল যদি এরূপ প্রকারে সংলগ্ন করা যায় যে বহির্বায়ু কেবল মাত্র ঐ নল দিয়া ঐ পাত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই পাত্রস্থ উদ্ভিদাদির ফাণ্টে কীটাণু উৎপন্ন হয় না। এতদ্ভিন্ন এক জাতির ফাণ্ট দুইটী পাত্রে রাখিয়া একটী পাত্রের মুখ তুলা অথবা পশম দ্বারায় এরূপ আবৃত করা যায় যে বহির্বায়ু কেবলমাত্র ঐ তুলা অথবা পশম ভেদ করিয়া ফাণ্টের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এবং অন্য পাত্রের মুখ অনাবৃত রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত পাত্রস্থ ফাণ্টে একটী মাত্রও কীটাণু উৎপন্ন হয় না, অথচ শেষোক্ত পাত্রস্থ ফাণ্টে অসংখ্য কীট দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রকার পরীক্ষাদি হইতে অবশ্যই প্রতিপন্ন হয় যে বুফফণের মত ভ্রান্তিসঙ্কুল। অনুবীক্ষণ দ্বারায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে অন্তরীক্ষে অসংখ্য ডিম্বাণু ভাসমান আছে। বহির্বায়ুর সহিত ঐ ডিম্বাণু ফাণ্টে পতিত হইয়া কীটাণু উৎপাদন করে। কিন্তু উত্তাপসংযোগে ডিম্বাণু সমুহের জীবাঙ্কুরশক্তির ধ্বংশ হয়।

অপর একটী পরীক্ষা দ্বারায় ঈদৃশ কল্পনা আপাততঃ অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। যদি একটী পাত্রে উপরোক্ত ফাণ্ট রাখিয়া পারদাগারে (Mercurial bath) এরূপ কৌশলে বিপর্য্যস্তভাবে সংস্থাপিত করা যায় যে পারদ কিঞ্চিদূর ঐ পাত্রে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে বহির্বায়ু আর কোন ক্রমে ঐ

ফাণ্টের সহিত মিলিত হইতে পারে না। অতঃপর অম্লজান ও যবক্ষারজান বাষ্প যে পরিমাণে মিশ্রিত করিলে বিশুদ্ধ বায়ু উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রন (অর্থাৎ বিশুদ্ধবায়ু) নল দ্বারায় ঐ ফাণ্টে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে উক্ত কল্পনানুসারে ঐ ফাণ্টে ডিম্বাণু উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ পরিস্কৃত বায়ুতে উল্লিখিত ডিম্বাণু থাকে না; কিন্তু অশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত অবস্থায়ও ফাণ্টে কীটাণু দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ তুলা অথবা পশম দ্বারায় বদ্ধ করিলেও ঐ দুগ্ধে কীটাণু জন্মায়। ইহাতে পাঠকবর্গের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে উপরিউক্ত পাঁচটী পরীক্ষার মধ্যে তিনটী পরীক্ষা দ্বারায় ইস্পলাঞ্জিনীর মত ও দুইটী দ্বারায় বুফ্‌ফণ্ডের মত অভিবাদিত হইতেছে।

অতঃপর ফ্রান্সদেশে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধান হইতে লাগিল, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর পেষ্টুর (Pesteur) বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইস্পলাঞ্জিনীর মত এরূপ সম্যক প্রকারে প্রমিত করিয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। প্রথমতঃ পেষ্টুর উত্তপ্ত দুগ্ধ বিষয়ে এই নির্দ্ধারিত করেন যে দুগ্ধে কিঞ্চিৎক্ষার গুণ আছে। ঐ গুণ হেতু ফারণহিটের ২১২° পরিমাণ অবধি উত্তপ্ত দুগ্ধে ডিম্বাণুর জীবাঙ্কুর শক্তি রক্ষিত হয় কিন্তু অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত করিলে সেই গুণ এককালে বিনষ্ট হয়, সুতরাং সেরূপ দুগ্ধে কীটাণু উৎপন্ন হয় না। পারদ সম্পর্কীয় পরীক্ষার বিষয় এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে পারদের উপর বায়ুস্থিত ডিম্বাণু সংলগ্ন থাকে। সেই পারদ পাত্রস্থ ফাণ্টের সহিত মিলিত হয়, সুতরাং বায়ুস্থিত ডিম্বাণুও ঐ সুযোগে ফাণ্টের সহিত মিলিত হয় এবং কালক্রমে কীটাণুরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে উক্ত

পণ্ডিত মহোদয় বায়ুস্থিত ডিম্বাণু সংগ্রহ করিবার একটী যন্ত্রও নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার শয়নাগারের অর্গলে একটী কাচের নল সংযুক্ত করিয়া সেই নলের ভিতর তুলা ও পশম মিশ্রিত গোলক রাখিয়াদিলেন। নলের একদিক দিয়া বহির্ব্বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত ও অন্যদিকে বায়ু-পরিচালক-যন্ত্র (**Aspirator**) এরূপ কৌশলে সংস্থাপিত হইল যে বহির্ব্বায়ু-প্রবাহ ঐ নলের ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

চতুর্ব্বিংশ ঘটিকা অতিবাহিত হইলে উক্ত গোলক এরূপ যত্ন সহকারে বাহির করিয়া লইলেন যে পুনরায় বহির্ব্বায়ু তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না। উক্ত কার্য্যের অষ্টাদশ মাস পূর্ব্বে একটী পাত্র ফাণ্ট-পূর্ণ করিয়া তাহার মুখাবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এতদ্ সময়েও ঐ ফাণ্টে কীটাণু উৎপন্ন হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাত্রের আবরণ এমত কৌশলে মোচন করিয়া উক্ত গোলক পাত্রস্থ করিলেন যে বহির্ব্বায়ু কিঞ্চিৎমাত্র পাত্রে প্রবেশ করিতে পারিল না। এরূপ অবস্থায় একদিনের মধ্যেই ঐ ফাণ্টে কীটাণু উদ্ভূত হইয়াছিল। অতঃপর পণ্ডিতবর একটী দীর্ঘ নলাকারমুখবিশিষ্ট পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ইক্ষুরসের ফেনা রাখিয়া ঐ নলটী ইংরাজী **S** অক্ষরের ন্যায় বক্রাকার করিয়া দিলেন। এমত অবস্থায় উক্ত বস্তুতে কোন কীটাণু দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু ঐ নলটী ভাঙ্গিয়া দিলে দুই দিবসের মধ্যেই কীটাণু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তিনি এই প্রকার পরীক্ষা মূত্রাদি সঙ্কর বস্তু দ্বারাও করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলও পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জীবের স্বয়মুৎপত্তি অসম্ভব।

ক্রমশঃ

নদী-তীরে।

১

রজত কিরণ মাখি এ বিজন স্থানে,
কার শোকে কাঁদ নদি! উদাসীন প্রাণে?
কিরণে রঞ্জিত কায়, বিভূতি-ভূষিত প্রায়,
সুখসাধ অবসাদ কেন গো যৌবনে?
কার প্রেমে পাগলিনী হয়েছ ললনে?

২

ম্লানমুখী, তারাহারা, ত্রিযামাযামিনী,
স্তম্ভিত পবনগতি নীরব অবনী।
মলিন আকাশে শশী, মুখেতে মলিন হাসি,
ললিত লহরী কহে হৃদয়-বেদন,
নীরব স্বভাব, ঝুরে তরুর নয়ন।

৩

ত্যজিয়ে জনমভূমি যোগিনীর বেশে,
ছুটিতেছ নিরন্তর কাহার উদ্দেশে?
বিমল কোমল কায়, পাষাণ ভেদিয়া ধায়,
কার তরে বিষাদিনী ত্যজেছ ভবন?
কোথায় জনম তব, কোথায় গমন?

৪

সচঞ্চল ঊর্ম্মিমালা হৃদয়ে তোমার,
দারুণ চিত্তের বেগে উঠে অনিবার।

উন্মত্ত তরঙ্গচয়, বিষাদে বিলীন হয়,
করুণ-সঙ্গীত-স্রোত—হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
ম্লানকান্তি—বিষাদের প্রতিমা প্রকাশ।

৫

ভাবিতাম আমি শুধু ব্যথিত অন্তরে,
বিচরি এ মরুময় সংসার ভিতরে।
অনন্ত নির্ঝর আঁখি, নীরবে লুকায়ে রাখি,
নিরাশায় ব'য়ে যায় জীবন-বাহিনী,
এস এস তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী।

৬

আসিয়ে তোমার তীরে বিরলে বসিয়ে,
কাঁদিব দুজনে মিলি হৃদয় খুলিয়ে।
নীরেতে নয়নজল, মিশাইব অবিরল,
আঁখি-নীরে উচ্ছ্বসিত হবে তব কায়,
প্রবল তরঙ্গ ঘোর উঠিবে তাহায়।

শ্রীঃ—

উন্মত্ত যুবক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

"ঋতে রবেঃ ক্ষালয়িতুং ক্ষমেত কঃ
ক্ষপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ।"

রজনী অবসান প্রায়, উষা সুন্দরী আস্তে আস্তে শয়ন গৃহের

দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। রূপের ছটায় পূর্ব্বদিক্ আলোকিত হইল। স্ত্রীলোক মাত্রই অসূয়াপরবশ, স্বজাতির সৌন্দর্য্য বা গুণের গরিমা কখনই সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং চন্দ্রপ্রিয়া তারাগণ দুঃখে মলিন হইয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। কেবল ক্ষীণ-তেজা নিশাপতি সূর্য্যদেবের দর্শন-প্রতীক্ষায় রহিলেন। বিহগ-কুল তার-স্বরে দিবাপতির স্তুতিগান করিতে লাগিল। শিখাধারী মাতুল বক সময় বুঝিয়া জলাশয়ের তীরে উপবেশন পূর্ব্বক সাম-বেদী ব্রাহ্মণের ন্যায় ভক্তিভাবে প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিলেন। তপ্তকাঞ্চনসমপ্রভ জগতীনাথ লোহিতাভ নীরদাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্বাকাশে ভাসিতে লাগিলেন। অমাত্য চন্দ্রমা গ্রহরাজ দিনমণিকে উদিত দেখিয়া প্রতীচ্য সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে জগদাধিপতি গ্রহরাজের অভাবে জগতের কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিযাছিল!! নক্ষত্রদীপাদির কথা দূরে থাক্, অতি ক্ষুদ্র জ্যোতি-রিঙ্গণ সকলও স্ব স্ব তেজঃ প্রকাশে ত্রুটি স্বীকার করে নাই। এক্ষণে নলিনীনায়কের প্রভাবে সেই সকল ক্ষুদ্রাশয় আপনা হই-তেই দূরীভূত হইল। নলিনীর সহ সমস্ত জগৎ আহ্লাদে হাসিতে লাগিল। না না! সমস্ত জগৎ হাসে নাই। ঐ যে নিবিড় দুর্গম অরণ্য মধ্যে ভগ্ন-প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দুইটী মনুষ্য উপবিষ্ট রহিয়াছে, কৈ ইহারা ত হাসে নাই? তবে সমস্ত জগৎ হাসিল কেমন করিয়া? ইহারাও ত জগৎ ছাড়া নহে। ধনী বা দরিদ্র হউক, গৃহী বা সন্ন্যাসী হউক, ইহারাও এই জীব-জগতের অন্তর্গত। যিনি ঐ অনন্ত আকাশভেদী বিবিধ পাদপ-গুল্মাদি-শোভিত পর্ব্বত-শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আবার অতি ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর কীটাণুর স্রষ্টা। যে বিশ্বস্রষ্টা মণিমুক্তাদি-শোভিত হৈম-মুকুট-ধারী কৌষেয়-বাসা নরপতিগণকে অসীম রাজ্যেশ্বর করিয়া

রাজাসনে আসীন করাইয়াছেন, তিনিই এই মনুষ্যযুগলকে বিবিধ ভোগ্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলকেই এক পৃথিবীতে স্থান দিয়াছেন। এক রত্নাকরগর্ভেই কি রত্ন কি শম্বুক উভয়েরই বাস। তবে সমস্ত জগৎ হাসিল কেমন করিয়া? কুমুদিনী ম্লান-মুখী; সমস্ত জগৎ হাসে নাই! যে জীর্ণ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ইহারা উপবিষ্ট, এটী সামান্য অট্টালিকা নহে। ইহা দৈর্ঘে ও প্রস্থে এত বিস্তৃত যে রাজা অথবা রাজার সদৃশ ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যতীত এরূপ প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণের ব্যয়ানুকুল্য করিতে সামান্য ধনীতে সমর্থ হয় না। ইহা চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথম প্রকোষ্ঠ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহা রাজার সভা-গৃহ। প্রকোষ্ঠটী অন্যূন দেড়শত হস্ত দীর্ঘ এবং একশত হস্ত বিস্তৃত। প্রাঙ্গণভাগ মার্ব্বল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। সমস্ত অঙ্গণটী ছাদে আচ্ছাদিত নহে, কেবল উত্তরার্দ্ধ আকাশরোধী শুভ্র মেঘ খণ্ডের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ছাদে পরিশোভিত। দ্বিরদ-রদ-সমপ্রভ কতকগুলি সুদীর্ঘ স্তম্ভ সেই ছাদকে মস্তকে ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণদিকে বাটী প্রবেশের দ্বার। দ্বারটী বাটীর উপযুক্ত নহে, কিছু ক্ষুদ্র; ইহার কবাট প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমস্তই ধাতু-নির্ম্মিত। এই প্রকোষ্ঠটী এপ্রকার সুদৃঢ় নির্ম্মিত যে অসীম কালের ভীষণ তরঙ্গাঘাতেও ইহার কোন স্থান ভগ্ন বা বিদীর্ণ হয় নাই। কেবল স্থানে স্থানে চূর্ণ খসিয়া পড়িয়াছে এবং বহুকাল জীর্ণ সংস্কারের অভাবে অপেক্ষাকৃত মলিন হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের উত্তরাংশে একটী মাত্র দ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। এইটী প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। ইহাতে একটী মনোরম পুষ্করিণী আছে। ইহার চারিধারে চারিটী ঘাট এবং প্রত্যেক ঘাটেই

এক একটী মন্দীর। মন্দীরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তর কল্পিত শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কি সোপানাবলী কি মন্দীর সমস্তই প্রস্তর-নির্ম্মিত। বোধহয় পুষ্করণীর চারি ধারে পুষ্পোদ্যান ছিল। কিন্তু এখন সেই সকল স্থানে এমন জঙ্গল হইয়াছে যে ইহার এক দিক হইতে অন্য দিকে যাওয়া যায় না। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব প্রান্ত যে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল তাহা কালের দুর্দম্য শাসনে ছিন্ন ভিন্ন ও ধরাশায়ী হইয়াছে। ভগ্ন পথে নানা প্রকার মারাত্মক আরণ্য জন্তু আসিয়া এতাদৃশ রমণীয় স্থানকে মনুষ্য-গমনাগমনের একান্ত অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। অপর দুই প্রকোষ্ঠ, বর্ণিত প্রকোষ্ঠ দ্বয়ের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে অন্যতর প্রকোষ্ঠের কিয়দংশ, যেন গৃহস্বামীর শোকে মলিন, জীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে। বট অশ্বত্থ প্রভৃতি পাদপরাজি, বল্লী-বিতান-বেষ্টিত হইয়া সেই ভগ্ন স্থানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অবশিষ্ট অক্ষত প্রকোষ্ঠটীর দ্বার নিরূপিত হয় নাই, কাজেই তাহার বিষয় কিছু বলিতে পারিলাম না। প্রস্তাবিত অট্টালিকার বহির্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত কতকগুলি সামান্য গৃহ ছিল ; এক্ষণে সেগুলি কেবল স্তুপাকার ইষ্টকরাশি ও ইষ্টকচূর্ণ রূপে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার উপরে আরণ্য বৃক্ষাদির এত বাহুল্য হইয়াছে যে তন্মধ্যদিয়া গমনাগমন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাবলি এত উন্নত ও এমন নিবিড় এবং আশ্রিত লতাবল্লী তাহাদিগকে এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া দেখিলেও ইহার মধ্যে যে এমন একটী বৃহৎ রাজ-প্রাসাদ আছে তাহা কিছু মাত্র জানিতে পারে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ন্যাসীদ্বয় যে স্থলে উপবিষ্ট ছিলেন এটী সেই রাজসভার অনাবৃত প্রাঙ্গণ। উভয়েই সুন্দরদৃশ্য, উভয়েরই

বেশ এক প্রকার—তবে প্রথম ব্যক্তি বৃদ্ধ, দ্বিতীয় তরুণ যুবক। বৃদ্ধের এখনও শরীর সবল, ইন্দ্রিয় সকল বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম, কেবল বার্দ্ধক্যসুলভ জরার কঠোর শাসনে কেশ ও শ্মশ্রুরাজি শুভ্রবর্ণ এবং অঙ্গের চর্ম্ম অল্প অল্প শিথিল হইয়াছে। ইঁহার প্রশস্ত ললাটে, আয়ত নেত্রে, সুদীর্ঘ ভ্রূযুগলে এবং বিস্তৃত বক্ষদেশে যৌবনের সৌন্দর্য্য-চিহ্ন অল্প অল্প লাগিয়া রহিয়াছে। ইঁহাকে দেখিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সঞ্চার হয়। ইনি যে কখন কায়িক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করেন নাই এবং ইঁহার পদযুগলও যে কখন কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, তাহা হস্ত পদের কোমলতা স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে। বৃদ্ধ এবং যুবা উভয়েই এক একখানি পৃথক কুশাসনে উপবিষ্ট। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সোৎসুক মনে যুবার মুখমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার গভীর হৃদয়াবেগাভিব্যঞ্জক নয়নযুগল ধরণী-পৃষ্ঠ ভিন্ন অন্যদিকে পরিচালিত হইল না, যুবা কোন উত্তর করিলেন না। বৃদ্ধের মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যুবার মুখ-মণ্ডল হইতে সোৎসুক নয়নদ্বয়কে আকর্ষণ করিলেন ও কিছুক্ষণ ধ্যানস্তিমিত নয়নে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন :—

যে অসাধ্য বিষয়ের তত্ত্বাবধারণে দর্শন সমূহের দর্শনও প্রতিহত হইয়াছে, অতি পুরাতন বেদ হইতে অদ্যতন তন্ত্র শাস্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় শাস্ত্র যাহার রহস্যোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া উন্মত্ত বাক্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, শত শত কুশাগ্র-ধী ঋষিগণ লোকালয় পরিত্যাগ ও নির্জ্জন অরণ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক রাত্রিন্দিব কঠোর পরিশ্রম করিয়াও যাহার সত্যাবধারণে বিতথপ্রযত্ন হইয়াছেন, আমাদের মত জড় বুদ্ধি চঞ্চল প্রকৃতি মানবগণের সেই ঋষিজনাসাধ্য দুরূহ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল নিজের অজ্ঞতা

প্রকাশ মাত্র। আপনি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইতে অপসৃত হউন। আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক জগতের আশ্রয় গ্রহণ করুন। এতদুভয়ে ঔদাসিন্য জন্মিলে মনুষ্য কোন কালেই সুখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। আমি আপনার হৃদয়াবেগের কারণ সম্পূর্ণ অবগত আছি। আপনি কি জন্য অতুল বিভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে উন্মত্ত বলিয়া সমাজে প্রচার করিতেছেন, কেনই বা রাজা চন্দ্রশেখর দার্শনিক ব্রাহ্মণগণের উপদেশে আপনার প্রাণদণ্ডের অনুমতি করেন এবং কি প্রকারে সেই করাল কাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করেন, কি জন্যই বা নদীতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন ও অবশেষে কি প্রকারে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন—এই সমস্ত রহস্য কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই। আপনাকে উন্মত্তবৎ দেখাইয়া আমায় প্রতারণা করিতে পারিবেন না। পৃথিবীতে মনুষ্যের যাহা কিছু প্রার্থনীয় তাহা একাধারে কেবল অপনাতেই আছে। যে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আপনার এতাদৃশ ঔদাসিন্য জন্মিয়াছে, যে রোগের প্রভাবে অমৃতময় পৃথিবীকে বিষবৎ বলিয়া বোধ হইতেছে, বোধ হয় আমিই তাহার বৈদ্য। আমার অসাধ্য হইলে অন্যে যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে এমন বোধ হয় না। অতএব আপনি কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার আশ্রমে অবস্থিতি করুন। যুবা বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণে সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন : যে হেতু ইতঃপূর্ব্বে এই অপরিচিত পুরুষকে কুত্রাপি দর্শন করিয়াছেন বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু ইনি অরণ্য নিবাসী, জানপদ হইলেও কথঞ্চিৎ সম্ভব হইত। যুবা কোন আপত্তি না করিয়া বৃদ্ধের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

এমন সময়ে একজন সামান্য সৈনিক পুরুষ আসিয়া “মহারাজের

জয় হউক ” বলিয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। আগন্তুক বৃদ্ধ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিল, কয়েকজন দার্শনিক পণ্ডিত অপরাহ্নে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনায় আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ সম্মতি প্রদান করিলেন। সৈনিক পুনর্ব্বার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। এই সময়ে বৃদ্ধ যুবার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল হইয়াছে এবং তিনি বৃদ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন। বৃদ্ধ স্মিতমুখে বলিলেন, “ যুবরাজ ! আমায় পরিচিত বলিয়া বোধ হয় ? যুবা কিছু অপ্রতিভ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। অনন্তর যুবা বৃদ্ধের আদেশানুসারে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তৎপশ্চাদ্গামী হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ পূর্ব্ববর্ণিত সরোবরের তীরস্থিত দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; অগত্যা যুবাও তন্মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া পথ-প্রদর্শক লতা-জাল-সমাচ্ছাদিত এক ক্ষুদ্র লৌহময় দ্বারে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবাও অনুগামী হইয়া দেখিলেন যে ভূগর্ব্ভে অবরোহণার্থ সোপানাবলী ; ছয় সাতটী সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান শ্রেণী তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। ক্রমশঃ সূর্য্যরশ্মির অভাব হইতে লাগিল। আর চারি পাঁচটী সোপান অতিক্রম করিতে না করিতেই অন্ধকার এত গাঢ়তর হইল যে তিনি অগ্রগামী পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধের দর্শনেও অসমর্থ হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার কি সূর্য্যদেবের ভয়ে এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ? বৃদ্ধ কহিলেন, যুবরাজ ! এস্থান কি তোমার হৃদয় হইতেও অধিক

অন্ধকার? যুবা লজ্জিত হইলেন। অন্ধকার সকল তাঁহাদের সেই উক্তি প্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনিচ্ছলে মহা গোলযোগ বাধাইয়া তুলিল। যুবা অতিকষ্টে সাবধান পূর্ব্বক আরও কয়েকটী সোপান অবতরণ করিলেন এবং পথ-প্রদর্শককে বলিলেন, "মহাশয়! গন্তব্য স্থান আর কত দূরে?" কিন্তু উত্তর পাইলেন না। পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারেও উত্তর পাইলেন না: সুতরাং নিশ্চয় জানিলেন যে বৃদ্ধ প্রতারণা করিল। তথাপি আর একবার বৃদ্ধের উত্তর প্রাপ্তি বাসনায় বিফল চেষ্টা পাইলেন। অনন্তর আরও কিছুদূর অবতরণ করিয়া জানিলেন, গমনের মার্গ সসীম হইয়াছে; কাজেই পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সে আশাও বিফল হইল, কারণ চারি পাঁচটী সোপান অতিক্রমের পরেই দেখিলেন যে তাঁহার নির্গমনের দ্বারও রুদ্ধ হইয়াছে। যুবার হৃদয় কম্পিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, নাসিকা নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহে অসমর্থ, পদ যুগল ক্রমশঃ অসাড় হইল, তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ

শৈশব বান্ধব।

——oo——

১

থাক রে অন্তরে তুমি চিরদিন তরে,
　　শৈশব বান্ধব!
ভালবাস এস এস শূন্যময় ঘরে,
　　শব সম সকলি নীরব।
আনন্দের উপহাস,　　আশার চঞ্চল ভাষ,
　অভিলাষ, প্রেমোচ্ছ্বাস, কিছু নাই আর;

হয়েছে হয়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে ঘোর,
গিয়েছে গিয়েছে চলে স্বপন সোণার।

২

তুমি আমি দুইজনে বসিয়ে বিরলে
তটিনীর তীরে,
কেদে কেদে ধারাগুলি যাবে ধীরে চলে
ঢেলে দিতে আপন শরীরে;
বসে র'ব মগ্ন মনে, কাঁদিবনা কা'র সনে,
অনেক কেদেছি আমি কাঁদিবনা আর,
সেই দিন হ'তে কত, কাঁদিয়াছি ক্রমাগত,
দেখিলাম যেই দিন প্রথম সংসার।

৩

তুমি আমি দুই জনে পর্ব্বত-শিখরে,
বিজন প্রদেশ,
নাহি পাখী, নাহি শাখী, অলি না বিহরে,
কেবল তুষার শুভ্র বেশ;
বিচিত্র বরণ ঘটা, ইন্দ্রধনু সম ছটা,
অকস্মাৎ খসে পড়ে, কোথা চলে যায়,
খসিবে ভৈরব রবে, সলিল সলিল হবে,
নীরবে হেরিব বসি' তোমায় আমায়।

৪

বালির উপরে বসি' হেরিব সাগর,
নীলিমা বিশাল,
উঠিবে, ডুবিবে, দুলে চলিবে লহর,
জটা ঘটা হেরিব করাল;

গৌরবের সমাধান, পরমায়ু অবসান,
জলে ঝাঁপ দিতে হেথা আসিবে মিহির,
কত ছায়ারবি তায়, নীরবে ডাকিবে—"আয়",
অবিরল ছুলে যাবে স্বচ্ছ নীল নীর।

৫

গোধূলি গ্রাসিয়ে মুখে আসিবে তিমির,
লট পট কেশ,
একাকিনী উলঙ্গিনী, গতি অতি ধীর,
বিভাবরী ভয়ঙ্করী বেশ;
পাগলিনী পুলকিত, নীরবে গাইবে গীত,
নীরব বিকট হাস, নৃত্য ধেই ধেই,
সঙ্গীত বাড়িবে যত, আনাগোনা হবে কত,
নীরব ভৈরব তাল তাথেই তাথেই।

৬

ঝিম্ ঝিম্ ঝম্ ঝম্ ঝণ রণ ঝণ,
ত্রিযামা গভীর,
অযুত অযুত মেঘ আঁধার বরণ,
গজগতি দলিয়া সমীর;
রণমত্ত বজ্র মুখে, রঙ্গিণী খেলিবে বুকে,
নলকে দলকে চকু চমকে চপলা,
রঙ্গে ভঙ্গে বায়ু ঘূর্ণ, উচ্চ শাখী-শির চূর্ণ,
শ্রীহীনা প্রকৃতি, পরি' তিমির-মেখলা।

৭

বিজন বিপিনে যথা বিহরে বিষাদ,
প্রতি বায়ু সনে,

নীলিমায় ভেসে যায় আধ্‌খানি চাঁদ,
পাণ্ডুবর্ণ মলিন কিরণে ;
সেই ক্ষীণ রশ্মি ধরি, প্রেতকুল ধরা'পরি,
নাবিবে, ভ্রমিবে কেঁদে, হেরিব দু'জনে।
একে একে সঙ্গী হারা, জাগিয়া দেখিবে তারা,
কেহ বা পড়িবে খসি' জীর্ণ পত্র সনে।

৮

তুমি আমি দুই জনে হেরিব শ্মশান,
বিভূতি-ভূষিত,
ধক্ ধক্ চিতানল ভালে দীপ্তমান,
গণ্ডগোল শিবার সঙ্গীত ;
বিবশা ভূতলে সতী, চিতানলে জ্বলে পতি,
পিতা মাতা মৃত-পুত্রমুখ-পানে চায়,
বিছিন্ন লতিকা প্রায়, ধূলায় ঢালিয়া কায়,
যুবক চাহিয়া দেখে প্রাণ-প্রতিমায়।

৯

তুমি আমি মরুভূমে করিব গমন,
বালুময় দেশ,
কেবল অনলভার বহে সমীরণ,
দিনকর প্রাণহর বেশ ;
বালির তুফান উঠে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে,
প্রাণীশূন্য তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূ ধূ ধূ ধূ ধূধূঃ-কার, দূর চক্র সীমা তার,
উপমার স্থল মাত্র হৃদয় আমার।

শ্রীগিঃ—

রজনী-প্রভাত।

—০:০—

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সু। যদি অন্য কোন কারণই থাকে, তাহা কি আমি শুনিতে পাই না?

হ। যাহা শুনিলে অদ্যাবধি তোমার হৃদয়ে চিতানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া আজীবন অহরহ তোমাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিবে, তাহা শুনিয়া তোমার লাভ কি? দুঃখের অনভিজ্ঞতাই সুখ—আমি কোন্ প্রাণে, কি নিমিত্ত তোমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিব?—

বলিতে বলিতে হৃদয়োচ্ছ্বাসে হরেন্দ্রের আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল পুনরায় অশ্রু-নীরে ভাসমান হইল—সেই জলদ-গম্ভীরস্বর ক্রমশঃ ভগ্ন ও অস্ফুট হইয়া পড়িল। তিনি হৃদয়াবেগ গোপন করিবার নিমিত্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নতমুখে পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া রহিলেন।

হরেন্দ্রনাথের প্রয়াস বিফল হইল—সুচতুরা সুরবালা সহজেই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। আমার হরেন্দ্র—যাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে দিবানিশি মনে মনে পূজা করিয়া থাকি, প্রাণের প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, মনের সকল কথাই সকল সময়ে খুলিয়া বলি—সেই হরেন্দ্র—সেই প্রাণের প্রাণাধিক হরেন্দ্র আজ্ আমারই নিকট প্রকৃত বিষয় গোপম করিবার চেষ্টা করিতেছেন—আমাকে বিশ্বাস করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন—এই চিন্তা—এই বিষময়ী চিন্তা, সোহাগিনী সুরবালার মনে অভিমানশিখা প্রদীপ্ত

করিয়া দিল—তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত করিল। অভিমানিনী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন :—বুঝিয়াছি—আজ তুমি আমাকে পর ভাবিয়াছ—আজ আমি তোমার সে সুরবালা নহি। তুমি আমাকে যাহাই ভাব না কেন, আমি তোমাকে "আপনার" ভিন্ন "পর" ভাবি নাই, ভাবিতে পারিবও না। মনে করিয়াছ, যে আমাকে না বলিলে আমি সুখে থাকিব; কিন্তু ইহা তোমার ভুল—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার আবার সুখ দুঃখ কি?—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। যখন জানিতে পারিয়াছি যে তোমার মনে সুখ নাই তখন আমারও সুখ তিরোহিত হইয়াছে। তোমার এ দুঃখ কোথা হইতে আসিল—তাহা শুনিলেও যা', না শুনিলেও তা',—আমার পক্ষে এক্ষণে দুই সমান। তুমি আমাকে না বলিয়া ভালই করিয়াছ: যদি ইহাতেও তুমি কণামাত্র সুখী হও—আমি শুনিতে চাই না, আমাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। উৎকণ্ঠায় পুড়িয়া মরিলেও আমি সুখে মরিব—মরিবার সময়ে তোমাকে সুখী দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় লইয়া যাইব। মরি, ক্ষতি নাই—তুমি সুখী হইলেই—

মনোব্যথায় সুরবালার ক্ষুণ্ণস্বর রুদ্ধ হইল, তাঁহার ইন্দীবরলাঞ্ছিত নেত্রযুগল অল্পে অল্পে অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্রনাথ এপর্য্যন্ত অধোমুখেই অবস্থান করিতেছিলেন—অতিকষ্টে অভিমানিনী সুরবালার বাক্য-বাণ সহ্য করিতেছিলেন কিন্তু এক্ষণে সহসা সেই মধুর-গরল-জড়িত স্বর শুনিতে না পাইয়া করুণ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। চারি চক্ষু একত্রিত হইল: সোহাগিনীর অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল—সুরবালার উজ্জ্বল নয়ন হইতে উজ্জ্বলতর মৌক্তিকবিন্দু সার গাঁথিয়া বক্ষোপরি পতিত হইল।

সেই অশ্রুনীরে হরেন্দ্রের মন ভিজিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল : তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিয়া উঠিলেন—যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে, দুঃখ করিলে আর——বাক্য-শেষ না হইতে হইতেই হরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া পুনরায় চুপ করিলেন, আর কিছুই বলিলেন না।

এই সময়ে, অমাগগণে দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় সুরবালার আঁধার হৃদয়ে একটী চিন্তা উদিত হইল। তিনি অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—তোমার জমীদারি সম্বন্ধে কি কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে ?

হ। না—সে বিষয়ে কোন অশঙ্কা নাই।

এইমাত্র কহিয়া হরেন্দ্রনাথ সত্বরে সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিলেন—একাকিনী সুরবালা শূন্য-নয়নে তাঁহার পথপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আকুল-হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেনঃ—তবে উনি কি নিমিত্ত দুঃখিত—এত কিসের ভাবনা ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——oo——

মনের সাধ মনেই রহিল।

গ্রীষ্মকাল, বেলা দ্বিপ্রহর ; জগৎ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডপ্রায়—দিনমণির প্রখর কিরণ ধরণী-বক্ষে তরলাগ্নির ন্যায় পরিব্যাপ্ত। জীবলোক নিস্তব্ধ ও জড়ীভূত ; স্বভাব তুষানলে দহ্যমান। এই ভয়ানক আতপ সময়ে, কি জলচর, কি ভূচর, কি খেচর, সকলেই সুশীতল ছায়ায় দেহ জুড়াইতেছে—কেবল আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা

ভৈরবী একাকিনী কোথা হইতে দূরবর্ত্তি-মেদিনীপুরাভিমুখে দিন-কর-করতাপিত একটী প্রশস্ত পথ দিয়া পদব্রজে আসিতেছে। পথের উভয় পার্শ্বে মাঠ—হরিদ্রা বর্ণ—ধূ ধূ করিতেছে : গগণের প্রান্তভাগ মাঠের চরম সীমায় বিলীন হইয়াছে! মাঠ—জনশূন্য ; পথশ্রান্ত-পথিকের বিশ্রাম-স্থান-বিরহিত ; মধ্যে মধ্যে এক একটী পত্র-শূন্য বৃক্ষ, নিদাঘ কালের ভীষণ কীর্ত্তি-স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়-মান। ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণ বায়ু উত্তপ্ত ধূলা মাখিয়া শুষ্কপত্র লইয়া খেলা করিতেছে—নাচিতেছে, ছুটিতেছে ও ঘুরিতেছে ; অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া অনন্ত-বায়ুর সঙ্গে মিলাইয়া যাই-তেছে। ভৈরবী চলিতেছে—বিরাম নাই, এক ভাবেই চলিতেছে ; শরীর আপাদ-মস্তক ঘর্ম্মাক্ত, মুখ—শুষ্ক ও আরক্ত-কালিমায় সমাচ্ছা-দিত। ভৈরবীর পরিধান গৈরিক-বসন, দক্ষিণ করে লৌহময় ত্রিশূল ; বামহস্ত, কপোল-বাহি-শ্রমবারি-মার্জ্জনে সময়ে সময়ে অঞ্চলাসক্ত। ভৈরবী চলিতে চলিতে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে পুরো-ভাগে চাহিল—চাহিয়া পরিতৃপ্তা হইল :—মেদিনীপুর, সমীপবর্ত্তী—ছায়াবাজীর দৃশ্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হই-তেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার আর অধিক বিলম্ব নাই—এই চিন্তায়—এই আশায় ভৈরবীর মনে উৎসাহের উদ্রেক হইল—শ্রান্ত পদ পুনরায় স্বকার্য্যসাধনে নিরত হইল। সে দ্রুততর-পাদ সঞ্চারে কিয়দ্দূর গমন করিবা মাত্র লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল—শ্রমাতিশয়বশতঃ তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে সঙ্কল্প করিল। মনের সহিত দেহের কি অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ! যে বাস-নায় এই ভয়ঙ্কর রৌদ্রে একাকিনী উত্তপ্ত পথে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ভৈরবীর কোমল চরণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ; আতপ-তাপে কমনীয় স্নিগ্ধ-শ্যাম-কলেবর মলিন রেখায় কলঙ্কিত হইয়াছে ; দেহ-শোণিত

জল হইয়া ঘর্ম্মধারায় পরিণত হইয়াছে—এক্ষণে ক্লান্তিপ্রযুক্ত, সেই বাসনা—সেই অন্তরের অন্তরোদ্ভূত অভিলাষ, মন হইতে ক্ষণকালের জন্য অপসৃত হইল! ভৈরবীর বিশ্রাম-স্থান অন্বেষণ করিতে হইল না : নিকটেই সরোবর-উপকূলে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল—সে তাহার বিস্তৃত ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। সরোবরের জল, স্বচ্ছ—দর্পণের ন্যায়—উজ্জ্বলনীলগগণের প্রতিবিম্ব আয়ত-বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতেছে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ মৃণ্ময় পাড়—হরিদ্বর্ণ-তৃণ সমাচ্ছন্ন ; দুই ধারে দুইটী শাণবাঁধান ঘাট—সোপান-পরম্পরা সার গাঁথিয়া একে একে জলে অবগাহন করিতে নামিয়া চলিয়াছে। ভৈরবী সরোবরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃতা হইল ; সে ভাবিতে লাগিল :—এ কাহার সরোবর ?—নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি কি ইতিপূর্ব্বে কখন এই সরোবর দর্শন করিয়াছিলাম ? কৈ এরূপ স্মরণও হয় না। সবেমাত্র চারি বৎসর হইল—মনে করিলে বোধ হয়, যেন সে দিন—আমি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়াছি, মেদিনীপুরের সহিত আমার সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে ; আর আর সকল কথাই—ভাবিলে হৃদয় বিশ্লেষিত, মর্ম্মস্থল দগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়—সেই সকল কথাই, অনন্তকালব্যাপী চিতানল প্রায়, আমার মনে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে ; কৈ ইহার বিষয় ত কিছুই স্মরণ নাই। এই ত একটী পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, না জানি আরও কত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে! তবে আমি যে আশায়—যাহা এক বার দেখিয়া নয়ন জুড়াইবার বাসনায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিলাম, তাহা কি দেখিতে পাইব না ?—পাই ভাল, নতুবা তাহার পরিবর্ত্তনের সহিত আমার মনও পরিবর্ত্তিত হউক—ভুতপূর্ব্ব ঘটনাবলি বিস্মৃতি-সলিলে নিমগ্ন হউক !

ভৈরবীর চিন্তা-স্রোত সহসা প্রতিরুদ্ধ হইল—অনতি-দূরবর্ত্তী একটী শ্বেত পদার্থ তাহার শূন্য-নয়ন-পথে পতিত হইবামাত্র তাহার চমক হইল। ভৈরবী দেখিল অমল-ধবল-বসন-পরিধানা এক বৃদ্ধা সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। ভৈরবী তাহাকে দেখিয়াই চিনিল—চিনিতে পারিয়াও কিছুই বলিল না, মুখ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সরসী-শোভা দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধা বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, ভৈরবীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সস্নেহ স্বরে কহিল—কেও মা বিমলে। এত দিন কোথা ছিলি মা! এত রৌদ্রে—

ভৈরবীর নাম বিমলা!!

বিমলা আরক্তনয়নে তর্জ্জন করিয়া বৃদ্ধার বাক্যে বাধা দিয়া কহিল—লক্ষ্মি! সাবধান—আর যেন ঐ নাম তোর মুখ হইতে বাহির হয় না; আর কখন তুই আমাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকিস্ না—মনে কর্ যেন তোর সেই-আমি মরিয়া গিয়াছি।

মনোবেদনায় বিমলার রুদ্ধ-কণ্ঠে আর কথা সরিল না।

বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী—আমাদিগের পরিচিতা সুরবালার পরিচারিকা।

লক্ষ্মী বিমলার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইল এবং সঙ্কুচিতস্বরে কহিল—তবে কি বলিয়া ডাকিব মা?—বলিয়া দাও।

বিমলা ত্রিশূল দেখাইয়া মধুর-গম্ভীর-স্বরে কেবল কহিল—ভৈরবী।

লক্ষ্মী বলিল—ভাল তাহাই বলিয়া ডাকিব।

লক্ষ্মীর স্বর—সস্নেহ ও করুণরসপূর্ণ। সেই স্বর বিমলার প্রাণে যাইয়া বাজিল—শৈশব কালের সকল কথাই, বেলা-বিচুম্বি-তরঙ্গমালার ন্যায়, একে একে তাহার মনে আসিয়া অন্তরিত হইতে লাগিল। বিমলার মনে হইল:—একদিন—সে লক্ষ্মীর স্নেহময় অঙ্কে বসিয়া

কতই খেলা করিয়াছে ; "সই মা" "সই মা" বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কতই আদর করিয়াছে ; অকারণ কতই মধুর হাসি হাসিয়াছে! লক্ষ্মী সে হাসি—সেই অন্তরের পবিত্র আনন্দোচ্ছ্বাস, কতই ভাল বাসিত! আর এক দিন—সে বাল-চপলতা-বশতঃ লক্ষ্মীর পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়াছিল! লক্ষ্মী, "আর তোকে পুত্তলী দিব না" বলিয়া তিরস্কার করিলে, সে তাহার অদূরে বসিয়া কতই রোদন করিয়াছিল! স্নেহময়ী তাহার রোদন দেখিয়া থাকিতে পারে নাই, স্বয়ং অশ্রুনীরে বক্ষ ভাসাইয়া, কতই আদরের—কতই যত্নের সহিত তাহাকে অঙ্কে বসাইয়াছিল—কল্পনার কুহকে ভাবী সুখের স্বর্ণ-প্রতিমা দেখাইয়া তাহাকে কতই ভুলাইয়াছিল!—আর সেই এক দিনের কথা—ভাবিতে ভাবিতে বিমলার কমল-দল-নিভ নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল—সেই এক দিন—যে দিন লক্ষ্মী দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, "কি জানি, যদি প্রভু-গৃহে মরিয়া যাই, আর দেখিতে পাইব না"—এই আশ-ঙ্কায় তাহার প্রাণের বিমলাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিতে ও একবার তাহাকে কোলে করিতে তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল ; সে তাহার অঞ্চল ধরিয়া "সই মা! তুই গেলে আমি বাঁচিব না" বলিয়া কতই রোদন করিয়াছিল! আর লক্ষ্মী—সেও কত কাঁদিয়া-ছিল—"যাইব না" "যাইব না" বলিয়া তাহাকে ভুলাইতে যাইয়া আপনিই রুদ্ধকণ্ঠে কত ক্রন্দন করিয়াছিল!

বিমলা ভাবিল :—ছিঃ, আমি কি পাষাণহৃদয়া : যাহাকে পূর্ব্বে নাম ধরিয়া ডাকিতে মন উঠিত না—কেমন বাধ বাধ ঠেকিত, আজ তাহাকে কত কটু কথা বলিয়া মনে দুঃখ দিয়াছি, কর্ম্মটা ভাল হয় নাই।

বিমলার মনে দুঃখ হইল, সে অনতিবিলম্বে লক্ষ্মীর হস্ত সাগ্রহে

ধারণ করিয়া সস্নেহ ও অস্ফুটস্বরে কহিল—সই মা! রাগ করিস্ না। বিশেষ কারণ না থাকিলে, আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে তোকে নিষেধ করিতাম না; আমার মতিস্থির নাই, কি বলিতে কি বলিয়াছি——এ সরোবরটী কার?

লক্ষ্মী সহাস্যে ও পূর্ব্ববৎ সস্নেহ স্বরে কহিল—আমি কি মা! কখন তোর উপর রাগ করিয়াছি, যে আজিও রাগ করিব?—এই দীর্ঘিকা আমার বাবুর, ইহার নাম কুমু-দীঘি।

কুমু-দীঘি! নামের সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া, বিমলা উৎসুক-কণ্ঠে কহিল:—ইহার কুমু-দীঘি নাম দিবার কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

লক্ষ্মী বৃদ্ধা তাহাতে আবার স্ত্রী-লোক, সুতরাং বৃদ্ধ-স্ত্রী-জন-সুলভ-বাচালতার বশবর্ত্তিনী হইয়া কহিতে লাগিল:—তা' জান না?—আমার বাবুর কন্যার নাম কুমুদিনী; আদর করিয়া আমরা কুমু বলিয়া ডাকি। মরি মরি! তাহার বালাই লইয়া মরি—সেই অতুলনীয় রূপ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। কুমুর নামে বাবু এই সরোবর উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতেই ইহার নাম কুমু-দীঘি।

বিমলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের কুমুর কি বিবাহ হইয়াছে?

ল। না মা: কুমুর বয়স এই সবে মাত্র চারি বৎসর। সেটী বাঁচিয়া থাকিলে——লক্ষ্মীর কণ্ঠ-রোধ হইল—সে মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে লাগিল।

বি। সই মা! সেটী কে? হরেন্দ্রবাবুর কি আর একটী সন্তান ছিল?

লক্ষ্মী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল:—কি বলিব, পোড়া বিধি মাঠাকুরাণীকে যমজ সন্তান দিয়া আবার একটীকে কাড়িয়া

লইয়াছে! প্রসবান্তে কুমু চক্ষু মিলিল—আর সেই পরের ছেলে—আমাদের হইলে আমাদেরই কাছে থাকিত।—একবার চাহিলও না—অনায়াসেই চক্ষে ধূলি দিয়া চলিয়া গেল! ডাক্তার বাবু তাহাকে শ্মশানে রাখিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন—

পরে লক্ষ্মী কি বলিল, বিমলা কিছুই শুনিতে পাইল না; বাত-বিকম্পিত-পল্লবিনীর ন্যায় স্পন্দিত-কলেবরে ত্রিশূলোপরি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

হিন্দু কুমারী।

(প্রাপ্ত।)

এই বেলা ধরামুখ হের লো, সুন্দরি,
হের বন, উপবন, কুসুম কানন,
তরঙ্গিণী রঙ্গে কত হাসে সুচিকণ——
তব হৃদয়ের ছবি——হের নেত্র ভরি;
স্বাধীনতা সখী সনে খেল সুখে চরি।
আসিছে বিষম দিন তব, স্বজনীরে,
হরি লয়ে ফেলিবে লো চির তরে মরি
তোমারে নির্দ্দয় সেই গভীর তিমিরে;
উদিবেনা সুখ-ভানু হৃদয়ে আবার,
হাসিবে না তার করে জীবন লহর;
রসাল লতিকা যথা সুশীতল ধার
বিহনে শুকায়, তব শুকাবে অন্তর।
হেরি এই চিত্র চারু, ভাবি ভাবী আর
কাতর কবির হৃদি, নেত্রে নীর ধার॥

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছায়ালোক-সম্পাত।

কে সেই ছায়ালোক-বিন্যাস পটু অলৌকিক চিত্রকর? ধারা-বরিষণ-কালে ঘোরা আঁধারময়ী কাদম্বিনীতে সৌদামিনীর হাসি মিশাইয়া, গোধূলি সময়ে প্রদীপ্ত সূর্য্যকরের আভাসে রজনীর আঁধা ধাঁধা ভাব মিশাইয়া, কে এই জগতে অলোকসামান্য মানব-কল্পনার অনবধারণীয় দৃশ্য দেখাইতেছে—মরি মরি কে এই সকল দৃশ্যের দর্শয়িতা? কে সেই অতুল কারু?—হে অচিন্তনীয়, অপারজ্ঞানময়, তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানিনা;—ভাবোদ্বেল হৃদয়ে, ক্ষীণবাক্যে তোমায় কি বলিয়া ডাকিব জানিনা;—তোমার সৃষ্ট বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি-প্রণালী কি করিয়া চিন্তা করিব?—জীব-সমুদ্রের বুদ্বুদ্—সৃষ্টি-মহাসাগরের জলকণা—আমি তোমার সৃষ্টির কোন্ অংশ ভাবিব?—যাহাই ভাবি তাহাই বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া ফেলে। "জীবন, বিস্ময়, মরণ, এই তিনটী মনুষ্যগঠনভূত"—এই মহাবাক্য যে কবির লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে—তাঁহার লেখনী সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করুক্!—তিনিই যথার্থ ভাবুক!—তিনিই প্রকৃত দার্শনিক!—তাঁহার বাক্যের সত্যতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ের শোণিতে শোণিতে অনুভব করি। প্রকৃতির ভাব-বিমোহন, কল্পনোদ্দীপক, মনোহর দৃশ্যে এই ছায়ালোক সম্পাতের যে মাধুরী ও মাদকতা তাহা সকল সময়েই সকল চক্ষু-শীল জনের চক্ষু আকৃষ্ট করিতেছে, সকল হৃদয়শীল জনের হৃদয় মুগ্ধ করিতেছে;—হৃদয় যেন চক্ষুদ্বারা সেই মাধুরী দর্শন করে, চক্ষু যেন হৃদয়দ্বারা সেই মাদকতা অনুভব করে।

বস্তুতঃ এই ছায়ালোক-বিন্যাসের কার্য্যকরিতানুভবই কবি-

হৃদয়ের অমূল্য সম্পত্তি। যিনি সেই কার্য্যকরিতা অনুভব করিতে পারেন নাই তাঁহার মত দুরদৃষ্ট এ জগতে আর নাই; কিন্তু সুখের বিষয় জগতে এরূপ লোক অতি অল্প। কালিদাস, সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, হোমর প্রভৃতির ন্যায় বাক্যপ্রসরে সামর্থ্য-প্রদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা। কিন্তু নির্বাক হইলেও সেই কার্য্যকরিতানুভবে অনুক্ষণ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বিহ্বলতা জন্মে এবং উত্তরোত্তর নয়নের তৃষাবৃদ্ধি হয়, এরূপ লোক বিরল নহে।

জড়চিত্রে এই ছায়ালোক-বিন্যাস যেরূপ রমণীয়তাজনন, জীবচিত্রে সেই ছায়ালোক-সম্পাতই সেরূপ অতুলসুখহেতু। এই জীবনের সুখোদ্ভাবকতা এবং দুঃখজনকতা এতদুভয়শক্তি প্রয়োজনীয়। এই শক্তিদ্বয়ের একতরের অভাবে কোন জীবন সম্পূর্ণ হইবেনা। নিরবচ্ছিন্ন আলোক চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়; যাহারা অবিরল আলোকের প্রার্থনা করে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ—তাহারা জীবতত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম ধারণা করিতে পারেনা। ছায়ার সম্পাত না থাকিলে কোন জীবন কার্য্যকরী হইতে পারেনা—মনুষ্যের উপকারে আইসে না। যে ব্যক্তি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথাসময়ে আহার ও বিহার, শয়ন ও বিশ্রাম করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় নিরন্তর সমভাবে চলিতেছে—যাহার কার্য্যসমূহে অবিরল তন্দ্রাপ্রণোদক একশব্দের উদ্ভব হইতেছে—এই জগতের অযুতাংশ লোকের সহিতও তাহার সহানুভূতি অসম্ভব। যাহার জীবনে কখন ঘনঘটাচ্ছন্না, সহস্রাশনি-নিনাদিনী, প্রচণ্ড বাতোচ্ছ্বসিতা দুঃখরজনী, কখন নিশামণি-করোজ্জ্বলা, পিককাকলীকূজিতা, মলয়-মারুত-শ্বাসিনী সুখ-রজনী—যিনি সেই দুঃখরজনীতে ক্ষণমূর্চ্ছিত, ক্ষণচেতন হইয়া আলোক প্রত্যাশায় প্রাণধারণ করিয়াছেন; যিনি সেই সুখরজনীতে অতৃপ্তি লাভ করিয়া জগতকে নিজ সন্তোষ-

ধারায় সিক্ত করিয়াছেন ; সেই ছায়ালোক-বিন্যাস-মনোহর মনোহর চিত্রই—নয়নতৃপ্তিকর, হৃদয়োন্মাদক এবং অমূল্যোপদেশ-রত্নখচিত।

যদ্যপি কালিদাস শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের গান্ধর্ব-বিবাহের পর দুর্ব্বাসাশাপ ও আঙ্গুরীয়ক-ভ্রংশ এই দুইটী ঘটনার অবতারণা না করিতেন তাহা হইলে শকুন্তলার এত আদর কখনই হইত না।—এই দুইটী দুর্ঘটনাতেই শকুন্তলা-জীবনের মনোহারিত্ব!—এই দুইটী দুর্ঘটনাই শকুন্তলাপাঠে চিত্তের চঞ্চলতা ও উৎসুকতা সম্পাদন করে। ভবভূতির "উত্তর-চরিত" কি জন্য এত মনোমদ হইয়াছে?—রামচন্দ্র সীতার কোমল-দেহলতাশ্লেষণে অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন:—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥"

এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া সম্বাদ দিল:—
"আসন্ন পরিচারও দুম্মুহো দে অসস।"

সেই দুর্ম্মুখই তাঁহার স্বর্গসুখ একটী বাক্যস্ফুরণে ভাঙ্গিয়া দিল ; তখন গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়া প্রাণপত্নির উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন :

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে!

* * * * * * * * * *

হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবম্বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ।

ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ।
নাথবন্তস্ত্বয়া লোকাস্ত্বমনাথা বিপৎস্যসে॥"

এইরূপ সুখালোক-নিবেশের পর দুঃখচ্ছায়াপাতই প্রকৃতি-কবির কার্য্য!

আমরা আমাদিগের জীবনগত ছায়ালোকের সুন্দর সম্পাত কি তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে মনুষ্য-হৃদয় ও মনুষ্য-মন এই দুই চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিব।

এ জগতে এমন নৃশংস লোক কেহই নাই যাহার হৃদয়ে দয়ার বসতি নাই। দুরাচারিণী লেডি ম্যাক্‌বেথ্, নিরপরাধ ডন্‌কানের প্রাণ-বধ করিতে ম্যাক্‌বেথ্‌কে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে এরূপ হৃদয়বৃত্তি-বিপর্য্যয়-কারিণী কথা নিঃসৃত হইয়াছিল:

"——I have given suck, and know
How tender 'tis to love the babe that milks me
I would, while it was smiling in my face,
Have plucked my nipple from his boneless gums,
And dashed the brains out, had I so sworn as you
Have done to this."

কিন্তু তত্রাচ সে স্বহস্তে সেই সদাশয়, বিপদশঙ্কাহীন, বিশ্বস্ত নৃপতির প্রাণ বিনাশ করিতে পারে নাই—পাপীয়সী প্রলয়কারিণীও বলিয়াছিল:

"——I laid their daggers by;
He could not miss 'em. Had he not resembled
My father as he slept, I had done 't."

আবার দেখ, ম্যাক্‌বেথ্ রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া একবার ভীষণ পাপপথে অগ্রসর হইতেছে, একবার পশ্চাতে সরিয়া আসিতেছে। বলিতেছে

" If it were done, when 'tis done, then 'twere well
It were done quickly. * * * *
* * * He 's here in double trust :
First, as I am his kinsman and his subject,
Strong both against the deed ; then, as his host,
Who should against his murderer shut the door,
Not bear the knife myself. "

কিন্তু যখন লেডি ম্যাক্‌বেথের নিষ্ঠুর প্ররোচনায় জগদ্বিকম্পন, দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল ; যখন সে নিজ অসংশোধনীয় কার্য্যের গর্হিততায় সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উৎকণ্ঠিত, বিবেকদংষ্ট হইয়া বসিল :

" ——I heard a voice cry, ' sleep no more ;
Macbeth does Murder sleep, the innocent sleep'
* * * *
Still it cried ' sleep no more ' to all the house :
'Glamis hath murdered sleep ; and therefore Cawdor
Shall sleep no more,—Macbeth shall sleep no more.' "

তাহার কিয়ৎপরে দ্বারে আঘাত শুনিয়া সে ডনকানের পুনঃ প্রাণপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া বলিল :

" Wake Duncan with thy knocking ! Ay, would thou couldst "

যে সময়ে হতভাগ্যের হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষানিষ্পেষিত, অধর্ম্ম-কলুষিত, অভ্যাগত—মহোপকারী——প্রজাবৎসল ভূপতির শোণিতপিপাসু তখনও ধর্ম্ম-জ্ঞান সেই তামসহৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই।

এই প্রকৃত মনুষ্যহৃদয় ! যে কবি এইরূপ সুনিপুণকরে নিজ-তুলিকায় ছায়ালোকের পার্য্যায়িক বিন্যাস করিয়াছেন, তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিবেন, সকলের মনোহরণ করিবেন, তাহার বৈচিত্র্য কি ?

ঐরূপ মনুষ্য-মন অতীব-প্রভাময় কিম্বা নিতান্ত হীনপ্রভ হওয়া সম্ভব নহে। সাতিশয় নির্ব্বোধ লোক পৃথিবীতে দুর্লভ; কোন না কোন বিষয়ে কাহারও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখা যায়। অপর পক্ষে যাঁহার কখন ভ্রম হয় নাই এরূপ লোক দেখা যায় না। যিনি নিজ বুদ্ধিবলে মহোচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন তাঁহাকেও সময়ে সময়ে বালকচাপল্যে অভিভূত হইতে দেখা যায়; আবার যাহাকে নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য ভাবা গিয়াছে তাহাকেও কখন কখন সুবদ্ধিগত কার্য্য-সম্পাদন করিতে দেখা যায়। যাঁহারা এ প্রসঙ্গ অযৌক্তিক মনে করেন তাঁহাদিগকে আমরা স্থূলদর্শী বিবেচনা করি। এতদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই—ইতিহাস রাশি রাশি প্রমাণ-প্রদর্শন করিতেছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কেপ্লারের ধীশক্তি কিরূপ তেজস্বিনী ও উদ্ভাবিনী ছিল তাহা সকলে অবগত আছেন—ফ্রান্সদেশ তাঁহার মহিমাছটায় গৌরবান্বিত হইয়াছে—তিনি ইংলণ্ডীয় মনস্বি-প্রধান নিউটনের আবিষ্ক্রিয়া সমূহের অধিকাংশ পুরানুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এরূপ মত প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই যে, পৃথিবী একটী বৃহৎ জন্তু এবং তাহার হনুদ্বয় বিনির্গত জলে মহাসাগরাদির উৎপত্তি।

কাব্য, ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস, যাহা কিছু স্বতঃ চিত্ত আকর্ষণ করে, অচিন্ত্যোৎসুক্যে পরিপূর্ণ করে এবং হৃদয় চঞ্চল-দোলায় আন্দোলিত করে, সকলেই প্রকৃতি, জীবন, হৃদয় ও মনের এই বিমোহন ছায়ালোক-সম্পাত দৃষ্ট হয়। যে সর্ব্ব নিয়ন্তা, অসীম-চিন্তাশীল পুরুষ তাঁহার জগত-চিত্রে এই অপরূপ বৈপরীত্যের সমাবেশ করিয়াছেন তাঁহাকে প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে আবাহন করি।

শ্রীলঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

—00:00—

ভিষক্-সুহৃদ। ভৈষজ্য শাস্ত্রাধ্যায়ী পরীক্ষার্থিদিগের ও অভিনব চিকিৎসকগণের সাহায্যার্থে শ্রীরাধাগোবিন্দ কর সংকলিত।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং রোগতত্ত্বাদির লিপি-করণ সুচারু প্রণালী-বদ্ধ। রাধাগোবিন্দ বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "যে উদ্দেশ্যে ভিষক-সুহৃদ প্রকাশ করিলাম তাহা সফল করিবার নিমিত্ত চেষ্টা ও শ্রমের ত্রুটি করি নাই।"—আমরা এই বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি এবং তজ্জন্যে তিনি আমাদের প্রশংসাভাজন সন্দেহ নাই। এই পুস্তক সঙ্কলনে যে ভৈষজ্য শাস্ত্রাধ্যায়িদিগের পরীক্ষা প্রদান ও অভিনব চিকিৎসাকরণ-সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা হইবে এমত নহে, ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট উপকার দর্শিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদের মতে এই পুস্তক চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যায়ী মাত্রেরই এক একখানি থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ছাই ভস্ম নাটকাদি না লিখিয়া যাঁহারা এবম্বিধ লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হয়েন তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী।

মুরলা। (উপন্যাস)—শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকার চন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়নদ্বারা সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। আমরা এই উপন্যাসটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার গল্পাংশে বিশেষ মনোহারিত্ব দেখিতে পাইলাম না। লেখক এই উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া সকলগুলিকে সর্ব্বাঙ্গীন রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যে স্বভাবের সুনিপুণ চিত্রকর এবং তাঁহার রচনা যে সুমার্জ্জিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। স্থল বিশেষে কৌতুকাবহ বিবিধ প্রবাদবাক্যের ও ব্যক্তিবিশেষের মুখবিনির্গত আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সন্নিবেশ ক্ষেত্রপাল বাবুর বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যাহা হউক্, সামান্যতঃ পুস্তকখানি বড় মন্দ হয় নাই।

বাঁদরামী। খাম্‌খেয়ালী পত্রিকা। আমাদের পাহাড়ে বন্ধু কর্‌লো হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাহিত্য-সংসারকে দুই ছড়া উপহার দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছড়া দুটী সুপক্ক বা রসাল নহে, রঙ্ ধরিয়াছে মাত্র। যাহা হউক্, আমাদের সহযোগী উচ্চ-বৃক্ষশাখা হইতে মধ্যে মধ্যে এইরূপ রং তামাসা নর্ত্তন কূর্দ্দন দেখান তাহাতে আমরা সুখী বৈ অসুখী হইব না।

দিলীপের প্রতি সুরভির অভিশাপ।

যদিচ সংস্কৃত ভাষা ইদানীং জর্ম্মনী প্রভৃতি প্রতীচীন দেশে এবং ভারতবর্ষে সমাদৃত হইতেছে, তত্রাপি অনেকেই সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহকে অসার-বাক্য-পূর্ণ বলিয়া তাচ্ছল্য করেন। বিখ্যাত পণ্ডিতবর মেকলে সংস্কৃত ভাষার বিন্দু বিসর্গ না জানিযাও সংস্কৃত পুস্তকাবলি ভস্মরাশি রূপে উল্লেখ করায় দেবভাষার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাতৃভাষানভিজ্ঞ যৎকথঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় যুবকগণের মধ্যে অনেকেই মেকলের অনুকরণ করিয়া থাকেন। মেকলে যদি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ হইতেন, সংস্কৃত-সাহিত্য-জলধিতে কত অমূল্য নিধি আছে জানিতে পারিতেন। সংস্কৃত কাব্যাদিতে অনেক স্থলে গ্রন্থকারগণ আপনাদের গূঢ় ভাব এরূপ অলঙ্কারাদিতে আবৃত করিয়াছেন যে বাস্তবিক অতীব মনোহারিণী জ্ঞান-প্রদায়িনী কল্পনা-গর্ভরচনাশ্রেণী সহসা অসংলগ্ন, নীরস শব্দবিন্যাসময়, কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া অশিক্ষিত, অল্পবুদ্ধি, অনভিনিবেশী যুবাগণের অশ্রদ্ধাভাজন হয়। অমৃতভাষী চিরস্মরণীয় মহাকবি কালিদাস বিরচিত রঘুবংশের প্রথম সর্গ প্রস্তাবিত বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্তের স্থল। কবিবর উক্ত সর্গে লিখিয়াছেন যে সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট দিলীপের পুত্র না হওয়ায় তিনি স্বপত্নী সুদক্ষিণা সমভিব্যাহারে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া অনপত্যতা নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিলে মহর্ষি মহারাজের বংশহীনতার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

পুরা শক্রমুপস্থায় তবোর্ব্বীং প্রতি যাস্যতঃ।
আসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্রাজ্ঞীম্ ঋতুস্নাতামিমাং স্মরন্।
প্রদক্ষিণক্রিয়ার্হায়াং তস্যাং ত্বং সাধু নাচরঃ॥
অবজানাসি মাং যস্মাৎ অতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা॥

অর্থাৎ পুরাকালে যখন তুমি ইন্দ্রকে পূজা করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছিলে কল্পতরুচ্ছায়াশ্রিতা সুরভি তোমার পথে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজ্ঞী ঋতুস্নাতা ছিলেন। ধর্ম্মলোপ-ভয়-হেতু রাজ্ঞীর ঋতুরক্ষার জন্য ব্যগ্র থাকায় তুমি সুরভিকে যথাযোগ্য প্রদক্ষিণ কর নাই। সেই হেতু সুরভি তোমার প্রতি অভিশাপ দিয়াছে যে তাহার অপত্যাকে আরাধনা না করিলে তোমার পুত্র হইবেনা।

আপাততঃ মহর্ষির এইরূপ কথা অশ্রদ্ধেয় বোধ হইতে পারে। সুরভিনাম্নি গাভীকে মহারাজ অভ্যর্থনা করেন নাই তাহাতে ঐ গাভী মহারাজকে অভিশাপ দিবে ও মহারাজের তজ্জন্য পুত্র জন্মিবার প্রতিবন্ধক ঘটিবে, এইরূপ উপাখ্যান নীরস ও উদ্দেশ্য বিহীন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু মনোনিবেশ করিয়া ভাব সংগ্রহ করিলে উল্লিখিত শ্লোকত্রয় নিতান্ত সুভাবপূর্ণ দৃষ্ট হয়। কল্পতরু ও সুরভি আর্য্য কবিগণের অত্যুৎকৃষ্ট কল্পনার উদাহরণ। তাঁহারা প্রকৃতিকে কল্পতরু ও সুরভিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়ের নিদর্শন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য কৃত বেদান্ত-অভিবাদক পঞ্চদশী গ্রন্থের চিত্রদীপঃ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে

ন নিরোধো নচোৎপত্তি র্নবদ্ধো নচ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্নবৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।

যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেবহি॥ (১৫০ শ্লোক)

অর্থাৎ—যাহার বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, সাধনা নাই, মোক্ষের অভিলাষ নাই, সেই জীব পরমার্থিক। মায়ানামধারিণী কামধেনুর দুইটী বৎস—জীব ও ঈশ্বর। ইহারা ইচ্ছামত দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করে কিন্তু তাহাতে অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হয় না।

পরে মায়া যে প্রকৃতি তাহাও উক্ত পরিচ্ছেদে প্রকাশ আছে। যথা

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।

তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ (৮৭ শ্লোক)

অর্থাৎ—প্রকৃতিকে মায়া এবং ঈশ্বরকে মায়িক বলিয়া জান। তাঁহার অবয়ব হইতে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও ঐরূপ মত ব্যক্ত আছে।

অধিকন্তু মানবগণের মনোবাঞ্ছা কেবল প্রকৃতির সাহায্যে ফলবতী হইতে পারে। বাঞ্ছনীয় সমুদয় বস্তুই উপার্জ্জনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অবলম্বন ভিন্ন তাহা হস্তগত হইতে পারে না। প্রকৃতি দেবী উক্ত নিয়ম কলাপ স্পষ্টরূপে সকলকে বলিয়া দিতেছেন। প্রকৃতি প্রসন্না হইলে অর্থাৎ তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিলে মনোরথ পূর্ণ হয়। কল্পতরু ও সুরভি প্রসন্ন হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব আর্য্য কবিগণ প্রকৃতিকে সুরভি ও কল্পতরু রূপে বর্ণনা করিয়া এককালে কল্পনার মনোহারিত্ব প্রকাশ করিয়া প্রকৃতির নিয়মানুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তী হইলে দুঃখের হ্রাস ও সুখের বৃদ্ধি হয়, এই গুরুতর তত্ত্বের অভি-বাদন করিয়াছেন। সেই প্রকৃতিরূপ সুরভি বশিষ্ঠের সম্পত্তি—

প্রকৃতি তপোধনের আয়ত্তাধীন। দেবাংশাবতংস-সূর্য্য-প্রভাব সূর্য্য-বংশের এরূপ কুলগুরু হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলতঃ কবির বক্তব্য এই যে সম্রাট দিলীপ অতুল-বৈভব-সম্ভোগ-পরতন্ত্র হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন না করা হেতু হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন ; তন্নিবন্ধন তাঁহার পুত্রোৎপাদনের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছিল। বশিষ্ঠ মুনি অতঃপর যে উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। তিনি মহারাজাকে সুরভি-পুত্রী নন্দিনীর এইরূপ আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। যথা—

বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বৎ আত্মানুগমনেন গাম্।
বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥
প্রস্থিতায়াং প্রতিষ্ঠেথাঃ স্থিতায়াং স্থিতিমাচরেঃ।
নিষণ্ণায়াং নিষীদাস্যাং পীতাম্ভসি পিবেরপঃ ॥

বিদ্যা যেরূপ যত্ন সহকারে অনুশীলন দ্বারা লাভ হয় সেইরূপ বন্য ফল-মূল আহারী হইয়া সর্ব্বদা এই নন্দিনীকে শুশ্রূষা দ্বারা প্রসন্ন করিতে যোগ্য হও। সে গমন করিলে তুমিও গমন করিবে, সে বিশ্রাম করিলে তুমিও বিশ্রাম করিবে, সে উপবেশন করিলে তুমি উপবেশন করিবে এবং সে জলপান করিলে তুমিও জলপান করিবে।

বাস্তবিক মহারাজাকে গোরক্ষক পদে কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মহারাজের তাহাতে তপোবনে বাস এবং তপোবন-লব্ধ সামান্য দ্রব্যাদি আহার করিতে হইল। নন্দিনীর সমভিব্যাহারে মাঠে মাঠে ভ্রমণ করায় শারীরিক পরিশ্রম হইতে লাগিল। তপোবনের ও মাঠের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে শারীরিক পরিশ্রমে ও পরিমিত আহারাদির দ্বারায় বিশেষ বলিষ্ঠ ও সুস্থ

হইবেন তাহার সন্দেহ কি? রাজ্ঞীরও স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত মহর্ষি বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

বধূর্ভক্তিমতী চৈনাম্ অর্চিতামা তপোবনাৎ।
প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি॥

অর্থাৎ :—বধূ (রাজ্ঞী) ভক্তিসহকারে বিশুদ্ধ শরীরে নন্দিনীকে অর্চ্চনা করিয়া তপোবনের প্রান্তর অবধি তাহার অনুগমন করিবেন এবং সন্ধ্যার সময় ঐ নন্দিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ততদূর গমন করিবেন। সুকোমলা সুদক্ষিণার পক্ষে ঐরূপ পরিশ্রম যথেষ্ট বলিতে হইবে। মহারাজাকে যে রূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, মহর্ষি রাজ্ঞীকে ততদূর কষ্ট করিতে বলেন নাই; বলিলেও যুক্তি সিদ্ধ হইত না, বরং উপকার না হইয়া অনুপকার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। ফলতঃ এই রূপে মহারাজের ও মহারাণীর শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অভিলাষও সফল হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার আরবথনটের একটী চিকিৎসার উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে। আরবথনটের চিকিৎসা বিষয়ে অতীব যশঃ ছিল। সম্পত্তিশালী জনৈক উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তি কয়েক বর্ষাবধি নানাবিধ পীড়ায় অশেষ কষ্ট পাইয়া এবং রাশি রাশি ঔষধ সেবনে কোন ফল প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়েন। ডাক্তার মহোদয় উক্ত ব্যক্তির পীড়ার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোগীর আরোগ্যলাভার্থ একটী কৌতুকজনক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা উক্ত রোগী সমভিব্যাহারে আরবথনট শকটারোহণে কোন দূরবর্ত্তী প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন

কালে রোগীর অগোচরে স্বীয় শিরস্ত্রাণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রোগী শকট হইতে অবতরণ করিবা মাত্র সুপণ্ডিত ডাক্তার শকট চালাইয়া দিলেন। এমত স্থলে পীড়িত ব্যক্তি পদব্রজে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বিবিধ কৌশল ক্রমে রোগীকে প্রত্যহ শারীরিক পরিশ্রম করাইতে লাগিলেন এবং রোগীও স্বল্পদিনের মধ্যে সম্যক্ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গবাসীদের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমে অশ্রদ্ধা ও বিরাগ প্রায় অন্য কোন জাতির নাই। তন্নিবন্ধন বঙ্গীয় যুবাগণের অধুনা অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ ও সুস্থ শরীর কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক মাসে প্রায় সকলকেই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ডাক্তার মহাশয়কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যদি প্রকৃতি দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন এবং রাশি রাশি ঔষধ সেবন না করিয়া প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে দুই তিন ঘটিকা উপযুক্ত ব্যায়াম, নগর ও গ্রামের প্রান্তরে পরিভ্রমণ এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের এবং সুতরাং দেশেরও মঙ্গল হয়। অধিকন্তু আমাদের মধ্যে ইহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় যে এক দিনের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও যদি কাহারও পুত্র না হয় তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিতান্ত মনোদুঃখে দিনাতিপাত করেন। কেহ তারকেশ্বরে হত্যা দেন, কেহ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ঔষধ ধারণ করেন, কেহ বা যুগল কার্ত্তিক পূজা করেন। ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া কবি-কুল-ভূষণ কালিদাসের প্রদর্শিত পথে গমন করিলে অনেকেরই মনোরথ সম্পূর্ণ হইবার নিতান্ত সম্ভবনা।

আঁধার।

১

তরু লতা ফুলমুঞ্জ, কোকিল কুজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার,
রবি, শশি, তারাহার, হাসিমুখ ললনার,
কেবল তোমারে ভালবাসি হে আঁধার!
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন,
না হাস, না কাঁদ, নহ কালের অধীন।

২

তোমায় জানেনা নরে, তাইত তোমারে ডরে,
অসময় তুমি সখা কেহ নাই আর,
একক বান্ধব হীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
জ্বলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।

৩

শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে,
ঘুমায় জাগেনা আর দেখেনা স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার সাগর রোল করেনা শ্রবণ ;
কা'র অধিকার নাই তব অঙ্কোপরে,
ঘৃণা হিংসা উপহাস স্পর্শ নাহি করে।

৪

গৃহমাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে একদিন,

তুমি তমঃ নিরুপম, শান্ত ভীম পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন ;
ব্যাপিয়ে অসীম স্থান তব আয়তন,
অদ্যাবধি নাহি যথা কালের গঠন।

৫

পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিয়োগ নিত্য ছেলে খেলা প্রায়,
একত্রে যখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায় কোথায় মিশায়,
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিপরীত দেখে কিন্তু পলকে পলকে।

৬

পাইয়ে নশ্বর দৃষ্টি, হেরে সৃষ্টি, করে সৃষ্টি
আলোক, যথায় তব নাহিক গমন,
একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে,
ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন ;
তোমার উদরে থেকে তোমায় ডরায়,
শিহরিয়ে উঠে হেরি আপন ছায়ায়।

৭

আমি না বুঝিতে পারি, সৃজে কত নর নারী,
তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
দুঃখ সুখ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে,
নাহি সুখ যত দিন সুখের বাসনা ;
উন্মাদ সতত সাধ যেন না ঘুমায়,
বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায়।

শ্রীগিঃ।

শব্দশাস্ত্র।

—০:০—

শ্রীহৃষীকেশ ব্যাকরণ-সরস্বতী প্রণীত।

শব্দশাস্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলা উচিত শব্দ কি? সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে—শব্দ কি? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর প্রদান পূর্ব্বক অন্যান্য বিষয় বিবৃত করিব। আর্য্যগণের শাস্ত্র-সমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে শব্দ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতান্যতম আকাশের বিশেষ গুণ। কি বেদ, কি দর্শন, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কোন শাস্ত্রেই এ বিষয়ের মতদ্বৈবিধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আমরাও সেই জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন আর্য্যগণের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিলাম। হয়ত ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায় আমাদিগকে প্রাচীন সিদ্ধান্তের অনুমোদনে পক্ষপাতদোষে দূষিত দেখিয়া বাতুল, উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ অশিষ্টজনোচিত বাঙ্ময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিবেন। "আকাশ কি কোন একটী বস্তু, যে তাহার আবার গুণ থাকিবে? যাহা কিছুই নয় তাহাই আকাশ। তবে এই মতের পোষকতা করা স্বকীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র"। আমরাও বলিতেছি যে "যাহা কিছুই নয় তাহাই আকাশ" এবং ইহা প্রাচীন আর্য্যগণের অনুমোদিত: যথা—"নিরাবণোহি আকাশঃ"। তথাপি তাঁহারা আকাশকে শব্দের অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহাতে কি কোন সত্য নাই? বেদাদি শাস্ত্রনিকর যাঁহাদের অলোক-সামান্য মস্তিষ্কশালিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, যাঁহারা ভীষণ তরঙ্গমালা পরিক্ষোভিত অনন্তকালের অনন্তব্যবধানে থাকিয়াও

বাঙ্মাত্র বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দুস্তর বারিধি-বিভক্ত পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিভ্রমণ করিয়া ইদানীন্তন সুসভ্য দেশ সমূহে আপনাদের অখণ্ডনীয় মত ও গভীর-তর্কাবগাহিনী যুক্তি সমুদয় প্রচার দ্বারা অদ্যাপি অক্ষয় ও নির্ম্মল যশের সঞ্চয় করিতেছেন, অদ্যতন সুসভ্যজগতও যাঁহাদের প্রণীত দুই চারিটী শ্লোক বা গদ্য প্রবন্ধ কোনক্রমে কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে আপনাকে একজন দূরদর্শী ও প্রতিভাশালী পণ্ডিত মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারা কি এমনই অসার ছিলেন যে আমরা শ্বেতদ্বীপের দুই চারিটী মাত্র অক্ষর চর্ব্বণ করিয়া অনায়াসে যাহা বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহারা অলোকসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও সেইস্থলে স্খলিতপদ হইয়াছেন? অন্ততঃ একবারও কি এ বিষয়ের সত্যাসত্য অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত নহে? প্রতি-পক্ষেরা যাহাই বলুন আমরা তাঁহাদের মত অবিবেচ্যকারিতায় সম্মত নহি। কতদূর কৃতকার্য্য হই বলিতে পারি না, শব্দ আকা-শের গুণ কি না, তাহার বিচার করিব।

ইদানীন্তন পণ্ডিতগণের মতে পরমাণুর পরস্পর ঘর্ষণে শব্দের উৎপত্তি ও তদভাবে তাহার নিবৃত্তি হয় এবং তৎপ্রতিঘাতে পার্শ্বস্থ বায়ু বিচলিত হইয়া শ্রোতার কর্ণবিবর পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক তত্রত্য চর্ম্মখণ্ডবিশেষে প্রতিহত হইলে তাঁহার শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীন শাব্দিকগণও এই মত অবগত ছিলেন: যথা—"মহা-ভূতসংক্ষোভজঃ শব্দোঽনাশ্রিত উৎপত্তিধর্ম্মকোনিরোধধর্ম্মক ইতি" বাৎসায়নভাষ্যে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমাহাভূতের সংক্ষোভে শব্দের উৎপত্তি হয়; সুতরাং শব্দ উৎপত্তিবিনাশশালী এবং ইহা দ্রব্য বিশেষের আশ্রিত নহে।

পুনশ্চ

"————শ্রোত্রোৎপন্নস্তুগৃহ্যতে।
বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা॥"

ভাষাপরিচ্ছেদ।

যে শব্দ শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত গমন করে তাহাই গৃহীত হয়। যেমন স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তদুৎপন্ন তরঙ্গমালা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, শব্দের গতিও ঠিক এই প্রকার। অতএব আধুনিক মতও প্রাচীন পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন; তথাপি তাঁহারা শব্দকে আকাশের বিশেষ গুণ কহিয়াছেন।

পাঠকগণ কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে এ বিষয়ের অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আকাশ ব্যতিরেকে শব্দের উৎপত্তিই হইতে পারে না; অর্থাৎ যদি বস্তুমাত্রের অবকাশ না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের পরমাণু সকল কোন ক্রমেই কম্পিত হইতে পারিত না: অতএব শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে আকাশ একটী প্রধান কারণ। কি পার্থিব, কি জলীয়, সকল প্রকার পরমাণুর সংক্ষোভেই শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বত্রই একমাত্র আকাশের বিশেষ উপযোগিতা আছে: অতএব শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ এবং পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের সাধারণ গুণ। যথা—"তত্রাকাশস্য শব্দোগুণো, বায়োস্তু শব্দস্পর্শৌ, তেজস্তু শব্দস্পর্শরূপাণি, অপান্তু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, পৃথিব্যাস্তু শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ"। বেদান্ত পরিভাষা। অর্থাৎ আকাশের গুণ—শব্দ; বায়ুর—শব্দ, স্পর্শ; তেজের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পৃথিবীর—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ভাষা পরিচ্ছেদে শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—"আকাশস্যতু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দোবৈশেষিকোগুণঃ"। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রকার বেদান্তের অনুসরণ করেন নাই।

যথা—"গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং স্পর্শ পর্য্যন্তা পৃথিব্যাঃ অপ্‌তেজো বায়ুনাং পূর্ব্ব পূর্ব্বমপোহ্যাকাশস্যোত্তরঃ। ৩ অং, ১ আং, ৬৪ সূং"। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী গুণের মধ্যে গন্ধাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত চারিটী গুণ পৃথিবীর ; রস, রূপ, ও স্পর্শ—জলের ; রূপ ও স্পর্শ—তেজের ; স্পর্শ বায়ুর এবং শব্দ আকাশের গুণ। ইদানীন্তন পণ্ডিতগণের ন্যায় পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা বস্তুমাত্রের সছিদ্রতার বিষয় অবগত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারা আকাশকে সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী বলিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণেরও তত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। অতএব তাঁহাদের মতে স্থূল দৃষ্টিতে যে শব্দকে পাঞ্চভৌতিক গুণ বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহা অসম্ভাবিত নহে।

এই শব্দ সামান্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত : যথা—চেতন পদার্থ জন্য ও অচেতন পদার্থ জন্য। ইহাদের মধ্যে মেঘ গর্জ্জন প্রভৃতি অচেতন পদার্থ সম্ভূত শব্দ, প্রথমোক্তের (অর্থাৎ মনুষ্যাদি চেতন পদার্থের) বুদ্ধি জন্য শেষোক্তের উদাহরণ। এই চেতন পদার্থ জন্য শব্দ আবার নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক ভেদে দুই প্রকার : প্রাণিগণের হর্ষ শোকাদি প্রকাশক হাস্য রোদন প্রভৃতি নিসর্গসম্ভূত শব্দ নৈসর্গিক এবং মনুষ্য-বুদ্ধি-কল্পিত শব্দ অনৈসর্গিক। এই অনৈসর্গিক শব্দ গীতি, বাদ্য ও বর্ণ ভেদে ত্রিবিধ। মল্লার মালবাদি রাগ প্রকাশক ষড়জাদি গীতিসাধন গীতিশব্দ। এই গীতি শব্দের সংখ্যা সাতটী যথা—সা রি গ মা পা ধা নি। অনেকে অনুমান করেন যে বৈদিক উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর হইতে উক্ত সপ্তবিধ স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অনেকাংশে সঙ্গতও বোধ হয়। তবে এই সমস্ত বিষয় এ প্রস্তাবের বিবেচ্য নহে, সুতরাং মৌনাবলম্বন করিলাম। গীতি-

মাত্রাপ্রমাপক মৃদঙ্গাগ্যভিঘাতজন্য চৌতাল কওয়ালী খট্ প্রভৃতি পদবাচ্য বাদ্যশব্দ। কথিত আছে, গীতি ও বাদ্য এই উভয়বিধ শব্দ দেবর্ষি নারদপ্রণীত নাদপুরাণে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত পুরাণ এ পর্য্যন্ত আমাদের নেত্রপথের বিষয়ীভূত হয় নাই। বোধ হয় নানা প্রকার অত্যাচারে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানজ ক চ প্রভৃতি বর্ণ প্রকাশক বর্ণ শব্দ। এই বর্ণ শব্দ সার্থক ও নিরর্থক ভেদে দুই প্রকার: যাহা হইতে কোন প্রকার অর্থের প্রতীতি হয় তাহা সার্থক ও তদিতর নিরর্থক শব্দ। মহাভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি "গো" শব্দকে অবলম্বন পূর্ব্বক সার্থক শব্দ কাহাকে বলে তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উক্তভাষ্যকার বলেন যে লোকে একমাত্র ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়াই স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করে: সেই হেতু ধ্বনিই শব্দ (১)। কিন্তু ভাষা-পরিচ্ছেদ প্রণেতা বিশ্বনাথ যাবতীয় শব্দকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগের নাম ধ্বনি ও দ্বিতীয় ভাগের নাম বর্ণ রাখিয়াছেন। ইঁহার মতে মৃদঙ্গাদি সম্ভব বর্ণানভিব্যঞ্জক নিরর্থক শব্দই ধ্বনি (২)। সুতরাং

---

(১) অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ। কিং যৎ তৎ সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণ্যর্থরূপং স শব্দঃ? নেত্যাহ, দ্রব্যং নাম তৎ। যত্তর্হি তদিঙ্গিতং চেষ্টিতং নিমিষিতমিতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, ক্রিয়া নাম সা।

যৎ তর্হি তচ্ছুক্লো নীলঃ কপিলঃ কপোত ইতি স শব্দঃ? নেত্যাহ, গুণোনাম সঃ। যৎ তর্হি তদ্ভিন্নেষ্বভিন্নং ছিন্নেষ্বছিন্নং সামান্যভুতং স শব্দঃ? নেত্যাহ, আকৃতির্নাম সা। কস্তর্হি শব্দঃ? যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনঃ সংপ্রত্যয়োভবতি স শব্দঃ। অথবা প্রতীতপাদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। তদ্যথা শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীঃ, শব্দকার্য্যয়ং মাণবক ইতি। শব্দং কুর্ব্বন্নেবমুচ্যতে, তস্মাদ্ধ্বনিঃ শব্দঃ।

ইতি মহাভাষ্যে। ১ম অং। ১ম আং। ১ম সূত্র।

(২) শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবোধ্বনিঃ।
কণ্ঠ সংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়োমতাঃ॥

ইতি ভাষা পরিচ্ছেদে।

মহর্ষি রাসতের সহিত বিশ্বনাথের মতের সামঞ্জস্য নাই। সুপ্রসিদ্ধ শারীরিক ভাষ্যানুসারে দূরস্থ শ্রোতা বর্ণ বিশেষানধিগত হইয়া যে শব্দ দ্বারা তাহার তারত্বাদি অনুভব করিতে পারেন তাহাই ধ্বনি (৩)। অতএব এই ধ্বনিকে বর্ণ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু তারত্ব মন্দত্ব সকল শব্দেরই আছে। কিন্তু লোকে সামান্যতঃ শব্দ মাত্রকেই ধ্বনি বলে ও শাব্দিকচূড়ামণি মহাভাষ্যকারও এই মতের পক্ষপাতী : অতএব আমরাও ইহারই অনুসরণ করিলাম। অন্যান্য মত পারিভাষিক বলিয়া উপেক্ষিত হইল।

ক্রমশঃ

নরনারী।

—:—

সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টির ভূষণ—নরনারী। জাগতিক কার্য্য-শৃঙ্খলার অভিন্ন-বন্ধন—মানবজীবন-তন্ত্রের সংস্থিতি-কারণ—চিন্তাশীল জনের চিন্তার এমন উপাদেয় ও ভোগ্য সামগ্রী আর কি আছে?

শত শত যুগ অতীত হইল যখন মানববংশের আদি জনয়িতৃ-দ্বয়, এই বিশ্বসংসারে স্থাপিত হইলেন—অঙ্গে আবরণ নাই, অন্তরে লজ্জা নাই, হৃদয়ে চাতুরী নাই;—শরীর উলঙ্গ, অন্তর উন্মুক্ত, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী, নানাবিধ জীব

(৩) ধ্বনির্নাম যো দুরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিশেষমনধিগচ্ছতঃ কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ তারত্বাদি বিশেষমবগময়তি।

ইতি শারীরিক ভাষ্যে।

ক্রোড়ে লইয়া পালন করিতেছে—নানাবিধ তরুলতার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছে; স্তম্ভিত মনে দেখিতে লাগিলেন, জগৎরাজ্যের রাজারাণী, ভাববিতাড়িত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন। সে মনের স্তম্ভ, সে হৃদয়ের বিতাড়ন কে বর্ণিবে? বর্ণ সে বর্ণনায় হারিমানে। তখন সে হৃদয়ের তরঙ্গ মন্দাকিনীর প্রবাহতাড়িত, তখন সে মনের গাম্ভীর্য্য সুমেরুর বিশালবপুঃ-বিভাসিত, তাহার তুলনা স্বর্গরাজ্যে সম্ভবে, মর্ত্ত্যভূমে তাহার তুলনা মিলেনা।

পুঞ্জে পুঞ্জে পরমাণু ন্যস্ত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি হইল—পবন বহিল, আলোক উদিল, শূন্য বিস্তারিল, বারি নিঃসরিল, ক্ষিতি জন্মিল, উদ্ভিদ্ সঞ্চারিল, প্রাণিমণ্ডলী পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ভূমি অধিকারিল, শেষ আসিল নরনারী। এই জগতের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহার শ্রেষ্ঠ উপাদান সেই নরনারীতে আছে, তদ্ভিন্ন আর যাহা তাহা তাহাদেরই আছে, তাহার উপাদান সজীবভাবে অন্য কোন পদার্থে নাই—বিশ্ব পূর্ণ হইল। নর সৃজিলে বিশ্ব পূর্ণ হইত না, নারী সৃজিলে বিশ্ব পূর্ণ হইত না—বিশ্বের পূর্ণতা নরনারী।

স্রষ্টার প্রসাদ-চিহ্নিত অদ্ভুত অধিকারে অধিকারী হইয়া বিশ্বসংসার মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, জনক জননী, অমিয়ময়-ভাবলহরে অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিলেন; এই জগতের বৈচিত্র, এই জগতের সারবত্তা, চিন্তা করিতে লাগিলেন; অন্বেষণেচ্ছা বলবতী হইল, জ্ঞান-সহচর সঙ্গে সঙ্গে আসিল, জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে আসিল—বিশ্বাস। সেই অনুসন্ধিৎসা, সেই জ্ঞান প্রয়াস—কত কোটী বর্ষ অতীত হইল কে জানে—অদ্যিও নরনারীর মনে উদ্রিক্ত। এই জগৎ সেইরূপ বৈচিত্রময়, সেইরূপ সারবান্; যতকাল এই জগৎ রহিবে, যতকাল নরনারী রহিবে, ততকাল

জগৎদর্শনের সহিত মনের প্রসক্তি রহিবে; কিন্তু সেই প্রসক্তি প্রগাঢ় ও পবিত্র যাহার হইল সেই ইহার যথার্থ প্রেমিক হইল।

মানববংশের আদি পিতামাতা, সেই অপরূপ প্রেমে প্রেমিক। তাঁহাদিগের মনের সহিত প্রকৃতির যে পূত অনুরাগ, যে মধুর মিলন, যে চিরন্তন উদ্বাহ, তাহা তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হইলে অবনী কি প্রেমময়, কি সুখময় হইত! কল্পনা যখন নিজ বিমল কিরণে অন্তর আলোকিত করে, হৃদয়ে ত্রিদিব-কুসুম বিকশিত সুস্নিগ্ধ মলয় মারুতে প্রাণ বিভোর করিয়া তুলে, তখন বুঝা যায় সেই প্রেমের ঢুলু ঢুলু মাদকতা ও ঢলঢল মাধুরী। অব্যক্ত, ঘুমন্ত-স্বপন-সদৃশ সেই প্রেম, শব্দে তাহার অপূর্ব্ব তান উঠেনা; কিযেন-কিযেন স্বর আধঘুমো-ঘুমোভাবে আত্মার আত্মায় উঠিয়া বিলীন হইয়া যায়।

সেই ভাবোন্মেষবিহ্বল, মনোমাদক প্রেম ব্রহ্মাণ্ডের এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে; গ্রহ, উপগ্রহ, সেই প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে। পাশবী চিন্তাকে যদি মুহূর্ত্ততরে অন্তর হইতে অপসারিত কর, তখন সেই প্রেমের অমল মহিমাছটায় জগত উদ্ভাসিত দেখিবে। সূক্ষ্ম তৃণমূল, সূক্ষ্মতর বালুকণা, সূক্ষ্মতম কীটাণু, সেই হৈম আভায় আভাময় দেখিবে।

কর্ম্মক্ষেত্রে যখন মনের সহিত মনের সঙ্ঘর্ষণ হইবে, যখন হৃদয় হৃদয়ের উন্মূলনে দ্বন্দ্ব করিবে, যখন শারীর চেষ্টা বলবতী হইবে, তখন এই দেবভাবে পূর্ণ হইয়া সেই সঙ্ঘর্ষণ, সেই দ্বন্দ্ব, সেই চেষ্টার অপনোদন করিবে। সৃষ্টির সার, তোমরা নরনারী, চিন্তা তোমাদিগের সহচরী; বিশ্বপাতার মানসকমলজাতা, দিগন্ত-সম্প্রসারিণী, অমৃতময়ী সেই চিন্তারে ভুলিও না। অবস্থার তারতম্যে আত্মার স্তরে স্তরে রঞ্জিত ধরাব্যাপী অনুরাগ তুচ্ছ করিও না। চিন্তার সহবাস ত্যাগ করিয়া

এই অনুরাগ-সঞ্চয়ে অযত্ন করিলে অতুল বিভব হারাইবে। যে বিভবে বিভূত হইলে অনুক্ষণ হৃদয়ের প্রতি তন্ত্র হইতে পীযূষ-ময় স্বরলহরী উদ্গীরিত হয়, অন্তরের প্রতি উৎস হইতে রজত-ধারা নিঃসৃত হইয়া মরুময় বৃত্তি নিচয়কে উর্ব্বর করে, শরীরের প্রতি যন্ত্র কুশলচালনে চালিত হয়, সেই অতুল বিভব হারাইবে। কোন্ যুক্তির সহায়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন অতিপাত করিয়া আপনাদিগকে সার্থকজন্মা ও কৃতকর্ম্মা ভাবিতেছ? কেন নরনারী ধীরে ধীরে অনুরাগরঞ্জন পৈশাচী-ক্রিয়াকলাপে বিকৃত ও বিবর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছ? কেন সংসার-পণ্য-বীথিকায় অমূল্য হৃদয়-সম্পত্তির বিনিময় করিতেছ? কেন কুকৃতি-ঝটিকায় অন্তরের পাবনালোক নির্ব্বাপিত করিতেছ? কেন ইন্দ্রিয়-প্রণোদিত বিষয়-বাসনায় আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্কোচ করিতেছ? নিঃস্বার্থ-কামনায় সত্যের বিহিত বর্ত্ম অনুসরণ কর, অনুসন্ধিৎসা বলবতী কর, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে, বিশ্ব-প্রেমিক বিশ্বাস চিত্ত অধি-কার করিবে।

শোভাময়ী প্রকৃতি নানাসাজে সাজিছে—অনুরূপ সজ্জার উপকরণ-সংগ্রহে মন নিয়োজিত কর। জগদীশ যে বিপুল-বৈভব-লাভে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যাহার যত্ন নাই, সে জগতের সার-বঞ্চিত। অকৃত্রিম প্রাণসন্ধিগত সৌন্দর্য্যলালসা বর্দ্ধন কর, মনের সহিত এই জগতের প্রেম বদ্ধমূল কর, নিজ নিজ আত্মার সহিত পরস্পর মিলিত হও, বুঝিবে তোমরা নরনারী কি অমূল্য ধনে অধিকারী।

এই জগতের সহিত মনের শুভ পরিণয়, এই নরাত্মার সহিত নারীর আত্মার পবিত্র সম্মিলন যতদিন না হইবে,—স্রষ্টার প্রহিত-মার্গ ততদিন অনুসৃত হইবে না—তাঁহার অচিন্তনীয় ভাব-পর্য্যবেক্ষণে

প্রীতিকুসুমে তাঁহার বিশ্বজনীন পূজা হইবে না—হায়! সে দিন কবে অসিবে ?

যে দিন নরনারী আপনাদিগের আত্মার পরিচয়ে ও সম্ভাষণে আনন্দ অনুভব করিবে ; যে দিন আপনাদিগের প্রত্যেক আত্মাকে এই জগতের কার্য্য-পরম্পরার অনন্য সহায় জ্ঞান করিয়া একপ্রাণে একচিন্তনে দিন-যাপন করিবে ; যে দিন স্ব স্ব কর্ত্তব্যবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর প্রীতি অনুভব করিতে শিখিবে ; যেদিন মানব-তন্ত্রের কূট-সমস্যা মীমাংসিত হইয়া সকল হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করিবে ; যেদিন বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামর্থ্য ও কোমলতার একত্র সহযোগে ইহ জগতে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব কল্পনা-বিনোদন স্বর্গীয় ভাবের পরিস্ফুটন হইবে ; যে দিন শারীরবল আত্মবলের নিকট সতত আজ্ঞাবহ রহিবে ; যে দিন ইন্দ্রিয়-ভোগ আত্ম-প্রসাদের অধীন হইবে, সে দিন——বিশ্বের সে সুখ দিন কবে আসিবে ? যে নর ও নারী তাঁহাদিগের পরস্পর-সাপেক্ষতা হৃদ্গত করিয়া জগতের প্রতিবিধানে বিধাতার যে মাননীয় আদেশ তাহার মর্ম্ম অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করেন এবং সেই আদেশের অনুবর্ত্তন করেন, জীবনের প্রতি কার্য্য কন্দুককৌতুক তুল্য না ভাবিয়া তাহার ভাবি-প্রসব ফলের চিন্তা করেন এবং তাহা বিস্তৃত কর্ম্মজালের একটী গ্রন্থি বলিয়া অনুমান করেন, পার্থিব বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অন্তর্নিহিত আত্ম-জ্ঞানের সম্মাননা করেন, পাপ-কলুষ ধর্ম্মের বিমলতায় ক্ষালন করেন, তাঁহারা ধন্য! তাঁহাদিগকে আমরা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অভি-বাদন করি। তাঁহাদিগকে ভাবিয়াই বলিয়াছি সৃষ্টির অপূর্ব্ব ভূষণ—নরনারী এবং তাঁহাদিগের মহত্ত্ব অনুধ্যান করিলে হৃদয় আপনি বলিয়া উঠে—চিন্তাশীল জনের চিন্তার এমন উপাদেয় ও ভোগ্য সামগ্রী আর কি আছে? স্রষ্টা আদৌ নরনারীর

মন ও হৃদয় যে বিমল ভূষায় ভূষিত করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ-পথে উদিত হইয়া আত্মোত্থিতা দৈববাণী হয়—বিশ্বের পূর্ণতা নরনারী।

শ্রীলঃ

আয়ুর্বেদ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকেরই কি ঐতিহাসিক কি শাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বকালে সকল দেশে সমাজের লোকের বাসনা-নুরূপ গ্রন্থাবলি প্রচারিত হইয়া থাকে। এদেশেও বাবু রামদাস সেন মহাশয় ঐতিহাসিক-রহস্য নামে পুস্তক খণ্ডশঃ প্রচার করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শাস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার দ্বারা তদ্বিষয়ক সত্য-নিষ্কা-শনে, এবং বাবু রজনীকান্ত সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহাশয় পাণিনি প্রভৃতি জীবন চরিত লিখিয়া তদ্বিষয়ক তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। এইরূপ পুস্তক বা প্রবন্ধের প্রচার আমরা যতই দেখিতে পাইব, ততই আমাদের আনন্দ ও গৌরবের বৃদ্ধি, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের কিরূপে সৃষ্টি হইল, আর্য্যগণ এ বিষয়ে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, কোথায় যাইয়াই বা সেই উন্নতির পর্য্যবসান হইল, এবং সেই উন্নত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে কিরূপ বোধ হয়—সেই সকলের

বিবরণ সংকলনে অদ্যাপি কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, অতএব আমরা এবিষয়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা পাঠক বর্গকে ক্রমশঃ প্রবন্ধাকারে উপহার প্রদান করিতে আরম্ভ করিলাম।

জীব মাত্রেরই কোন প্রকার দুঃখ অথবা অভাব উপস্থিত হইলে তন্নিবারণের প্রবৃত্তি স্বতঃই অন্তঃকরণে উদিত হয়। এই স্বাভাবিক বৃত্তি যাবতীয় লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আদি প্রসূতি। রোগও এক প্রকার দুঃখ; সেই দুঃখ দুর করিবার চেষ্টা যে সময় হইতে মানব-হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, সেই সময়েই আয়ুর্ব্বেদের বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। তৎপরে জ্ঞানের বৃদ্ধি ও সভ্যতা-সহকারে তাহার অঙ্কুর কালক্রমে শাখা-পল্লবাদি-সম্পন্ন হইয়া প্রকৃত বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কোন্ সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের হৃদয়ে এই বীজের সঞ্চার হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সন অব্দাদি নির্দ্ধারণ করিয়া ঘটনাবলি লিখিত হইতেছে। অতি পূর্ব্বকালে তদ্রূপ কোন প্রথা প্রচলিত ছিল না, এই জন্য কতদিনে কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা কোন্ পুস্তক কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছে তাহার ঠিক্ সময়-নির্ণয় করা যায় না। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের অভাবই এই দুর্নিমিত্তের কারণ।

সুতরাং এইক্ষণে অতি প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলন করিতে হইলে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে হয়। অনুমান এবং অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। তজ্জন্য পদে পদে ভ্রমও ঘটিতে পারে। ভ্রম প্রমাদ সামান্য মনুষ্যগণের স্বভাব-সিদ্ধ, বিশেষতঃ যাহাদের কোন বিষয়ে প্রথম উদ্যম, তাহাদের ভ্রমাদি হওয়ারই সম্ভব। অতএব যখন যাঁহার বিবেচনায় যে ভ্রম লক্ষিত হইবে জানাইলে পরম উপকৃত হইব।

যে সময়ে বেদের বহুল প্রচার ছিল, লোকেও বেদ-প্রতিপাদ্য-মতের অনুসারে চলিতেন এবং তদুপদেশ মত ক্রিয়া কলাপাদি সম্পাদন করিতেন তাহাকে বৈদিক সময়, এই রূপে পৌরাণিক সময়, তান্ত্রিক সময় ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রমে একরূপ সময় নিরূপণ করা যায়। এই রূপ সময়ের মধ্যে বৈদিক সময় অতি প্রাচীন। বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর আছে কি না সন্দেহ স্থল। বেদ কত কালের তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? সেই বেদের সমকালেই আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হয়। এই বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। * হিন্দুরা বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন অর্থাৎ বেদ কোন ব্যক্তির প্রণীত নহে এবং জগতের প্রলয় হইলেও ইহার বিলয় ঘটিবে না। "যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিবেন না তাঁহারা অধার্ম্মিক।" এই বিষয় লইয়া নাস্তিক ও আস্তিক উভয়-বিধ-গ্রন্থেই বিস্তর বাদানুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বিচার এই স্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক, তবে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে কিরূপে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করা আমাদের প্রতিজ্ঞার নিতান্ত বহির্ভূত নহে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিস্তৃত বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করিলামনা, স্থানান্তরে লিখিবার মানস রহিল।

আর্য্যগণ যে কেবল মনুষ্যের জন্য আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহারা বৃক্ষ ও হস্ত্যশ্বগবাদি প্রাণি-সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ সকল জন-সাধারণের উপযোগী করিবার জন্য কালক্রমে

* (প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার্ উইলিয়ম জোন্স অনুমান করিয়াছেন, যে খৃষ্টের জন্মের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে বেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।)

পুরাণে ইতিহাস-রূপে, স্মৃতিতে শাসনচ্ছলে, এবং তন্ত্রে শিববাক্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গারুড় পুরাণের অনেক স্থল আয়ুর্ব্বেদ বিহিত উপদেশে পরিপূর্ণ, এবং কালিকা পুরাণের স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদের এক একটী বিষয় এরূপে লিখিত আছে যে তাহা পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইতে হয়। বস্তুতঃ গল্পচ্ছলে উপদেশ বিশেষ ফলোপধায়ক।

আয়ুর্ব্বেদে রাজযক্ষ্মা-রোগের বিষয়ে যেরূপ উপদেশ আছে তাহা পাঠ করিয়া লোকে যত সাবধান না হউন নিম্ন-লিখিত পৌরাণিক গল্প শ্রবণ করিলে আন্তরিক ভয়ের সহিত তদপেক্ষা অধিকতর সাবধানে নিয়ম পালনে সযত্ন হইবেন—গল্পটীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—একদা দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিন্যাদি ষড়্-বিংশতি কন্যা পিতার নিকট তাঁহাদিগের স্বামী চন্দ্রমার নামে এই বলিয়া অভি-যোগ করিলেন যে "হে পিতঃ আমাদের স্বামী আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া স্বপত্নী রোহিণীর প্রতি অত্যাসক্ত হইয়াছেন, অত-এব তিনি যাহাতে আমাদিগকে সমভাবে স্নেহ করেন এরূপ বিধান করুন"। তদনুসারে প্রজাপতি চন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সকল পত্নীকে সমভাবে ভাল বাসিতে অনুরোধ করিলেন। চন্দ্র স্বীকার করিয়াও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। পুনরায় চন্দ্রের নামে অভিযোগ হইল। প্রজাপতিও পুনরায় একের প্রতি অত্যা-সক্তি প্রকাশ-করণে নিষেধ করিলেন তাহাতেও চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি আসক্তির হ্রাস হইল না; এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভিযোগে প্রজাপতি রুষ্ট হইয়া "তোমার রাজযক্ষ্মা হউক" বলিয়া চন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন। প্রজাপতির শাপ অব্যর্থ। তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মা আবির্ভূত হইয়া চন্দ্রকে আক্রমণ করিল, চন্দ্রও ক্রমে ক্ষীণ-কলেবর হইতে লাগিলেন, চন্দ্রের হ্রাসে ক্রমে গিরি-জাত

ওষধি সকল লয়-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, সুতরাং দেবতাদের যজ্ঞা-ঙ্গীভূত ওষধির নাশে তাঁহাদের যজ্ঞ-কার্য্যের বিলোপ হইতে লাগিল, তাঁহারাও আহারাভাবে নিতান্ত কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে শাপ প্রতি-সংহার করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রজাপতিও স্বীকৃত হইলেন এবং যক্ষ্মাকে কহিলেন তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ কর, তখন যক্ষ্মা কহিলেন আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক্ষণে আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ব্রহ্মা রাজযক্ষ্মাকে বিপদ্-গ্রস্ত দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে,—

"সর্ব্বদা যো দিবারাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বনিতা-রতঃ।
সেবতে সুরতং তস্মিন্ রাজযক্ষ্মন্ বসিষ্যসি॥
প্রতিশ্যায়-শ্বাস-কাস-যুক্তো যো মৈথুনং চরেৎ।
স তে প্রবেশ্যঃ সততং রাজযক্ষ্মন্ ভবিষ্যতি॥
কৃষ্ণাখ্যা মৃত্যু-পুত্রী যা ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সা তেহস্তু ভার্য্যা সততং ভবন্তমনুযাস্যতি॥"

"হে রাজযক্ষ্মন্ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দিবারাত্রে এবং সন্ধ্যাকালে বনিতারত থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিতি করিবে, এবং যে ব্যক্তি প্রতিশ্যায়-শ্বাস-কাস-যুক্ত হইয়াও স্ত্রীসংসর্গ করিবে সেও তোমার প্রবেশ্য হইবে, এবং তোমার গুণ-সদৃশী কৃষ্ণানাম্নী যমতনয়া তোমার অনুরূপ ভার্য্যা হইবে।"

তৎপরে লিখিত আছে যে ব্যক্তি অবহিত হইয়া এই গল্প প্রত্যহ পাঠ করিবে সে ব্যক্তির বংশেও কখন রাজযক্ষ্মা হইবেক না। দেখুন এই ব্রহ্ম-বাক্যের আদ্যন্ত অনুধাবন করিয়া পাঠ করিলে কোন্ হিন্দুর উক্ত বিধি-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে

বাসনা হয়? ব্রহ্মা আদি দেবতা ও ব্রহ্মাণ্ডপতি; তাঁহার বাক্য ব্যর্থ এইরূপ কল্পনা করিতেও হিন্দুদের মনে পাপের আশঙ্কা হয়; সুতরাং তিনি যক্ষ্মার প্রতি যেরূপ অনুমতি করিলেন, তাহা কদাচ বিফল হইবে না, অতএব যে ব্যক্তি অসাময়িক ইন্দ্রিয় সেবা করিবেক তাহার দেহে যক্ষ্মা নিশ্চয় প্রবেশ করিবে, * এবং দেহাশ্রিত যক্ষ্মাও যম-কন্যাকে নিশ্চয় বিবাহ করিবে সুতরাং যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ভৃত্যের ন্যায় যমালয়ে (যক্ষ্মার শ্বশুরালয়ে) যাইতে হইবে। এইরূপ শাসন কি অপূর্ব্ব ফলদায়ক। এই উপন্যাসে কত লোকের শিক্ষা হইত ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। জ্বরাদি-রোগ-সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার বহুল উপদেশ গল্পচ্ছলে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

আমাদের প্রস্তাবিত আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। ঐ অঙ্গ গুলির নাম যথা শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূত-বিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র এবং বাজীকরণ-তন্ত্র।

শল্যাঙ্গ—চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গ অধ্যয়ন করিলে যন্ত্র, অস্ত্র, ক্ষারাদির প্রয়োগ, ব্রণাদি-নিরূপণ, শরীর-বিদ্ধ-কণ্টকাদি উদ্ধরণ, ব্রণাদি হইতে পুয-নিষ্কাশন, প্রভৃতি বিষয় উত্তম-রূপে শিক্ষা করা যায়।

শালাক্য—চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অঙ্গে ঊর্দ্ধজত্রু-গত অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ মুখ নাসিকাশ্রিত ব্যাধি সমূহের উপশমের বিষয় বর্ণিত আছে।

* একজন বিজ্ঞ বৃদ্ধ চিকিৎসক বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে রাজযক্ষ্মা রোগ অধিক পরিমাণে লোককে আক্রমণ করিতেছে, পূর্ব্বে এই রোগের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। তিনি অনিয়মিত ইন্দ্রিয় সেবাকেই উহার সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু বলিয়া অনুমান করেন।

কায়-চিকিৎসা—চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অঙ্গে জ্বরাদি সার্ব্বাঙ্গিক রোগের উপশমের বিষয় শিক্ষা দেয়।

ভূতবিদ্যা—চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অঙ্গে ভৌতিক চিকিৎসা বর্ণিত আছে।

কৌমার-ভৃত্য—বালকের পোষণ, ধাত্রীর দুগ্ধের দোষ-সংশোধন এবং স্তন্য-দোষে উৎপন্ন ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা, যে অঙ্গের উদ্দেশ্য।

অগদতন্ত্র—যাহাতে সর্পাদির বিষের চিকিৎসা লিখিত আছে।

রসায়নতন্ত্র—চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অঙ্গে বয়ঃস্থাপন এবং আয়ুঃ, মেধা ও বল বৃদ্ধির উপায় বিবৃত আছে।

বাজীকরণ-তন্ত্র—যে অঙ্গে বিশুষ্ক ও ক্ষীণ শুক্রের আপ্যায়ন, প্রসাদন ও উপচয় নিমিত্ত ঔষধ, শুক্র-দোষ-সংস্করণ এবং রতি-শক্তি বর্দ্ধনের প্রক্রিয়া জানিতে পারা যায়। ক্রমশঃ

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহানুভব মহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত, যতদূর সাধ্য, বিশদ রূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রায় ১৩০৮ বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন, এই কালমধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি, অবনতি ও পরিবর্ত্তনের বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিব। তিনি কিরূপে তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত-ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কত বিঘ্ন বাধা যুদ্ধ বিগ্রহ অতিক্রম করিয়া আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, কিরূপ অসীম সাহস ঐকান্তিক যত্ন ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বংশধরগণ ইব্রো হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ

অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিলে, রক্তস্রোত চতুর্দ্দিকে খরধারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, কিরূপে মহাবল পরাক্রান্ত খস্রু নরপতির সুদৃঢ় সিংহাসন তাঁহাদের অসির একাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় সকল সবিস্তারে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা—আরবের আদিম বৃত্তান্ত।

জগৎপাতা পরমেশ্বরের কেমন এক আশ্চর্য্য নিয়ম যে মানব সমাজে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ যেমন নিস্তেজ হইয়া আইসে, অজ্ঞান-মলিনতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ইতর প্রবৃত্তি সকল যেমন ক্রমশঃ মানব-হৃদয় অধিকার করিতে আরম্ভ করে, নানারূপ অলীক উপধর্ম্ম অপধর্ম্ম সকল সৃজিত হইয়া স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য সমাজ মধ্যে যেমনই চতুর্দ্দিকে অনৈক্যের বহ্নি জ্বালিয়া দিতে আরম্ভ করে, অমনি কোন না কোন মহাত্মা ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সমাজকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পান। রোগসঙ্কুল দেহকে পুনরায় স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য যেমন একজন সুনিপুণ চিকিৎসকের প্রয়োজন, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অধোগামী সমাজকে প্রকৃতিস্থ ও উন্নত করিবার জন্য তেমনি একজন সুদক্ষ সংস্কারকের আবশ্যক। অভিনিবেশ পূর্ব্বক পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই মতের যথার্থতার বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। অদ্বৈতবাদী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, শিখগুরু ধার্ম্মিকপ্রবর নানক, রাজতনয় উদারচেতা শাক্যসিংহ, বিশুদ্ধাত্মা মহানুভব খৃষ্ট, সত্যপ্রিয়

মহাত্মা মার্টিন লুথর, বৈষ্ণবগুরু ঈশ্বরপ্রেমিক অমায়িক চৈতন্যদেব, বিবিধশাস্ত্রবিশারদ উন্নতহৃদয় রাজা রামমোহন প্রভৃতি অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ধর্ম্মসংস্কারকগণের জীবনী উচ্চৈঃস্বরে ইহার সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের জন্মগ্রহণও নিরর্থক হয় নাই। ইঁহার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে আরব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমুহ পৌত্তলিকতার দিগন্তব্যাপী ঘোর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল।

কথিত আছে, জলপ্লাবনের পর নোয়ার পুত্র শ্যামের সন্তান সন্ততিগণ আরবে আসিয়া বাস করেন। কালসহকারে তাঁহারা বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র আরব দেশ অধিকার করেন। ক্রমে তাঁহারা ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া উঠিল, স্বয়ং ঈশ্বর ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে আরব দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। আরবদেশে তাঁহাদের অবস্থিতির কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকাতে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণ ঐরূপ অনুমান করেন, তজ্জ্যনই তাঁহাদের বিষয় কোরাণে কিছুমাত্র বর্ণিত নাই। ইহা যে কতদূর সত্য তাহা নিরাকরণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আদিম অধিবাসী সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য সকল দেশেই বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। তবে কল্পনাপ্রিয় অসভ্য আরবদিগের মধ্যেও যে বিবিধ "আষাঢ়ে গল্প" প্রচলিত থাকিবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। উক্ত প্রবাদ বাক্য হইতে ইহাও জানা যায় যে শ্যামের বংশ আরব প্রদেশে বিধ্বস্ত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে "খাটান" ও "জকটান" নামক উক্ত বংশের আর দুইটী শাখা আরব অধিকার করিয়া তথায় আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই বংশে আরব নামে এক প্রভুত ক্ষমতাশালী নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইমানরাজ্য তাঁহারই কর্ত্তৃক

সংস্থাপিত হয়। তিনি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আধুনিক সমস্ত আরবদেশকে স্বনামে প্রসিদ্ধ করিয়া যান। এই বংশোদ্ভব জরহম নামক অপর এক নৃপতি হেভজাজ রাজ্য সংস্থাপন করেন। হেজার ও তদীয় পুত্র ইস্‌মেল্ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলে পর জরহমের অধিকার মধ্যে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। মেডাড নামক জুরাম বংশোদ্ভব এক নৃপতি এই সময়ে আরবদেশে রাজত্ব করিতেন। এই নূতন অভ্যাগত ইসমেল্ তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যার গর্ব্ভে ইসমেলের বারটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কালসহকারে ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ অসীম ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং জকটান বংশ সমূলে উন্মূলিত করিয়া সমগ্র আরবে আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করেন। বাইবেল গ্রন্থে ইস্‌মেল্ ও তাঁহার দ্বাদশ পুত্রের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। *

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরবগণ সেবিয় ও মেজিয় নামক দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক মাত্র ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক অনুরাগ ও পরলোকের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সেবিয়গণ ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া অগণ্য জ্যোতির্ম্ময় তারকা-রাজিকে তেজঃপুঞ্জ দেবতাগণের পবিত্র শরীর জ্ঞানে সানুরাগে তাহাদের পূজা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইত। মেজিয়গণ পারসিকদিগের ন্যায় অগ্নির উপাসনায় নিযুক্ত থাকিত। ঈশ্বর সূর্য্য ও অগ্নির

* And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! And God said, as for Ishmael, I have heard thee. Behpld I have blessed him and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly: *Twelve princes* shall he beget and I will make him a great Nation. (Genesis xvii 18. 20)

মধ্যে বাস করেন, ইহা তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, এবং অন্ধকারকে সয়তানের আবাসভূমি জানিয়া সর্ব্বান্তকরণে তাহাকে ঘৃণা করিত, এই জন্য অন্ধকার দূরীকরণার্থ দেবমন্দিরে দিবারজনী তাহারা অগ্নি জ্বালিয়া রাখিত। পরাজিত শত্রুগণকে ধৃত করিয়া এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন মধ্যে নিক্ষেপ করণানন্তর দগ্ধ করিয়া মারিত। অস্মদ্দেশীয় কাপালিকদিগের ন্যায় তাহারা এইরূপ লোমহর্ষণ নৃশংস কার্য্য করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইত না। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবিয়গণই সমধিক পরাক্রমশালী ছিল।

খৃষ্টান মিসনরিগণ আরব দেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। কিন্তু অসভ্য সেবিয় ও মেজিয়গণ ফুৎকার দিয়া তাঁহাদের সমস্ত উদ্যোগ উড়াইয়া দেয়। স্বয়ং পোল ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রচার-কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। যৎকালে আরবগণ এই রূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত, ধর্ম্মে আস্থা নাই, ঈশ্বরের প্রতিও তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, বিভিন্ন মতাবলম্বী, গৃহে গৃহে অনৈক্যের ভীষণ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত, পৌত্তলিকতা, অসভ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ঘরে ঘরে বিরাজিত, হত্যাকাণ্ডের ত কথাই নাই ইংলণ্ডীয় প্রাচীন ড্রুইদ্‌দিগের ন্যায় কথায় কথায় নরবলি, অজ্ঞান-প্রনোদিত কুসংস্কারের অভেদ্য গাঢ় তিমিরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্ম বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া অসভ্যদিগের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া দিতেছে, করিপদবিমর্দ্দিত পদ্মবনের ন্যায় আরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে, এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের সময় হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব হইল। কখন্ কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, কিরূপে তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া

ধর্ম্ম-প্রচারে বাহির হইলেন, অগণ্য শত্রুগণে পরিবৃত হইয়াও কেমন অল্পে অল্পে দেখিতে দেখিতে আপনার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীরিত করিতে লাগিলেন, কি রূপে তাঁহার এক কটাক্ষে কত ধনুর্ধর ক্ষমতাপন্ন নৃপতির সুদৃঢ় সিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংকলন পূর্ব্বক পর অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিব।

জীবন বিজ্ঞান।

প্রথম প্রস্তাব।

জীবন-বিজ্ঞান অতি আধুনিক শাস্ত্র। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন ছিলনা এবং তদ্বিষয় সম্বন্ধে কেবল মাত্র কতিপয় তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এমতস্থলে তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার জীবগণের স্বতন্ত্র সৃষ্টি অথবা এক প্রকার জীব হইতে অন্যান্য জীবগণের উৎপত্তি হইয়াছে কি না, এই প্রসঙ্গের সম্যক ও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে এক প্রকার জীব হইতে জলবায়ু ইত্যাদি কারণ নিবন্ধন বিবিধপ্রকার জীবগণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। ঐ সম্ভাবনা কি কি তত্ত্ব মুলক তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অবনী মণ্ডলে সহস্র সহস্র জীব দৃষ্টিগোচর হয় তন্মধ্যে কোন কোন প্রকার জীবের শরীর গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ঐ সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জীব সমূহ প্রথমতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে ভুক্ত করতঃ ক্রমান্বয়ে এক এক সম্প্রদায় ভিন্ন শ্রেণী ও এক এক শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন।

মানব দেহের সহিত শম্বুকের দেহ এবং শম্বুকের দেহের সহিত পতঙ্গের দেহ অর্থাৎ এক জাতীয় জীবের শরীর গঠন অন্য জাতীয় জীবের শরীর গঠনের সহিত তুলনা করিলে কি বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু বিশ্বপতির কি অনন্ত কৌশল! বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিত-গণ বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারায় প্রমিত করিয়াছেন যে উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত জীবগণের আদি গঠনে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সকল জীবই ডিম্বাকারে উৎপন্ন হয়। অতঃপর ঐ ডিম্বাকার পরি-ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রথমতঃ যে কতিপয় আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অধিকন্তু ইহা ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সকল জীবেরই ডিম্ব এক প্রকার পদার্থ-নির্ম্মিত। উদ্ভিদ সমূহেরও আদি গঠন ঐ প্রকার এবং জীবের ও উদ্ভিদের গঠন এক পদার্থে নির্ম্মিত। অতঃপর অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সকল জীবের ও উদ্ভিদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সেল' (Cell) রাশিবিনির্ম্মিত। কি তৃণ কি বৃক্ষ কি কীট কি হস্তী সকলই এক প্রকার পদার্থ হইতে একই প্রকার আকারে উদ্ভূত হইয়াছে।

চর্ম্ম, মাংসপেশী মস্তিষ্ক বৃক্ষের ত্বক, পত্র, ফল, মূল প্রভৃতি সমস্তই একই প্রকার (Cell) 'সেল' রাশিগঠিত। তৃতীয় চিত্র অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে যে ঐ প্রকার গঠন হইতে সমস্ত অস্থ্যাধারদেহী জীবের পরিণত গঠন প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

(ক) পৃষ্ঠদণ্ড। মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ হইতে যে স্থানে গো মহিষাদির পুচ্ছ থাকে ঐ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।

(খ) একটী গহ্বর। উহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মধ্যে একটী আবরণ থাকে। উপরিভাগে হৃৎপিণ্ড ফুস্ফুসাদি অবস্থিতি করে, নিম্নভাগে পাকস্থলী, অন্ত্র ও প্লীহাদির স্থান। মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া একটী নল উল্লিখিত আবরণ ভেদ করতঃ পাকস্থলীর সহিত সংলগ্ন আছে। ঐ নলের উপরিভাগে আর একটী নল আছে, তাহা ফুস্ফুসের সহিত মিলিত। (ক) চিহ্নিত স্থানের উপর মস্তক। মানব জাতির গঠনে (প) চিহ্নিত অঙ্গদ্বয় পদ-দ্বয়ে ও (ফ) চিহ্নিত অঙ্গদ্বয় হস্তদ্বয়ে পরিণত হয়। চতুষ্পাদ জীবের গঠনে ঐ অঙ্গ চতুষ্টয়ই পদে পরিণত হয়। পক্ষী জাতিতে (ফ) চিহ্নিত অঙ্গদ্বয় পক্ষ ও মৎস্য জাতিতে অঙ্গ চতুষ্টয়ই ডানা হয়।

অতঃপর জীবগণ কিরূপে প্রাণ ধারণ করে এই বিষয় আলোচিত হইতেছে।

আহারই জীবগণের প্রাণ ধারণের এক মাত্র উপায়, এবং বিবিধ উদ্ভিদ জীবগণের আহার তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন কোন জীবগণ মাংসাশী বটে কিন্তু যে সকল জীবগণ তাহাদের খাদ্য তাহারা উদ্ভিদাহারী। আহারীয় দ্রব্য প্রথমতঃ দন্ত দ্বারায় পেশিত হইয়া পাকস্থলীতে আমাশয়িক রস (**Gastric juice**) সংমিলিত হইয়া কর্দ্দমাকারে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। অন্ত্র সংলগ্ন বহুল শরীরোপযোগী দ্রব্য-শোষক মাংসগ্রন্থি (**Glands**) আছে। ঐ মাংসগ্রন্থি (**Glands**) দ্বারা শরীরোপযোগী দ্রব্য সকল শিরাতে নীত হইয়া রক্তের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। অপর অংশ মলরূপে দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয়। শরীরোপযোগী দ্রব্য সমূহ রক্তের সহিত সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হয়, পরিচালন কালে শরীরের যে যে অংশে যে দ্রব্যের আবশ্যক সেই সেই অংশে তাহা গ্রহীত হয়।

অবশিষ্ট অংশ ফুস্ফুসে নীত হয় এবং ঐ মিশ্রিত রক্ত ফুস্ফুস দ্বারায় পরিষ্কৃত হইয়া ধমনীর ভিতর গমন করে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে উদ্ভিদ সমুহ জীবের আহার, সুতরাং উদ্ভিদ সমুহ এবং বায়ু ও জলে যে সকল দ্রব্য আছে, জীবসমুহের শরীর সেই সকল দ্রব্যের কতিপয় দ্রব্যে নির্ম্মিত। এমত স্থলে প্রথমতঃ উদ্ভিদে কি কি পদার্থ আছে তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বীজ পৃথিবীতে পতিত হইলে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর এবং বায়ুমণ্ডলের কয়েক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে উদ্ভিদে প্রোটিন নামক এক পদার্থ আছে, ঐ পদার্থ অঙ্গারক, জলজান, অম্লজান, যবক্ষারজান এই মূল পদার্থ চতুষ্টয়ে প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন উদ্ভিদে জল (অর্থাৎ অম্লজান এবং জলজান সম্ভুত পদার্থ) চর্ব্বি, লবণ ও শ্বেতসার পদার্থ আছে। জীবগণের মৃত্যু হইলে তাহার দেহ কোন্ কোন্ পদার্থে পরিণত হয় এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। জীবের অস্থি সমুহ কারবোনেট অব লাইম (**Carbonate of lime**) এবং ফস্ফেট অব লাইমে (**Phosphate of lime**) বিভক্ত হয়। মাংস ও অন্যান্য অংশ অঙ্গারদ্রাবক (**Carbonic acid**) জল এবং এমোনিয়াতে (**Ammonia**) বিভক্ত হয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় চিত্র সহকারে যান্ত্রিক পদার্থ এবং জড় পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই রূপে উদ্ভিদ জগৎ, জড় জগৎ হইতে আপনার আবশ্যকীয় পদার্থ সকল গ্রহণ করিতেছে। জীবগণ উদ্ভিদ আহার করিয়া শরীরোপযোগী অংশ গ্রহণ করতঃ অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতেছে এবং অবশেষে জীবগণের মৃত্যু হইলে দেহ বিভক্ত হইয়া জড় জগতে সংশ্লিষ্ট হইতেছে। এইরূপ প্রকারে অহরহ প্রতিমুহূর্ত্ত এক জগতের
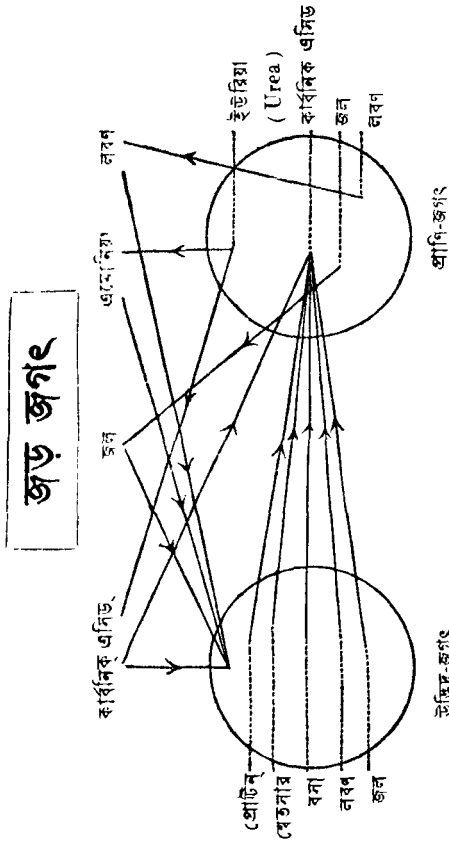
পদার্থ অন্য জগতে যাইতেছে এবং অন্য জগৎ হইতে নিজ নিজ আবশ্যকীয় পদার্থ গ্রহণ করিতেছে। পুরাকালে আর্যগণ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন যে পরমাত্মা পাপ-পুণ্য--ফল--বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে পরিভ্রমণ করে। পরমাত্মা যদি জড়পদার্থ সমূহের কেবল মাত্র নির্ম্মাণ কৌশলের ফল হয়, তাহা হইলে প্রতীচীন-জাতি কর্ত্তৃক আধুনিক আবিষ্কৃত জড় ও যান্ত্রিক জগতের সম্বন্ধ আর্য্যজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে।

রজনী-প্রভাত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিমলার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল, এক্ষণে নয়ন-কমল পলাশ-বিনিন্দিত অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়া শূন্য-মার্গে সন্নিবিষ্ট হইল। বিমলা দেখিল:—সুনীল উজ্জ্বল আকাশ মাথার উপর দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে; নিম্নে চাহিল:—সেই রূপ: সেই সর্ব্বব্যাপী আঘূর্ণন—পৃথিবী

ঘুরিতেছে, লক্ষ্মী ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল-অশ্বত্থ-তরু-সমন্বিতা স্বচ্ছ-সলিলা দীর্ঘিকাও ঘুরিতেছে। ক্রমে আবর্ত্তবেগ বর্দ্ধিত হইল—বিমলার শূন্য-নয়ন বিচিত্র-বর্ণ-সমাবেশ দর্শন করিতে করিতে অবশেষে অন্ধ-তামসে আচ্ছন্ন হইয়া গেল—ধীরে ধীরে দুইটী কিংশুক-কুসুম নিমীলিত হইল। বিমলা ভাবিতে লাগিল:—বুঝি, এতদিনের পর প্রাণ হারাইলাম—দগ্ধ হৃদয় ভস্মীভূত হইল—জীবনের একটী মাত্র সুখ-তারাও চিরদিনের মত ডুবিয়া যাইল। এই বিষম বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় দেখিতেছি: অতঃপর আমাকে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। সই-মা কি আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে?—বলিতে পারি না। সে যাহাই হউক, এস্থানে আর বহুক্ষণ থাকা যুক্তি-বিরুদ্ধ—এই ভাবিয়া সে তথা হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র দেখিতে পাইল:—সেই আকস্মিক অন্ধকার নাই, সেই মণ্ডলাকার আবর্ত্ত নাই—জগৎ ও শূন্য-দেশ যথা-স্থানে অচলভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, বৃদ্ধা লক্ষ্মী অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিস্মিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে।

লক্ষ্মী সস্নেহস্বরে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল:—অমন করিতেছ কেন? অধিক রৌদ্র লাগিয়াছে কি?

বিমলা—নিরুত্তরা: কোন কথাই কহিল না; যে পথ দিয়া মেদিনী-পুরে আগমন করিয়াছিল, সহসা জগদ্বিমোহন সুমধুর উচ্চ হাসি হাসিয়া সেই পথেই দ্রুতবেগে অদৃশ্যা হইল—এ যাত্রায় তাহার মনের সাধ কেবল মনেই রহিল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরিচিতে-অপরিচিতে।

চিন্তা——নিভৃতের সহচরী: নিভৃতে বসিয়া অপরিণামদর্শী

শিশু, মনের আনন্দে, ভাবী সুখের কতই সুরম্য হর্ম্ম্য শূন্য-মার্গে সৃষ্টি করে!—প্রেমিকের প্রেমময় হৃদয়, হৃদয়-প্রতিমের কুসুমময়ী কথা লইয়া সযতনে কতই সুচিকণ-মোহন-মালা গাঁথিতে থাকে!—রণ-রঙ্গ-যাত্রী সেনানী, কল্পনার রত্ন-গর্ত্ত আলোড়িত করিয়া, বিজয়-কামনায় কতই কৌশলময় রণ-চাতুর্য্য মনে মনে সঞ্চয় করিয়া লয়! এই নিভৃতে——দরিদ্রের দারিদ্র্য-চিন্তা কতই প্রবল হয়!—ভোগীর ভোগ-লালসা কতই প্রদীপ্ত হয়!—যোগরত তাপসের ঐশিক চিন্তা কতই প্রগাঢ় হইয়া উঠে! রুগ্ন-শয্যা-শায়ী পীড়িতের মন সদাই রোগ-চিন্তায় সমাকুল কিন্তু নিভৃতে—সেই বিষাদ-ময়ী চিন্তা কতই বল-বতী! অনুতাপীর, প্রজ্জ্বলিত স্মৃতি-তুষানল, পবিত্র-নয়ন-বারি-বর্ষণে নির্ব্বাপিত ও সুশীতল করিবার এরূপ স্থান জগতে আর নাই! সুখী বল, দুঃখী বল, এই সংসারে সকলেই—নিভৃতে—আপনাপন মনোদ্বার উদ্‌ঘাটিত করে—চিন্তা-লহর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া আবার একে একে কোথায় চলিয়া যায়!

বিমলা চলিয়া গেল: লক্ষ্মী——একাকিনী—সেই বাপী-তট-সমীপবর্ত্তিনী সুশীতল-ছায়ায় দাঁড়াইয়া সজলনয়নে ভাবিতেছিল:—বিমলা কি পাগল হইয়াছে? অভাগিনীর এ দুর্দ্দশা কতদিন ঘটিয়াছে বলিতে পারি না! কতদিনের পর সাক্ষাৎ হইল, কত কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় কিছুই জানিতে পারিলাম না! বিমলা পূর্ব্বে কি ছিল আর এখনই বা কি হইয়া গিয়াছে! বিধাতার মুখে ছাই!—মাথার মণি কাড়িতে যাইয়া সেই অপরূপ রূপে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে! অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে কতই দেখিতে হয়—কত জ্বালাই ভোগ করিতে হয়!————

এই সময়ে লক্ষ্মীর পার্শ্ব-দেশ হইতে কে সুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—ওগো বাছা! বামাচরণ বাবুর বাটী কোথায়, বলিতে পার?

লক্ষ্মী চমকিতা হইয়া মুখ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিল : একজন গৌরকান্তি পুরুষ অনতিদূরে দণ্ডায়মান। আগন্তুকের পরিধেয় সামান্য তথাপি সুরুচি-পরিচায়ক ; মুখ—সুহাস্যময় ; নয়ন——অর্দ্ধ-নিমীলিত অথচ অপাঙ্গে অলৌকিক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ; মস্তকের রমণী-বাঞ্ছিত নিবিড়-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত হইয়া রহিয়াছে।

লক্ষ্মী একমনে বিমলার কথা ভাবিতেছিল : আগন্তুক কখন্ তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারে নাই ; সে কি বলিয়াছে তাহাও সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পায় নাই—কেবল তদীয় বীণা-নিক্কণবৎ সুস্বর-লহরী বৃদ্ধার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া সুস্নিগ্ধ-অমিয়-সিঞ্চনে তাহার চিন্তা-সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মী, কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, আগন্তুকের মুখ-প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আগন্তুক, লক্ষ্মীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সুহাস্য-মুখে কহিল:—আমি তোমার অপরিচিত, আমি বিদেশী। কলিকাতা হইতে সম্প্রতি এস্থানে আসিয়াছি। আমি বামাচরণ বাবুর বাটীতে যাইব ; কোন্ পথ ধরিয়া তথায় যাইতে পারি, আমাকে বলিয়া দাও—আমার বিশেষ প্রয়োজন : তাঁহার নামে একখানি দরকারী পত্র আছে।

লক্ষ্মী, মেদিনীপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই চিনিত ; আগন্তুকের অপরিচিত মুখ দেখিয়াই তাহাকে বিদেশী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সে অনুমান সত্যে পরিণত হইল। লক্ষ্মী কহিলঃ—তুমি কোন্ বামাচরণ বাবুর অন্বেষণ করিতেছ ?

আগন্তুক প্রত্যুত্তরে কহিল :—যিনি এখানকার ডাক্তার।

লক্ষ্মী—স্তম্ভিতা, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সঙ্কুচিতস্বরে বলিল :—তিনি ত বাঁচিয়া নাই, বহুদিবস গত হইল তাঁহার কাল হইয়াছে——

আগন্তুক চমকিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে ও নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক

স্বরে লক্ষ্মীর কথায় বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল :—বল কি! তিনি বাঁচিয়া নাই! আহা! তাঁহার যেরূপ অশেষ-বিধ গুণের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ তিনি জীবিত থাকিলে আমার কতই উপকার হইত! আমি নিতান্ত দুরদৃষ্ট—নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন?—ওঃ! কত আশাই করিয়াছিলাম——বলিতে বলিতে মনোবেদনায় আগন্তুকের স্বর কণ্ঠ-দেশে রুদ্ধ হইয়া গেল, সে পরক্ষণে লক্ষ্মীর মুখ-প্রতি একবার বিদ্যুদ্বৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, অধোনয়নে বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী অন্যমনে বামাচরণের কথা ভাবিতেছিল, আগন্তুকের সেই অলৌকিক অপাঙ্গবীক্ষণ দেখিতে পায় নাই—দেখিতে পাইলে, বোধহয়, বুঝিতে পারিত, যে সে দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ!—তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া মনোভাব পর্য্যবেক্ষণে সমুদ্যত! লক্ষ্মী সজল-নয়নে কহিতে লাগিল :—তাঁহার গুণের কথা কতই বা শুনিয়াছ, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সবিশেষ বুঝিতে পারিতে——তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাই না। তাঁহার দয়া ও স্নেহের কথা মনে হইলে চক্ষে জল আইসে। তিনি—কোন দেবতা——বোধহয় আমাদের উপকার সাধিতে মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন——প্রাণ দিয়া পরের উপকার করিয়াছেন!

লক্ষ্মীর শেষোক্ত-কথাগুলি শুনিয়া আগন্তুকের বিষণ্ণমুখে অপরিজ্ঞেয় সুহাস্যের ক্ষণমাত্র উদয় হইল ও পরক্ষণেই তাহা আনন-বিরাজি-গভীর-বিষণ্ণতায় বিলীন হইয়া গেল। আগন্তুক সোৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল :—তাঁহার কি পীড়া হইয়াছিল?

লক্ষ্মী, অঞ্চলান্ত-দ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে, কহিতে লাগিল :—না, না—তাঁহার কোন ব্যামো(হ) হয় নাই——একরাত্রে আমার বাবুর একটী মৃত শিশুকে শ্মশানে রাখিতে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন! একে অধিক রাত্র হইয়াছিল তাহাতে আবার শ্মশানের পথে—মা

গো! মনে হইলে আতঙ্কে গা(ত্র) শিহরিয়া উঠে!—শুনিয়াছি কে একজন তাঁহাকে পৃষ্ঠে ছুরি বিঁধিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে?

আ। সে—কে?—তাহাকে দেখিয়াছ কি?

ল। না—সে মনুষ্য কি পিশাচ তাহাও বলিতে পারি না। থানার লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল কিন্তু আসামীকে ধরিতে পারে নাই।

আ। অনুমান করি—এ কোন শত্রুর কাজ। ভাল, তাঁহার সহিত কাহারও কি বিবাদ ছিল?

ল। বিবাদ কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না: তিনি সকলকেই ভাল বাসিতেন, এখানকার প্রায় সকলেরই যথাসাধ্য উপকার করিয়াছিলেন; তবে কে তাঁহার এতদূর বাদ সাধিল, ভাবিয়া পাই না। কলিকালের দশাই এই: ভালর মন্দ ও মন্দের ভাল হইয়া থাকে! তুমি আর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এখানে আসিলে, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতে—তখন সেই অভাগী এই স্থানেই ছিল, চলিয়া যায় নাই।

লক্ষ্মীর বাক্য একটী দীর্ঘ-শ্বাসে পর্য্যবসিত হইল।

আগন্তুক বিলোল-নেত্রে লক্ষ্মীর মুখপানে দুই তিন বার চাহিয়া কহিল:—আমি আসিতে আসিতে দূর হইতে দেখিয়াছি, এক ভৈরবী তোমার নিকট হইতে ঐ দিকে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। এই বলিয়া আগন্তুক অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিমলার গমন-পথ লক্ষ্মীকে দেখাইয়াদিল।

লক্ষ্মী ভগ্নস্বরে কহিতে লাগিল:—আমি তাহারই বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সে ইতিপূর্ব্বে সকলকেই ভাল বাসিত, কাহারও কখন কোন অপকার করে নাই, পরের সুখ আপনার বলিয়া ভাবিত—আজ তাহার অবস্থা দেখিলে ত?—ভৈরবীর বেশে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোথায় থাকে, কি করে, কিছুরই স্থিরতা নাই—ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইল, সে পাগল হইয়াছে!

বাক্যাবসানে লক্ষ্মী সজল-নয়নে পুনরায় চিন্তা-সলিলে নিমগ্না হইল—জীবনের অতীত সুখের কথাগুলি একে একে স্মৃতি-পথ অবলম্বন করিয়া তাহার মানস-ক্ষেত্র অধিকার করিল।

আ। পাগল হইয়াছে ?

লক্ষ্মী————নিরুত্তরা।

পুনরায় সেই প্রশ্ন——পুনরায় কোন উত্তর নাই।

আগন্তুক লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিল—চাহিয়াই বুঝিতে পারিল যে, লক্ষ্মীর মন, মৃণ্ময় পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এরূপ সুযোগ, বোধহয়, আর হইবে না—এই ভাবিয়া আগন্তুক অবিলম্বে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে সেই অশ্বত্থ তরুর প্রকাণ্ড কাণ্ডের অপরপার্শ্বে যাইয়া লুক্কায়িত হইল ও ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষান্তরাল হইতে লক্ষ্মীকে প্রচ্ছন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সহসা সেই অবিরল-কিসলয়-সমাচ্ছন্ন উচ্চ-বৃক্ষ-শাখা হইতে একটী পাখী সকরুণ-মধুর-স্বরে নীরব বাপী-তট কম্পিত করিয়া ডাকিয়া উঠিল—লক্ষ্মীর মন, শূন্য-দেহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

"কি বলিলে ?"—বলিয়া লক্ষ্মী চকিত-নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল: আগন্তুক কখন্ চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী আর তথায় দাঁড়াইল না: প্রভু-গৃহের কথা তাহার স্মরণ হইল—হয়ত মা-ঠাকুরাণী আমার বিলম্ব দেখিয়া কত রাগ করিতেছেন—কুমু আমাকে দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিতেছে—বিলম্ব করিয়া কুকাজ করিয়াছি—ভাবিতে ভাবিতে স্নেহময়ী লক্ষ্মী হরেন্দ্র নাথের সৌধাভিমুখে প্রস্থান করিল।

আগন্তুক সংবৃত স্থল হইতে লক্ষ্মীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া অস্ফুট-স্বরে কহিতে লাগিল :—যাও লক্ষ্মি! এক্ষণে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও—এক সময়ে, তুমিও আমাকে দেখিয়া এইরূপ লুকাইতে চেষ্টা করিবে! তুমি আমার বিলক্ষণ পরিচিতা কিন্তু আমি যে তোমার অপরিচিত—ইহা সুখের বিষয়—ইহাই আমার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। বিমলার জন্য, বোধহয়, আর একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

ইত্যবসরে লক্ষ্মী নয়ন-পথের বহির্ভূতা হইল, আগন্তুকও ধীরে ধীরে সেই সুস্নিগ্ধ-তরুচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া, যে উত্তপ্ত পথে বিমলা অদৃশ্যা হইয়াছিল, সেই পথেই গমন করিতে লাগিল।

চঞ্চলা।

বল্লভী-নদী-তীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে একটী বৃদ্ধ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, একপার্শ্বে বসিয়া একটী কুসুম-ময়ী বালিকা তালবৃন্ত হস্তে ব্যজন করিতেছে, অপর পার্শ্বে একটী বালক ঔষধ-পাত্র-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কুটীরের দ্বারদেশে একজন পরিচারিকা বসিয়া নীরবে নয়ন-বারি সিঞ্চন করিতেছে। মুমূর্ষুর মুখ-মণ্ডল যাতনায় ক্লিষ্ট—বিশাল নয়নে আর সে জ্যোতিঃ নাই, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, দেহ অবশ—স্পন্দহীন। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়াছিল—ধীরে ধীরে নয়নপল্লব উন্মীলন করিয়া বালিকার মুখ-প্রতি চাহিয়া কহিল—"মা, একবার জান্‌লাটী খুলিয়া দাও, আমি জন্মের মত সব দেখিয়া লই।"

বালিকা গবাক্ষদ্বার মুক্ত করিল।

দিবা অবসান প্রায়—জগৎপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। পশ্চিম গগণের নীলিমা ব্যাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার-বরণ-ঘটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অদূরে তরল-সুবর্ণ-ময়ী তরঙ্গিণী তরতর রবে প্রবাহিতা। সেই তরতর রবের সঙ্গে সুর মিলাইয়া দুই একটী পাখী স্বর-লহরীতে আকাশমণ্ডল ভাসাইতেছে। পবন ধীরে ধীরে স্বর্ণ-ময়ী প্রকৃতিকে মন্দ মন্দ আন্দোলিত করিতেছে। বালিকা গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিল—যেন কোন দেবকন্যা বৃদ্ধের নয়ন-সমক্ষে স্বর্গদ্বার মুক্ত করিয়া স্বর্গের ছবি ধরিল। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরবে, স্থির দৃষ্টে, একাগ্র চিত্তে সন্ধ্যা-শোভা নিরীক্ষণ করিল। নয়ন-প্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল—মনে মনে ভাবিল—

"জগদীশ! এ জীবন বৃথায় কাটাইয়াছি, তোমায় একবার ডাকি নাই, ভাবি নাই, এ অকূল পাথারে তরী ডুবে—গতি, কি হইবে প্রভো! দিন যায়, কি হইবে দীনের গতি দীননাথ!" ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মন মৃণ্ময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশ অতিক্রম করিয়া, সেই অগতির গতি, অক্ষয় পুরুষের পদ-প্রান্তে প্রণত হইয়া পড়িল।

মুমুর্ষু ক্ষণপরে পার্শ্বস্থিত বালকের দিকে চাহিয়া কহিল—"অরুণ, নির্ব্বাণ দীপে আর তৈল দিলে কি হইবে? ওসকল ফেলিয়া দাও, আমার যে ঔষধি প্রয়োজন আমি তাহারই অন্বেষণ করিতেছি। বৃদ্ধ আবার নীরব হইয়া রহিল, পরে কহিল—"আজ তিনি এখনও——" এই কথা বলিতে বলিতে কক্ষ মধ্যে একটী যুবা পুরুষ প্রবেশ করিলেন। যুবা আসিবা মাত্র বৃদ্ধের মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল, ইঙ্গিতে তাঁহাকে বসিতে কহিল। যুবা উপবেশন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজি কেমন আছেন :— ঔষধ খান নাই কেন?"—

বৃদ্ধ কহিল—"কি ঔষধ খাইব? ঔষধে কি আয়ু দিতে পারে? আমার আর দিন নাই;—বোধহয় আর অধিকক্ষণও বাঁচিব না।" যুবা নীরবে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুনরপি কহিতে লাগিল—"আমি চলিলাম, চঞ্চলা রহিল। অতি শিশুকাল হইতে সে মাতৃ স্নেহে বঞ্চিতা, এখন আমিও চলিলাম,—আমার নয়ন-পুত্তলি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী,—দেখিও যেন কখন রোদন করে না। অরুণের কেহই ছিল না, বহু যত্নে পালন করিয়াছি, সহোদর নির্ব্বিশেষে ইহাকে স্নেহ করিও। মানস ছিল অরুণের সহিত চঞ্চলার বিবাহ দিব—যদি উভয়ের অমত না হয় তবে তুমিই সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিও। অর্থাভাবে ইহারা কখন

কষ্ট পাইবে না, আমার যা সম্পত্তি আছে তাহা ইহাদের পক্ষে প্রচুর। আর তুমি আমায় পরিচয় দেও নাই, কে তুমি বল বল— তোমার নাম ইষ্ট দেবতার সঙ্গে জপ———”

যুবা আর শুনিলেন না, কহিলেন—“ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।”

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ অবসন্ন ভাবে যুবার মুখ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে এক হস্তে চঞ্চলার ও অপর হস্তে সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—“ মা, চঞ্চলা, ইঁহাকে দেবতাব ন্যায় ভক্তি করিও।”

সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। জগৎপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল;— বৃদ্ধের জীবন-প্রদীপ নিভিল।

২

চঞ্চলার পিতা হরলাল মিত্র উইল করিয়া গিয়াছিলেন—তন্মধ্যে এই একটী বিধি ছিল--“ আমার যে সম্পত্তি আছে তাহা আমার কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দাসীকে ও আমার বন্ধু-পুত্র শ্রীমান অরুণ চন্দ্র ঘোষকে সমানাংশে দান করিলাম। বৃদ্ধা পরিচারিকা, যতদিন বাঁচিবে, ভরণীয়া ”। উইল সুরেন্দ্রের হস্তে পড়িল—সুরেন্দ্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ জমিদার,— তিনিও শৈশবে চঞ্চলার ন্যায় মাতৃহীন হইয়াছিলেন, প্রায় চারি বৎসর হইল তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সুরেন্দ্রের বয়স এক্ষণে প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর। পরিবারের মধ্যে আর কেহই নাই— কেবল কনিষ্ঠা ভগিনী—বিধবা শৈবলিনী। এই সুরেন্দ্রের সংসার, তিনি অদ্যাপিও দার পরিগ্রহ করেন নাই।

সুরেন্দ্র প্রতিদিন অপরাহ্নে নদীতীরে বিচরণ করিতেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কিছু দূরে গমন করিয়া একখানি কুটীর দেখিতে পাইলেন, মনে কৌতূহল জন্মিল, অনুসন্ধানে জানি-

লেন—কুটীর হরলাল মিত্রের, তিনি এখন রুগ্ন-শয্যায় শায়িত। সুরেন্দ্র সমস্ত অবস্থা পরিচারিকার মুখে শুনিলেন ; বুঝিলেন বালক-বালিকা সহায়-হীনা—বৃদ্ধাকে কহিলেন “আমি একবার দেখিব।” বৃদ্ধা সম্মতা হইয়া তাঁহাকে কুটীরে লইয়া গেল। সেই অবধি সুরেন্দ্র নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মরিল—চঞ্চলা অনাথিনী হইল। অনুরূপ অবস্থায় যেমন ভালবাসা জন্মে এমন আর কিছুতেই নয়। চঞ্চলাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহ জন্মিল।

উল্লিখিত ঘটনাবলির পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। চঞ্চলা এখনও বালিকা—বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। নির্জ্জনে শোকের আধিপত্য অধিক—বালিকার হৃদয় হইতে পিতৃ-শোক এখনও সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই। শৈশবের দুরবস্থা চির-জীবনকে বিষাদের বর্ণে চিত্রিত করে ; যতই কেন সুখী হওনা দুঃখের স্মৃতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিহিত থাকে, সময়ে সময়ে উদ্দীপনা পাইলে আবার জ্বলিয়া উঠে। মানব-জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই—যে আনন্দ-স্রোতে হৃদয় একবার উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহার স্মরণে চিত্ত আর উচ্ছ্বসিত হয় না, কিন্তু দুঃখের স্মৃতি নিত্য-দুঃখ-প্রদ।

চঞ্চলা পিতৃ-মাতৃ-বিহীনা, চঞ্চলা অভাগিনী—অনাথিনী, চঞ্চলা সুখেও বিষাদ-ময়ী। বালিকার সঙ্গী কেহই ছিল না। অরুণ বিদ্যাধ্যয়নে রত, সে সুরেন্দ্রের বাটীতে থাকিত। সেই বিজন কুটীরের অধিবাসিনী—চঞ্চলা ও বৃদ্ধা পরিচারিকা। বালিকা সারা-দিন নদী-তীরে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়াইত। সায়াহ্নে সুরেন্দ্র তাহাকে পুস্তক পড়াইতেন। সুরেন্দ্র চলিয়া গেলে চঞ্চলা নদীতীর শ্যাম উপকূলে অঞ্চল পাতিয়া, প্রবাহিনীর সকরুণ সঙ্গীত লহরীর

সহিত আপনার দুঃখময় জীবনের দুঃখের কাহিনী মিশাইয়া, ভাবে বিজড়িত হইয়া শুইয়া থাকিত। সন্ধ্যার আকাশে নীরবে তারা ফুটে, চঞ্চলা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে। সমীরণ বিষাদ-গীত গাইয়া চলিয়া যায়, বালিকা নীরবে তাহাই শুনে।

সুরেন্দ্র প্রতিদিন আসিতেন, চঞ্চলার ভাবান্তর দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় অধিক দিন যাইলে বালিকার পীড়ার সম্ভাবনা। শৈবলিনীর কাছে লইয়া গেলে, চঞ্চলা সঙ্গিনী পাইবে—মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তিনি প্রতিদিন চঞ্চলাকে এ কথা বলিবেন বলিয়া মনে করিয়া আসেন, প্রতিদিনই ভুলিয়া যান।

এক দিন নিদাঘ সায়াহ্নে চঞ্চলা তীরে বসিয়া ললিত-লহরী-লীলা দেখিতেছিল। সুরেন্দ্র আসিলেন ;—বালিকার বিষাদ-ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন—"চঞ্চলা কি দেখিতেছ, এত ম্লান কেন ?" বালিকা প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ ত্রস্ত হইল, কিছু উত্তর দিল না। অধর প্রান্তে মৃদুহাসি ফুটিয়া স্বপনের হাসির ন্যায় আবার মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে চঞ্চলা পড়িবার পুস্তক আনিয়া পড়িতে বসিল। সুরেন্দ্র পড়াইতে বসিলেন, চঞ্চলার অধ্যয়নে মন নাই, চক্ষু পুস্তকের উপর, মন আকাশ ভ্রমণ করিতেছে, কর্ণ তরঙ্গিণীর জল-কল্লোল শ্রবণে নিবিষ্ট। সুরেন্দ্র অনেক যত্ন করিলেন কিছুতেই মন ফিরে না, বলিলে বিশাল নেত্র দুটি সুরেন্দ্রের মুখপানে স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে। এই রূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল—সুরেন্দ্র নীরবে বসিয়া রহিলেন, বালিকা নীরবে বসিয়া রহিল। উভয়ে এই রূপে অবস্থিত—অদূরে উপবন কম্পিত করিয়া কোথা হইতে একটী পাখী সান্ধ্য-গগন পূর্ণ করিয়া মধুর স্বর-লহরী তুলিল—বালিকা অন্যমনে বলিয়া উঠিল "ও কি বলিতেছে ?" বলিয়া

কিছু অপ্রতিভ হইল, সুরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন—কথাটি চঞ্চলার শুন্য-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি—আপনা হইতেই বাহির হইয়াছে। সুরেন্দ্র অন্য কথা আরম্ভ করিয়া, কথায় কথায় বলিলেন—"চঞ্চলা এমন করিয়া দিন কাটাইলে কি হইবে? তোমারও সঙ্গী নাই, শৈবলিনীরও সঙ্গী নাই, চল শৈবলিনীর সহিত একত্রে থাকিবে।" এ বিজন কুটীরে এমন কিছুই ছিলনা, যার জন্য চঞ্চলা সেখানে থাকিতে চায়, তথাপি সেস্থান পরিত্যাগ করিতে চঞ্চলার মমতা জন্মিল। যে দিকে চায়, সেই দিকেই দুঃখের স্মৃতি মনকে প্রপীড়িত করে, তবু চঞ্চলা সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায় না। অনেক ক্ষণের পর সে সম্মতা হইল। দিন স্থির হইল পর দিন প্রভাতে যাইবে।

সুরেন্দ্র চলিয়া গেলেন, চঞ্চলা সেস্থান হইতে উঠিল না, যেখানে ছিল, সেই খানেই বসিয়া রহিল। তরঙ্গিণীর জল-কল্লোল, পবনের বিষাদ-গান, আকাশের নীলিমা, আজি অধিকতর মধুময়, অধিকতর বিষাদ-পুর্ণ বোধ হইতে লাগিল। যামিনী যখন গভীরা, তখন বালিকা ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রভাত হইল, পাখী ডাকিল, সুর্য্য উঠিল, কুসুম হাসিল, তরুলতা হাসিল, জগৎ হাসিল চঞ্চলা হাসিল না—নীরবে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বেলা হইলে সুরেন্দ্র নাথ পাল্‌কী পাঠাইলেন, চঞ্চলা চলিয়াগেল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা পরিচারিকাও গেল, ঘরে চাবি পড়িল। ক্ষুদ্র কুটীরে এতদিন যে আল জ্বলিতেছিল, তাহা নিভিল। বিজনে জন-শূন্য অন্ধকার কুটীর পড়িয়া রহিল।

৩

শৈবলিনী বিধবা।—বিধাতা তাহার কপালে বাল-বৈধব্য লিখিয়াছিলেন—স্বামী কি তাহা সে জানিতে পারে নাই। শৈবলিনী

প্রফুল্লময়ী—কেহ কখন তাহাকে ম্লানমুখী দেখে নাই। শৈবলিনী স্নেহ-ময়ী—কেহ কখন তাহার নিকট অনাদর পায় নাই। শৈবলিনী দয়া-ময়ী—কেহ কখন তাহার মুখে রূঢ়-কথা শুনে নাই। ভ্রাতার প্রতি শৈবলিনীর অচলা ভক্তি।—শৈবলিনী সুরেন্দ্রের গৃহের কনক প্রদীপ।

চঞ্চলা আসিলে শৈবলিনী তাহার হস্ত ধরিয়া আপনার কক্ষে লইয়া গেল। চঞ্চলা বসিল। তাহার নিকট সকলেই অপরিচিত, চারিদিকে সকলে দেখিতে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কত কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, চঞ্চলা কিছুরই উত্তর দিতেছেনা, লজ্জায় নয়ন বিনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। শৈবলিনী বলিল— "চঞ্চলা আমার, আমার কাছে থাকিবে, তোমরা কেন গোল-কর?" সকলে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল—কক্ষ মধ্যে কেবল শৈবলিনী ও চঞ্চলা রহিল।

শৈবলিনী আদর করিয়া চঞ্চলার চুল বাঁধিয়া দিতে বসিল। চুল বাঁধা শেষ হইলে একটী সপত্র গোলাপ আনিয়া কবরীতে পরাইয়া দিল। পরাইয়া দিয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিল—পরে হাসিয়া কহিল—'বাঃ, বেশ সেজেছে। চঞ্চলা, দিদি, আমায় ভাল বাসিবে ত?' তখন সে আদর করিয়া চঞ্চলাকে কত মিষ্ট কথা বলিল।

তা শৈবলিনী ত আদর করিল, চঞ্চলা প্রতিদান দিল কি?—দুইটী তরল মুক্তা। শৈবলিনীর সস্নেহভাবে তাহার চিত্ত বিগলিত হইল। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্নেহবারি পড়িলে তাহা অন্তরে থাকে না—মুক্তা-ময়ী হইয়া আপনি বাহির হইয়া পড়ে। শৈবলিনী আদরে চক্ষু জল মুছাইয়া কহিল—"কাঁদিস্ কেন বোন্, আমি তোর দিদি হই।" সেই অবধি চঞ্চলা শৈবলিনীকে যাঁর পর নাই ভাল বাসে, "দিদি" বলিয়া ডাকে।

চঞ্চলা সাংসারিক কার্য্য শিখিতে লাগিল। সুরেন্দ্র যথার্থ অনুমানই করিয়াছিলেন—বালিকার মনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু পূর্ব্বভাব একেবারে গেল না। কখন কখন চঞ্চলা অন্যমনস্কা হয়। সুরেন্দ্রের অন্দরের সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল। চঞ্চলা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেই উদ্যানে বেড়াইত। এক দিন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, চঞ্চলা এখনও ফিরে নাই, যেখানে বসিয়া ছিল সেই খানেই রহিয়াছে।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে—নিশা জ্যোৎস্নাময়ী। চারিদিকে ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিতেছে, কোথাও মেঘ নাই—আকাশ উজ্জ্বল-নীল। সেই নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তারা ফুটিয়াছে, চাঁদের আলোয় জগৎ ভরা। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, সরসিবক্ষে আকাশের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে, স্বভাব নীরব। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে:—সূর্য্য-মুখী—ম্লানমুখী, নলিনী—মলিনা, কুমুদিনী—হাস্যময়ী। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে চঞ্চলা এখনও ফিরে নাই দেখিয়া শৈবলিনী তাহাকে ডাকিয়া আনিতে উদ্যানে আসিল। উদ্যানে আসিয়া শৈবলিনীর ডাকা হইল না, চঞ্চলাকে ভুলিয়া প্রকৃতির বিমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। দেখিল—স্বভাব শান্তিপূর্ণ, প্রকৃতি মধু-ময়ী। মনে মনে ভাবিল—"এত মধুর, তবু দেখে প্রাণ জ্বলে কেন? ভাবিতে ভাবিতে শৈবলিনী বাপী-তটে আসিয়া দেখিল বিষাদ-প্রতিমা চঞ্চলা! শৈবলিনী বলিল——"চঞ্চলা, সারা রাতই কি এইখানে বসিয়া থাকিবি?"

চঞ্চলা।——রাত কি বেশী হইয়াছে? চল যাই।

শৈ। 'চল যাই'। যেতে এত অনিচ্ছা কেন?

চ। না।

শৈ। 'না' তাত জানি। চঞ্চল, কি ভাবচিস্?

চ। দিদি, এই সব দেখিয়া আমাদের সেই কুটীর মনে পড়ে। এমনি সময় সেই বল্লভী-তীরে অরুণ আর আমি বসিয়া চাঁদের আলোয় বনফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বাবার কাছে গল্প শুনিতাম—বলিতে বলিতে চঞ্চলার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল—অঞ্চল হইতে কতকগুলি পুষ্প ঝরিয়া পড়িল। চঞ্চলা সেই দিন মনে করিয়া মালা গাঁথিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল—"তুই মালা গাঁথিয়া এখন কাহার গলায় পরাইবি? আমি অরুণকে ডাকি।"

চঞ্চলা ঈষৎ লজ্জিতা হইযা কহিল—"দিদি, সকল সময়েই তামাসা?"

শৈ। চঞ্চল, বেশ বাতাস বচ্চে, আয় দুইজনে খানিক বসিয়া থাকি।

দুই জনে বাপী-তটে বসিল। সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, মনোহারিণী প্রকৃতির শ্যাম কলেবরে, নক্ষত্র-রাজি-বিরাজিত অম্বর-তলে, জ্যোৎস্না-সুপ্ত সরোবর-তীরে শৈবলিনী ও চঞ্চলা বসিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শৈবলিনী কহিল—"চঞ্চল, সত্য করিয়া বলিবি?"

চ। কি?

শৈ। তুই কি ভাবিস্?

চ। কি ভাবি? কি ভাবি তা জানিনা—কেন ভাবি তাও জানিনা; কিন্তু প্রকৃতির এই শোভা দেখে বসে বসে ভাবতে ইচ্ছা করে, ভাবনা যেন আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কে যেন কি-কথা কহিয়া আমার মনে কত কি জাগাইয়া দেয়।

শৈ। চঞ্চলা, মাকে তোর মনে পড়ে?

চঞ্চলা ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"না

শৈ। "চঞ্চলা, তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?"

এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শৈবলিনী অন্য-মনস্কা হইল। চঞ্চলা নীরবে বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে চঞ্চলা কহিল—"দিদি, তুমি কি ভাবিতেছ? আজ কিছু খাওনাই কেন?"

শৈ। আজ একাদশী।

চ। দিদি, একাদশী কি?

শৈ। অভাগিনীর ব্রত!

চ। দিদি, তুমি সকল সময়েই হাস, মাঝে মাঝে অমন করিয়া থাক কেন?

শৈ। আমায় ভূতে পায়। চ' যাই।

দুইজনে উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিল। শৈবলিনী ও চঞ্চলা একত্রে শয়ন করে, দুই জনে শয়নাগারে গেল। শয়ন করিল। ভাবিতে ভাবিতে চঞ্চলা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। শৈবলিনী শুইল না—মুক্ত-বাতায়ন-পথে, স্ফুট-চন্দ্রালোকে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল জানি না। গভীর নিশীথে চঞ্চলা কি স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিল শৈবলিনী আদৌ শয়ন করে নাই, বিছানা যেমন তেমনি পাতা রহিয়াছে। চঞ্চলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, এখনও শোও নাই?"

শৈবলিনী প্রত্যুত্তরে বলিল—"আমায় ভূতে পাইয়াছে।"

শৈবলিনী শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চঞ্চলা দেখিল, শৈবলিনীর চক্ষুর আর সে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নাই!

৪

অরুণের বয়স এখন প্রায় ঊন-বিংশতি বৎসর—পড়ে শুনে, আর মাথামুণ্ড বকিতে বকিতে সেই বল্লভী-তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

কখন কি করে কিছুরই ঠিক নাই। অর্দ্ধেক রাত্রি ঘুমায় না—বই হাতে করে বসে থাকে, খাবার সময় খায় না—বসে বসে কবিতা লেখে। অরুণ সুরেন্দ্রের ঘরের ছেলের মত থাকে।

কিন্তু অরুণ সুরেন্দ্রের বাটীতে থাকে কেন? প্রথম কারণ—সুরেন্দ্র অরুণের অভিভাবক, সুরেন্দ্রের ইচ্ছা—অরুণ তাহার কাছে থাকে। দ্বিতীয় কারণ—অরুণ অতিশয় অধ্যয়ন-প্রিয়, সুরেন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তক ছিল। অরুণের এক মহৎ দোষ সে কাহারও সহিত কথা কয় না, কেবল সুরেন্দ্রের সহিত কখন কখন গল্প করে। সকলেই ভাবিত—" এটা একটা আধপাগলা, " আমি ভাবি কালের স্বধর্ম্ম।

অরুণ কবিতা লিখে হেথা সেথা ফেলিয়া যায়—কেহই তাহার খোঁজ খপর লয় না—কেবল শৈবলিনী (কেন তা জানিনা) সেই গুলি পড়িয়া পড়িয়া মুখস্ত করে আর যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখে।

একদিন রাত্রে অরুণ বাহিরে আপনার কক্ষে বসিয়া পড়িতেছিল। অধ্যয়নে তাদৃশ মন নাই। একবার একখানি বই খুলে, একটু পড়িয়াই সেখানি মুড়িয়া রাখে। আর একখানি খুলিল, সে খানিও সেই রকম করিয়া মুড়িল। শেষে আপনা আপনি বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণ এইরূপে কক্ষ মধ্যে বসিয়া আছে, সুরেন্দ্র আসিলেন। সুরেন্দ্র অরুণের অবস্থা দেখিয়া কহিলেন—" অরুণ, অমন করিয়া বসিয়া কেন?"

অ। সুরেন্, আমি ভাই ভাবিতেছি একবার দেশ ভ্রমণে যাইব।

সু। কেন?

অ। কিছুই ভাল লাগে না, মন কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

সু। কবে যাইবে?

অ। সুবিধা হয়ত কালই।

সু। 'সুবিধা হয়ত কালই'? চল একটু বাগানে বেড়াইগে।

দুই জনে উদ্যানে বেড়াইতে গেলেন। কেন অরুণের এরূপ ভাবান্তর হইল সুরেন্দ্র কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন অধিক মানসিক পরিশ্রমের ফল। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "অরুণ, চঞ্চলার বিবাহের সময় হইয়াছে।"

অ। হ্যাঁ, উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক।

সু। তাহাও করিয়াছি।

অ। কাহাকে!

সু। চঞ্চলার পিতার কথা মনে করিয়া দেখ।

অ। চঞ্চলাকে আমি সহোদরার ন্যায় স্নেহ করি।

এ কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র সুখী হইলেন কি দুঃখিত হইলেন তাহা বলিতে পারি না।

সু। অরুণ, কেন দেশান্তরে যাইবে?

অ। স্বভাবের শোভা দেখিলে মনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

সু। কই এ নিশার এমন মনোহর শোভাতেত তোমার মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে না?

অ। এমন চাঁদের টিপ কাটা তারা-হারা প্রকৃতি দেখে আমার মন পরিবর্ত্তন হয় না। চাঁদের ও ঢল ঢল হাসি কেবল বিদ্রূপ করে, যা' ভুল্‌তে চাই, প্রাণে তাই জাগাইয়া দেয়। যাহা দেখিলে চিত্ত স্তম্ভিত, হৃদয় স্পন্দহীন, মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত না হয়, তাহা আমার ভাল লাগে না। যে গিরি-শৃঙ্গ, অন্ধকার বিজন উপত্যকা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, জল-প্রপাতের বজ্র-নিনাদ শুনিতে থাকে, যা'র উচ্চতাকে মন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, তাহা দেখিলে মনে কি হয়? নিবিড় বন, যাহা দূর-ব্যাপিনী

কল্পনাও পরিমাণ করিতে পারে না, তাহার ভিতর থাকিলে মনে কি হয়? সিন্ধুর-অনন্ত-জল-রাশি দেখিলে আর আপনার অস্তিত্ব মনে থাকে না। কাদম্বিনীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম-ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আর এই ছার পৃথিবীর দিকে নজর করিতে ইচ্ছা করে না। আমি বলি অমানিশা পূর্ণিমার অপেক্ষা সহস্র গুণে শোভাময়ী।

সু। অরুণ, তোমার চিত্ত এত অস্থির হইল কেন?

অ। সে নরক তুমি দেখিয়া কি করিবে?

সুরেন্দ্র কিছুই বুঝিলেন না, কেবল এই মাত্র বুঝিলেন অরুণের যাওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিনের মধ্যে অরুণ দেশান্তরে চলিয়া গেল।

অরুণ চলিয়া গেলে তাহার কিছুদিন পরে পুস্তক পড়িতে পড়িতে সুরেন্দ্র তাহার ভিতরে একখানি অরুণের হস্ত-লিখিত কাগজ পাইলেন। লেখা এই :—

"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—আর আমার মন? কিছুপরে মেঘ চলে যাবে, চাঁদ উঠ্‌বে, তারা ফুটিবে, প্রকৃতি এ ভাব ভুলে যাবে, আমার মনে আর তা' হবে না। জড়-প্রকৃতিতে যে বিধান, মানব-প্রকৃতিতে সে বিধান নাই কেন? নীরস তরু রসাল হয়, শুষ্ক নদীতে পুনঃ প্রবাহ বয়, ঝটিকার অবসানে আবার প্রকৃতি হাসে, কিন্তু হৃদয়ে একবার ক্ষত হইলে আর শুকায় না কেন? যা পাবার নয়, তাহাতে স্পৃহা হয় কেন? না পাইলে ভোলা যায় না কেন? তাহার স্মৃতি, যন্ত্রণা দেয় কেন?—কে বলিবে কেন? মানব বুঝেনা, ভালবেসে কেন হৃদয়কে শ্মশান করে। পরিণাম ত এই, তবে ভালবাসি কেন!, পরিণাম বিবেচনা করে কে কোথায় ভালবাসে? ভালবাসা চোখের দেখা।

"রূপ? চঞ্চলাও ত রূপবতী। গুণ? এমন কি গুণ? যাই থাক্ আমার মন তাহারই পক্ষপাতী।"

অরুণের চিত্ত অস্থির কেন, সুরেন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

যেমন কুসুমের সৌরভ, সেইরূপ রমণীর ভালবাসা। ফুল যেমন অকাতরে গন্ধ দেয়, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, রমণীও তেমনি অকাতরে ভালবাসে, স্বার্থ খুঁজে না। রমণীই যথার্থ ভালবাসিতে জানে। শৈবলিনী বুঝিয়াছিল যে অরুণকে ভালবাসিলে ইহ জগতে তাহার সুখ নাই। হৃদয়ের আলম্বন-বল হৃদয়, সে সে আলম্বন পাইবে না। সে জানিত না অরুণ তাহাকে সে ভালবাসার প্রতিদান দিবে কি না, উহা দিনেকের তরেও সে চায় নাই বা জানিতে ইচ্ছা করে নাই। শৈবলিনীর ভালবাসিয়াই সুখ, তাই শৈবলিনী প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। সে জানিত মথিত-হৃদয়-সাগরে যে হলাহল উঠিয়াছে তাহা তাহার কাল-স্বরূপ। ক্ষতি কি? শৈবলিনী প্রাণ ভরিয়া তাহাই পান করিতে লাগিল। সুরভী-কুসুম যেমন কীটে কাটে, শৈবলিনীর হৃদয়ও কাটিতে লাগিল, তবু শৈবলিনী অভাগিনী প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।

নীরদ-প্রেম—তুষানল, শৈবলিনী সেই আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল। দিনে দিনে শৈবলিনী কৃশাঙ্গী, ম্লান-কান্তি হইতে লাগিল, কিন্তু অধরে সে মৃদু হাসিটী গেল না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল, শৈবলিনী শয্যা-শায়িনী হইল। চঞ্চলা কায়মনে সেবা করে। শৈবলিনী নিশীথে ঘুমায় না। যে অল্প নিদ্রা আসে ক্ষণপরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহা ভঙ্গ হয়। একদিন শৈবলিনী সন্ধ্যার পর নিদ্রা যাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শৈব-

লিনী নিস্পন্দভাবে শয্যার সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে। স্নেহ-ময়ী ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া সুরেন্দ্রের চক্ষে জলধারা বহিল। কিছুক্ষণ পরে শৈবলিনীর অধর কম্পিত হইতে লাগিল ; কি যেন বলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে শৈবলিনী বলিল—"আর একবার মাত্র দেখাও, একবার মাত্র নয়ন ভরিয়া দেখি। এ দারুণ তৃষ্ণা এ জন্মে মিটিল না, একবার দেখাও প্রাণ ভরিয়া দেখি।" শৈবলিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—পার্শ্বে চঞ্চলা, সম্মুখে সুরেন্দ্র রোদন করিতেছে। শৈবলিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "দাদা, কাঁদিতেছ কেন? আমি আবার শীঘ্রই ভাল হইব।"

এই বলিয়া কি জানি কেন শৈবলিনীও আর চক্ষের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তখন সুরেন্দ্র শৈবলিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বাহিরে আসিয়া অরুণকে একবার মাত্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন।

ইহার দুই দিন পরে, শৈবলিনী শয্যার উপর বসিয়া চাঁদের আলোয় চঞ্চলার চুল বাঁধিয়া দিতে ছিল। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—"চঞ্চল, তোর সেই কবিতাটী মনে আছে?"

চ। কোন্‌টী?

শৈ। "চিরদিন পিপাসায়—"

চঞ্চলা কবিতাটী বলিতে লাগিল। চঞ্চলা যদি দেখিতে পাইত যে শৈবলিনীর চক্ষে জলধারা বহিতেছে তাহা হইলে আর বলিত না। চুল বাঁধা শেষ হইল, কবিতা বলাও শেষ হইল। পরিশ্রম বশতঃ নিতান্ত ক্লান্ত বোধে শৈবলিনী শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল—অরুণ আসিয়াছে। সুরেন্দ্র চঞ্চলাকে ডাকিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বলিলেন। কক্ষমধ্যে কেহই রহিল না। নিঃশব্দে অরুণ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈবলিনী স্ফুট-চন্দ্রা-

লোকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে অরুণের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। পরে নয়ন আপনা হইতে মুদিয়া আসিল—আর উন্মীলিত হইল না। পবন-তাড়িত-চঞ্চল-দীপ-রশ্মি সেই মৃত্যু-ছায়াঙ্কিত মলিন মুখের উপর ক্রীড়া করিতে লাগিল!

সুরেন্দ্রের গৃহে যে কনক-প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা এত দিনে নির্ব্বাণ হইল!

শৈবলিনী মরিল। ভগ্ন-হৃদয়া সন্তাপিনী প্রণয়-মন্দিরে প্রাণ বলি দিল। অকালে কুসুম শুকাইল।

শৈবলিনীর প্রণয় কখন বাক্যে স্ফূর্ত্তি পায় নাই। হৃদয়ে যে পাবক-শিখা জ্বলিতেছিল তাহাতে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল—শৈবলিনীব মরিয়াই সুখ। শমন নিষ্ঠুর নয়। এ দুঃখ-সাগরে সেই একমাত্র কাণ্ডারী। মৃত্যু বিধাতার সকরুণ সৃষ্টি। অবোধ মানব আপনার চিত্তে আপনি তুষানল জ্বালে, এ সুধা না থাকিলে চিরদিন জ্বলিতে হইত। মানবের জীবন দুঃখের স্বপ্ন। বিধাতা অকরুণ নয়—সে স্বপ্ন চিরদিন থাকে না। ঈশ্বর করুণাময়—তাই এ মরু-ভূমির সীমা আছে। এ দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিবার মৃত্যু একমাত্র পথ। দুঃখের আগার বৈ কি?—জগতে সুখ কোথায়? জীবনের প্রথম হইতে শেষ অঙ্ক অবধি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ—দেখিবে—কেবল বাত্যা-বৃষ্টি, কেবল দীর্ঘ-শ্বাস, আঁখি জল। বালক ও বৃদ্ধের চিত্ত তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে—করি-পদ-বিদলিত পদ্মবন, কান্তি-বিরহিত সৌরভ-বিহীন কুসুম। দেখিবে সে শ্যাম-পাদপ-ছায়া-বিরাজিত উদ্যান এখন—বিকট যুদ্ধ-ক্ষেত্র। পলাশী-প্রাঙ্গণ বা কুরুক্ষেত্র ইহাপেক্ষা ভীষণতর দেখিবে না। দেখিবে ইন্দ্রের আলয় দৈত্যের বাস-গৃহ, দেবের মন্দির শবের শ্মশান।

এ চিত্ত-বিনিময়ে কি সুখ? নয়ন-পূর্ণ অশ্রুজল আছে, বসিয়া বসিয়া স্মৃতিমূলে সিঞ্চন করিতে থাক। তাই বলি শমন নিষ্ঠুর নয়—মৃত্যু বিধাতার সকরুণ সৃষ্টি। জীবনে সুখ নাই—তাই শৈবলিনীর মরণে সুখ।

যে দিন শৈবলিনী মরিল—সে দিন হইতে অরুণ কোথায় গেল, স্থির হইল না।

তার পর সুরেন্দ্র আর চঞ্চলা। সেই বিজন-কুটীরের বিষাদিনী বালা এখন কিশোর-বয়স্কা—বসন্তের স্ফুটনোন্মুখ গোলাপকলি, শরতের অমল জ্যোৎস্না। বহুদিন একত্র সহবাসে দুই জনের হৃদয়ে স্নেহবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। অবশেষে দুইটী হৃদয় পরস্পর এরূপ আবদ্ধ হইল যে একটী ছিন্ন করিতে গেলে অপরটী বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুরেন্দ্র চঞ্চলাকে বিবাহ করিলেন—চঞ্চলা সুখী হইল, পূর্ব্বভাব সব ভুলিল কিন্তু শৈবলিনীকে ভুলিল না।

প্রজা-বৎসল সুরেন্দ্রের প্রজাদল সব সুখে সুখী। বহুদিন পরে, সুরেন্দ্রের একটী পুত্র জন্মিল—সুরেন্দ্রের সংসার আবার হাসিল। তাঁহার সংসারে সবাই সুখী—কেবল শৈবলিনী মরিল—কেন না বঙ্গবিধবার মরণেই সুখ। পদতলে বিদলিত হইবার জন্য যার সৃষ্টি তার বাঁচিয়া সুখ কি!

মনে করি পূর্ব্বকথা স্মরিবনা আর।

"অহহ হৃদয়মর্ম্মচ্ছিদঃ খলমী কথোপঘাতাঃ।"

১

মনে করি পূর্ব্ব কথা স্মরিব না আর,
স্মরিলে পূর্ব্বের দুঃখ, বিদরিয়া যায় বুক,
অনর্গল বহে নেত্রে শোক-জলধার,
আঁধার এ পোড়া চক্ষে হেরি রে সংসার।

২

সর্ব্বক্ষণ সেই দিন জেগে উঠে মনে,
হৃদয়ে উল্লাসোচ্ছ্বাস, বদনে সলজ্জ হাস,
প্রথম মিলন যায় নয়নে নয়নে,
রোপণ প্রণয়-বীজ, বৃথা শুভক্ষণে!

৩

অঙ্কুরিল প্রেম-তরু বিচিত্র কেমন,
ভাব-কাণ্ড দেখা দিল, সুখ-শাখা প্রকাশিল,
নব নব সাধ-পত্র তাহে সুশোভন,
আশা-লতা দৃঢ় বাঁধে করিল বন্ধন।

৪

অকস্মাৎ কাল-মেঘ, অদৃষ্ট-আকাশ
আচ্ছাদিল ঘোরতর, করি মহা আড়ম্বর,
বহিল প্রলয় ঝড়, করি সর্ব্বনাশ,
ভাঙ্গিল সুচারু-তরু, ছিন্ন লতাপাশ।

৫

নিরাশ্রয় প্রাণ-পাখী হইল চঞ্চল,
ভাঙ্গিল সাধের বাসা, ঘুচিল সুখের আশা,
হৃদয়ে দারুণ জ্বালা রহিল কেবল :—
নাহি কি করুণা স্বর্গে নিভাতে অনল ?

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তার।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহম্মদের জন্ম—অলৌকিক ঘটনাবলি—পিতার মৃত্যু—মহম্মদের স্থানান্তরে গমন ও মাতার ইহলোক পরিত্যাগ।

মহম্মদ ৫৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ খোরিস বংশোদ্ভব স্বদেশ-হিতৈষী বরণীয় আবদুল মোতালেব, মহম্মদের পিতামহ। ইঁহার অনেকগুলি সন্তান, তন্মধ্যে আবদুল্লা সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। আবদুল্লার সৌন্দর্য্য অসামান্য; অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন কমনীয় মুখশ্রী সহজেই যৌবন-ভারাবনতাঙ্গী কামিনীগণের মনোহরণে সমর্থ হইত। কিম্বদন্তী আছে, যে রাত্রে তিনি আমিনার পাণি-পীড়ন করেন, বিজাতীয় ক্ষোভ ও ঈর্ষায় ভগ্নহৃদয় হইয়া শত শত আরব-যুবতী সেই রাত্রেই ইহলোক পরিত্যাগ করে। ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা আমরা বলি না, কিন্তু আবদুল্লা যে একজন সুপুরুষ সুরসিক যুবা ছিলেন এই প্রবাদটী দৃঢ়রূপে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। মহম্মদ ইহাদের

একমাত্র তনয়—সহোদর বা সহোদরা মহম্মদের কিছুই ছিল না, তথাপি তিনি তাঁহার পিতামাতার "আদুরে ছেলে" হইতে পারেন নাই। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ তখনও জীবিত, তথাপি শৈশবে তাঁহার ভাগ্যে আদর ঘটিয়া উঠে নাই। সকলের অঙ্কে অঙ্কে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিত না। অতি শৈশব কাল হইতেই তিনি দুঃখ-যন্ত্রনার কঠোর হস্তে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এ সকল বিষয় পরে বিবরিত হইবে।

কল্পনার প্রিয় সন্তান মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মহম্মদের জীবন-চরিত এমনই জটিল ও সংখ্যাতীত অমানুষিক ক্রিয়া কলাপে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন যে তৎসমুদায় ভেদ করিয়া প্রশুদ্ধ সত্যগুলি বাছিয়া বাহির করা যৎপরোনাস্তি সুকঠিন। এখন এই বিজ্ঞান-প্রধান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনুষ্যগণ যে-সে কথায় বড় একটা আস্থা প্রদর্শন করেন না। "আমি আছি" অতি পণ্ডিত দার্শনিকগণ তর্ক বিতর্কের পরও যখন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ-সংসারকে যখন কল্পনা (Idea) বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন; ঈশ্বর যাঁহার অপার করুণা ও স্নেহে সুরক্ষিত হইয়া মনুষ্য হইতে অতি ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণ সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে, যাঁহার সুন্দর মঙ্গলমূর্ত্তি সময়ে সময়ে হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার ক্রিয়া সমূহ আমাদিগের সম্মুখে নিত্য সম্পাদিত হইতেছে, অগণ্য গ্রহ উপগ্রহ, লক্ষ লক্ষ চন্দ্র সূর্য্য, অসীম আকাশ, অগাধ অতলস্পর্শ সমুদ্র, দুর্দ্দমনীয় ভীম প্রভঞ্জন ও পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম সমস্ত সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ সমূহ সমোচ্চৈঃস্বরে যাঁহার অগাধ অনন্ত শক্তির নিয়ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; দয়া-প্রেম-স্নেহ-ভক্তি-মণ্ডিত মনের

অস্তিত্ব যাঁহার অস্তিত্বের একটী অকাট্য প্রমাণ; যাঁহার প্রেম হিরকখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট অশেষ বিক্রমশালী সম্রাট হইতে সামান্য পর্ণ-কুটীর-বাসী দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত সকল স্থানে সকল সম্প্রদায় মধ্যে সমানভাবে বিরাজিত রহিয়াছে, অধিক কি, যাঁহার এক পলকের ইঙ্গিতে কোটি কোটি বিশ্ব সৃজিত ও লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন অনেকের সংশয়, তখন যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত মহম্মদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সমূহ অক্ষুব্ধচিত্তে সুধীর পাঠকগণ গ্রহণ করিবেন এ চিন্তা হৃদয়ে আমরা কখনই স্থানদান করিতে পারি না। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক অনৈসর্গিক অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাবলিই হউক বা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের স্বকপোল-কল্পিত সৃষ্টিছাড়া বর্ণনাই হউক, আমরা মহম্মদ সম্বন্ধে যতদূর জানি, লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধে অনেক যুক্তি-বিরুদ্ধ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিলেও আমরা তজ্জন্য দায়ী নহি।

মহম্মদ-জননী আমিনা, পুত্র প্রসব কালীন কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করেন নাই। যখন মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন সন্নিহিত গ্রাম জনপদ প্রভৃতি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকিত হইয়া উঠিল, অভিনব কান্তি বিভূষিত হইয়া যেন অনুপম আনন্দভরে হাসিতে লাগিল। মহম্মদ তখনই করযোড়ে আকাশ পানে চাহিয়া তারস্বরে কহিলেন "ঈশ্বর মহান্ ও অদ্বিতীয়, আমি তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ"। অনতিবিলম্বে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল, অতলস্পর্শ সোয়ারমা হ্রদ নিমেষ মধ্যে বারিশূন্য হইয়া পড়িল, টাইগ্রাসনদের সলিলরাশি সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ প্লাবিত করিল, পারস্য রাজের সুদৃঢ় আসন টলিল, দেখিতে দেখিতে হস্তস্থিত রাজদণ্ড স্খলিত-

ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিল, মেজিয়গণ দেবতাজ্ঞানে যে অগ্নিকে সহস্রাধিকবর্ষ যত্ন সহকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হইল, আচম্বিতে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সমুহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইল। মক্কাবাসিগণ ভয়-বিহ্বল-চিত্তে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আমিনার ভ্রাতা একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গণক, তিনি গণিয়া দেখিলেন "খোরিসবংশাবতংস এই নবজাত শিশু কালে সমগ্র ধরাকে কাঁপাইয়া তুলিবে, ইহার ভয়ে অধর্ম্ম পৃথ্বী ছাড়িয়া পলাইবে ও নব বিধান প্রচলিত হইবে"। জনক জননী ও বৃদ্ধ পিতামহ মোতালেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না, সমস্ত নগরী আনন্দে ভাসিতে লাগিল। শুক্ল পক্ষীয় নির্ম্মল সুধাংশুর ন্যায় মাতৃ ক্রোড়ে মহম্মদ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

আবদুল্লা পুত্র লইয়া অধিক দিন সুখী হইতে পারেন নাই। মহম্মদের জন্মগ্রহণের ন্যুনাধিক দুই মাস পরে, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মক্কার জলবায়ু সেই সময় অতিশয় দূষিত হইয়া উঠাতে পতি-বিয়োগ-বিধুরা, শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া আমিনা পীড়িতা হইয়া শীঘ্রই রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন। এখন সন্তানটীর উপায় কি হইবে, কে ইহাকে প্রতিপালন করিবে, এই ভাবনায় অবলা অস্থির হইয়া উঠিলেন। হেলেমা নাম্নী এক কৃষক-পত্নী সত্বর আসিয়া আমিনার ভাবনা বিদূরিত করিল—মক্কা হইতে স্বদেশে আনয়ন করিয়া যত্ন সহকারে শিশুটীকে লালন পালন করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! সে পর্ণকুটীর নাই, সে বিজন মরুভূমি নাই, হেলেমা স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া সকলই নুতন সকলই বিচিত্র দেখিল। স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় অবাক্ হইয়া কৃষকবালা দেখিল, তাহার জলশূন্য শুষ্ক কূপ ও সরোবর স্বচ্ছ সলিল পরি-

পূর্ণ ; তৃণ-শূন্য দিগন্তব্যাপী ঊষর ভূমিখণ্ড সকল হরিৎ বর্ণ তৃণ দলে সমাচ্ছন্ন, মেষ ও উষ্ট্র সকল দলে দলে তদুপরি সুখে বিচরণ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে অন্নের জন্য যে দরিদ্রা কৃষকবালা লালায়িত হইত আজ সে বাটীর কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল স্তরে স্তরে ধনধান্য তাহার গৃহে সজ্জীকৃত রহিয়াছে।

হেলেমার এক নিভৃত উদ্যানে একদা মহম্মদ মসরদ নামক অপর একটী সমবয়স্ক বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা বালক স্তম্ভিত নিস্পন্দ পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, স্থির ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শূন্য হইতে আচম্বিতে দুইটী স্বর্গীয় দূত সেই উদ্যানে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মণি-মুক্তাদি-বহুমূল্য-প্রস্তর-জড়িত, দেব-বিনির্ম্মিত অশেষ কারুকার্য্য-সুশোভিত স্বর্গীয় পরিচ্ছদ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হিরক খণ্ড সকল সূর্য্য-কিরণে ঝকমক করিতেছে, তাহাতেই তাঁহাদের অলোক সামান্য সুন্দর "হিরণ্ময় বপুর" সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইতেছে। দূত দ্বয়ের আকৃতি সমুদয়ই মনুষ্যের ন্যায়, কেবল স্কন্ধের দুই ভাগ হইতে দুইটী পক্ষ বহির্গত হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। মুখশ্রী— গম্ভীর অথচ চিন্তার অণুমাত্র চিহ্ন তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বালকের সম্মুখীন হইয়া যত্নসহকারে তাহাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন। গ্রেব্রিএল্ মহম্মদের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে আত্মাটীকে বাহির করিয়া লইলেন। স্বর্গীয়-সুনির্ম্মল-সলিল-বিধৌত পার্থিব যাবতীয় মলামালিন্যমুক্ত আত্মাকে অলোক সামান্য বিবিধ গুণ গ্রামে বিভূষিত করিয়া পূর্ব্ববৎ যথা-স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক দূতগণ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। মহম্মদ বিন্দুমাত্র শারীরিক কষ্ট অনুভব করেন নাই; তাঁহার মুখশ্রী অবি-

কতর প্রফুল্ল হইল, তিনি দিব্যজ্ঞানে সুস্পষ্ট দেখিলেন যে, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবার জন্যই তিনি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মসরদ অবাক্ হইয়া এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিত করিল। হেলেমা ও তাহার স্বামী সাশ্চর্য্যচিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে উদ্যানে নিশ্চয়ই প্রেতগণের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে এবং পাছে মহম্মদের কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া আমিনার হস্তে বালককে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

মহম্মদ অনেক দিনের পর মাতার স্নেহ পূর্ণ মুখ সন্দর্শন করিলেন। কিছুকাল মক্কায় বাস করিয়া আমিনা স্থানান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র সমভিব্যাহারে মেদিনা যাত্রা করিলেন। আমিনা পথে পীড়িতা হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মেদিনার নিকটবর্ত্তী আবোয়া নামধেয় একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার মৃত-দেহ সমাহিত করিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ মহম্মদকে তদীয় অশীতিপরবৃদ্ধ পিতামহ মোতালেবের হস্তে অর্পণ করিয়া আসিলেন। মহম্মদের বয়ঃক্রম এক্ষণে ছয় বৎসর মাত্র, পিতামহ ও জরাগ্রস্ত—কোন্ দিন যে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া বৃদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুতালিবকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বান করিয়া বালকটীর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভার তদীয় হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মহম্মদ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত আবুতালিবের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জীবন বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জীব মাত্রই এক প্রকার পদার্থ নির্ম্মিত এবং এক প্রকার আকার হইতে উদ্ভূত। অতঃপর জীবগণের যে প্রণালী ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হয় পর্য্যালোচিত হইতেছে। বংশ বৃদ্ধি দ্বিবিধ—অসাঙ্গমিক (**Asexual**) এবং সাঙ্গমিক (**Sexual**)। এই বিষয়েও জীবের এবং উদ্ভিদের সাদৃশ্য আছে। কোন বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা কর্ত্তন করিয়া রোপণ করিলে প্রত্যেক শাখা এক একটী বৃক্ষে পরিণত হয়। ইহা উদ্ভিদের অসাঙ্গমিক বংশ বৃদ্ধি। উদ্ভিদের সাঙ্গমিক বংশ বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে পুষ্পস্থিত সূক্ষ্ম সূত্রাকার অংশ সমূহকে কেশর বলে। কতকগুলি কেশর স্ত্রীজাতীয় এবং কতকগুলি পুরুষ জাতীয়। কেশর অবলম্বন করতঃ পুষ্প সকল কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে সকল পুষ্পে দ্বিজাতীয় কেশর দৃষ্ট হয় তাহাদের উভয় লিঙ্গ (**Hermaphrodite**) এবং যে সকল পুষ্পে কেবল এক জাতীয় কেশর অবস্থিতি করে তাহাদের একলিঙ্গ (**Declinous**) বলে। একলিঙ্গ পুষ্প সুতরাং দ্বিবিধ—পুরুষ জাতীয় ও স্ত্রী জাতীয়। যে সকল কেশরের উপরিভাগে পরাগ (**Pollen**) অর্থাৎ এক প্রকার ধূলার ন্যায় পদার্থ থাকে তাহারা পুরুষ জাতীয় এবং যে সকল কেশরের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ক্ষত এবং ডিম্বাণ্বাকার তাহারা স্ত্রীকেশর। বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পরাগ ডিম্বাণুতে পতিত হইলে পুষ্পের গর্ভ হয় এবং অবশেষে ডিম্বাণু বিদীর্ণ হইয়া জীবোৎপত্তি হইয়া থাকে।

অতএব সাঙ্গমিক প্রণালী জীবের ও উদ্ভিদের যে একই প্রকার তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। এস্থানে কেবল মাত্র বক্তব্য যে সকল উদ্ভিদ পৌষ্পিক (flowering) নহে। সুতরাং অপৌষ্পিক (flowerless) উদ্ভিদের উৎপত্তি বিধানে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে।

জীবের অসাঙ্গমিক বংশবৃদ্ধি কেবল নিম্ন শ্রেণীস্থ কতিপয় জীবের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। পুরুভুজ (polype) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব আছে, তাহাকে যত ভাগে কর্ত্তন করা যায় প্রত্যেক অংশ হইতে এক একটী সম্পূর্ণ পুরুভুজ উৎপন্ন হয়। কৃষক দিগের নিকট অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন যে ধান্যে খড়্কা (aphis) হয়। ঐ খড়্কা এক প্রকার পতঙ্গ এবং নবোৎপন্ন শস্য রাশিতে অসংখ্য পরিমাণে পতিত হইয়া অতিশয় অনিষ্ট করিয়া থাকে। উহারা জন্মেন্দ্রিয় বিহীন কিন্তু তাহাদের শরীর হইতে অতি সূক্ষ্ম বালুকণার ন্যায় ডিম্বাণু নির্গত এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া পতঙ্গে পরিণত হয়। এবম্প্রকার উদ্ভূত পতঙ্গ হইতে পুনরায় অনেক পতঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বিশারদ স্পলাঞ্জিনী (Spallanzini) শম্বুক ইত্যাদি সামুদ্রিক কতিপয় ক্ষুদ্র জীব লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একটী শম্বুককে যত খণ্ডে বিভক্ত করা যায় প্রত্যেক অংশ হইতে এক একটী সম্পূর্ণ শম্বুক উৎপন্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিরঃ বিচ্ছিন্ন করিলে শিরঃ হইতে দেহাদি এবং দেহের কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া লইলে সেই অংশ হইতে মস্তকাদি সমুদয় উদ্ভূত হইয়া থাকে।

পুরুষ জাতীয় জীবের শরীর হইতে রেতঃ স্ত্রী জাতীয় জীবের অণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবের সাঙ্গমিক জন্ম হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, রেতঃ এক প্রকার কীটাণুময় পদার্থ, নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ কীটাণু জীবিত থাকিলে শুক্রতে সন্তা-

নোৎপাদিকা শক্তি থাকে। বিবিধ রোগ দ্বারা ঐ কীটাণু জীবনশূন্য হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত শক্তির লোপ হয়। সাঙ্গমিক জন্ম একটী প্রবল নিয়মাধীন। যে জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে যে জীবের জন্ম হয়, ঐ জীব উক্ত জাতীয় জীবের শরীর গঠনাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অসাঙ্গমিক জন্মে উক্ত ব্যত্যয় অল্প পরিমাণে হয়। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে দুপাটীর বীজ রোপণ করিলে যদিচ অধিকাংশ তরুর পুষ্প দ্বিবর্ণ হয় বটে কিন্তু এক একটী তরু হইতে কেবল এক বর্ণের পুষ্প নির্গত হইয়া থাকে। সাঙ্গমিক জন্মে যে সাধারণতঃ ব্যত্যয় লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা তাহা পূর্ব্ববৎ (apriori) তর্ক দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে। পুরুষের এবং স্ত্রীর কিয়দংশ লইয়া জীবের উৎপত্তি হয় সুতরাং পিতার অথবা মাতার অবয়ব সম্যক প্রকারে প্রাপ্তি না হইবার সম্ভাবনা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারাও ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে। মানব জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার পিতার ন্যায় এবং কোন ব্যক্তি তাহার মাতার ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট, দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ ব্যক্তির কোন কোন অঙ্গ তাহাদের পিতার সদৃশ, কোন কোন অঙ্গ তাহাদের মাতার সদৃশ হইয়া থাকে এবং অনেকের সমুদয় অবয়ব অন্য প্রকার দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে উক্ত ব্যত্যয়ের বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গর্দ্দভ এবং অশ্বার সঙ্গমে অশ্বতর নামক এক প্রকার জীবের এবং অশ্ব ও গর্দ্দভীর সঙ্গমে হিনী (Hinny) নামক এক প্রকার জীবের উৎপত্তি হয়। অশ্বতরের মস্তক, কর্ণ, পদ এবং ক্ষুর গর্দ্দভের সদৃশ এবং অন্যান্য অঙ্গ অশ্বার সদৃশ।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অশ্বতরের যে অঙ্গগুলি গর্দ্দভের ন্যায়, হিনীর সেই সকল অঙ্গ অশ্বের ন্যায়।

অতঃপর জল, বায়ু, আহারাদি ও কার্য্যের ভিন্নতা নিবন্ধন ব্যত্যয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি শীতাতিশয় দেশে বহু কাল বাস করিলে তাহার বর্ণের শ্যামলতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায় এবং গ্রীষ্ম-প্রবল স্থানে শ্বেতবর্ণ ব্যক্তি কয়েক বৎসর বাস করিলেই তাহার বর্ণের মলিনত্ব দৃষ্টি গোচর হয়। নৌকা-বাহক গণের হস্তপেশী সাধারণ লোকের হস্তপেশী অপেক্ষা দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা। আহারের প্রভেদ বশতঃ অবয়বের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয় সভ্য জাতির সহিত অসভ্য বনবাসীদের তুলনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। চুটিয়া নাগপুর প্রদেশের অন্তর্গত পলামু নামে একটী পরগণা আছে। ঐ অঞ্চলে কোড়া আখ্যায় এক প্রকার বন্য জাতি বাস করে। তাহারা অপক্ক শস্য ও মাংস সাধারণতঃ আহার করিয়া থাকে। তাহাদের চর্ম্ম স্থূল, মুখছিদ্র বৃহৎ এবং দন্ত সমূহ সুদীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র। পশু জাতিতে ঐ লক্ষণাদির বৈষম্য দৃষ্ট হয়। অপরঞ্চ বিস্ময়ের বিষয় এই যে মানব জাতির সভ্যতার সহিত উক্ত লক্ষণ সমূহের উপশমতা ঘটে। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে চর্ম্মের স্থূলত্ব, মুখছিদ্রের বৃহত্ত্ব, দন্তের সুদীর্ঘতা এবং সূক্ষ্মাগ্রতা আহারাদির উপর অনেক নির্ভর করে। মানব জাতি পশু জাতির ন্যায় আহারাদি করিলে পশু জাতির অবয়ব কিছু পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। অতএব পশু জাতির অবয়ব হইতে মানব জাতির অবয়বের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে আহারাদি জনিত। জীবোৎপত্তি বিষয়ক মীমাংসার্থ উক্ত সিদ্ধান্ত অতীব গুরুতর কিন্তু জীবন বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিতগণের মধ্যে তদ্বিষয়ের আলোচনা সম্যক্ প্রকারে হয় নাই।

জল, বায়ু, আহারাদি জনিত জীবের শরীর গঠনের যে পরিবর্ত্তন হয়, বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে অস্বাভাবিক ব্যত্যয় (**Artificial variation**) বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক কোন পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নহে। যে সকল ব্যত্যয় জীবের নিজ নিজ কার্য্য নিবন্ধন ঘটে তাহাকে অস্বাভাবিক এবং যে সকল পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না তাহাকে স্বাভাবিক (**Natural variation**) ব্যত্যয় বলিয়া উল্লেখ করা যায় মাত্র। স্বাভাবিক ব্যত্যয় অসংখ্য পরিমাণে হইতেছে কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহার বিধিমত অনুসন্ধান অদ্যাবধি হয় নাই। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিপথে ঐ রূপ ব্যত্যয় উপস্থিত হইলে তাহারা যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবন বিজ্ঞান নূতন শাস্ত্র। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক জীবন-বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধানী। তাঁহাদের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে সম্যক্ পরীক্ষা হইতে পারে নাই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যতদূর হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্ভূত মেসাচুসেটস্ প্রদেশে সেতরাইট নামক একজন মেষ ব্যবসায়ী ছিল। ঐ অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন কৃষক-গণের ক্ষেত্র অনুচ্চ বৃতি দ্বারা বেষ্টিত থাকায় মেষ সকল বৃতি উল্লঙ্ঘন করিয়া অনায়াসে ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষিগণের শস্যের অনিষ্ট করিত। তজ্জন্য প্রতিবাসিগণের সহিত রাইটের সর্ব্বদা বিবাদ হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে অর্থ-দণ্ড দিতে হইত। সুতরাং মেষ সকল যাহাতে বৃতি উল্লঙ্ঘন করিতে না পারে, রাইট তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। রাইট দেখিল যে তাহার মেষের মধ্যে যে সকলের পদ চতুষ্টয় বক্রাকার তাহারা বৃতি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। এমতে সে ব্যক্তি অন্য প্রকার সমস্ত মেষ বিক্রয়

করিয়া দিয়া বক্রপদ মেষ পুষিতে লাগিল। বক্রপদ মেষের সন্তান সন্ততির বক্রপদ হইয়াছিল এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে ঐ প্রকার স্বতন্ত্র মেষ সমূহে উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বাঞ্চল পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

অনেক প্রকার কুক্কুর জাতি দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সকল প্রকারই যে এক প্রকার হইতে স্বাভাবিক ব্যত্যয় নিবন্ধন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কুক্কুরের সঙ্গমে নুতন প্রকার কুক্কুর উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। কোন প্রকার কুক্কুর মার্জ্জার অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং কোন কোন প্রকার প্রায় দ্বীপীর ন্যায় বৃহদাকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুক্কুরের দন্ত বিন্যাস এবং মস্তকাস্থির ও অন্যান্যাস্থির অবয়বে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে।

অনেকেই জানেন যে কপোত জাতি শতাধিক প্রকারে বিভক্ত, কিন্তু মনোযোগ সহকারে সকল প্রকার কপোতের গঠনাদি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে সমুদয় প্রকার, কেবল লক্কা, পরপন, সেরাজু, ও গিরিবাজ এই চারি প্রকার হইতে উদ্ভব হইয়াছে। লকার পাদদ্বয় অতি খর্ব্ব ও চঞ্চু ক্ষুদ্র কিন্তু ইহার পুচ্ছ অতি বৃহৎ এবং ত্রিশ হইত চল্লিশটা পালক বিশিষ্ট। লক্কা প্রায় পুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখে। পরপনের চঞ্চু গলা ও পক্ষ সুদীর্ঘ, মস্তক ক্ষুদ্র এবং চক্ষুর উপরিভাগ উন্নত। সেরাজুর পদ-দ্বয় ও চঞ্চু সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। এই প্রকার কপোত গলার নলী অত্যন্ত স্ফীত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে গলাফুল বলিয়া থাকে। গিরিবাজ আকাশ মার্গে উড়িতে উড়িতে ডিগ্‌বাজী দেয়। ইহা ঐ তিন প্রকার কপোত অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বিশেষতঃ ইহার চঞ্চু ও পদদ্বয় নিতান্ত খর্ব্ব। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কপোতের বাহ্যাকারে যে তারতম্য আছে তাহা দৃষ্টি মাত্রেই উপলব্ধি হয় কিন্তু তাহাদের শরীর গঠনেও বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। অল্পায়াসে সকলেই

তাহা নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, কারণ সর্ব্বস্থানেই অনেক প্রকার কপোত পাওয়া যায় এবং ব্যয় ও অধিক নহে। পরীক্ষা করিলে জ্ঞাত হইবেন যে মস্তকাস্থি, মুখের অস্থি, জিহ্বা, পার্শ্বাস্থির সংখ্যা ও বিন্যাস, ও বক্ষাস্থির অবয়ব, দীর্ঘতা ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কপোতের অনেক বৈষম্য আছে। ফলতঃ কপোত জাতিতে স্পষ্ট প্রমিত হইতেছে যে এক জাতীয় জীবের মধ্যে যে বিবিধ প্রকার জীব দৃষ্ট হয় তাহাদের বাহ্যাকারের এবং শরীর গঠনের এমন কোন অংশ নাই যাহার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। এক জাতীয় জীব সমূহের বাহ্যাকারে ও শরীর গঠনে প্রথমতঃ কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। প্রকৃতির কোন গূঢ় কারণ নিবন্ধন এক জাতীয় জীবের মধ্যে একটী জীব ব্যত্যয় বিশিষ্ট হইলে তদ্দ্বারা ঐ বৈষম্য পরিরক্ষিত হইয়া এক স্বতন্ত্র প্রকার দৃষ্ট হয়। এক জাতীয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবের সঙ্গমে একটী পৃথক প্রকারের উদ্ভব হয়। এই রূপে এক জাতীয় বিবিধ প্রকার জীবের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা কপোত পুষিয়া থাকেন তাঁহারা এই বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বিখ্যাত রিয়ুমর নামক প্রকৃতিতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতবর বলেন যে মাণ্টাদ্বীপে গ্রেসিয়া কেলিয়া নামে এক ব্যক্তির প্রত্যেক হস্তে ও পদে ছয়টা করিয়া অঙ্গুলি ছিল। সে সাধারণ অঙ্গ বিশিষ্টা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাহার গর্ভে ও কেলিয়ার ঔরসে সন্তান চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। প্রথম পুত্র সলভেটরের পিতৃবৎ প্রত্যেক হস্তে ও পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি ছিল। দ্বিতীয় পুত্র জর্জের হস্তে ও পদে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলি হয় কিন্তু পঞ্চমাঙ্গুলি বিকৃতাকার ছিল। তৃতীয় পুত্র আন্দ্রির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন ব্যত্যয় ছিল না। চতুর্থ মেরী নাম্নী কন্যার প্রত্যেক হস্তে ও পদে পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি ছিল কিন্তু প্রত্যেক বৃদ্ধাঙ্গু-

লিতে ষষ্ঠাঙ্গুলির চিহ্ন ছিল। কেলিয়ার সন্তানগণ উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করে। যাহাদের সহিত বিবাহ হয় তাহাদের শরীর গঠনে কোন ব্যত্যয় ছিল না। সলভেটরের তিন পুত্র এক কন্যা হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের হস্তে ও পদে কোন বিকৃতির চিহ্ন ছিল না, অন্যান্য সন্তান তাহাদের পিতামহের সদৃশ হইয়াছিল। জর্জের তিন কন্যা এবং এক পুত্র হয়। প্রথম দুই কন্যা পিতামহের ন্যায় হয়। তৃতীয়া কন্যার দক্ষিণ হস্তে ও পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি এবং বাম হস্তে ও পদে পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি হইয়াছিল কিন্তু জর্জের পুত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। আন্দ্রির সন্তানগণের শরীর গঠনে কোন ব্যত্যয় ছিল না। মেরীর ও চার সন্তান হয় কিন্তু তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ও পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি ছিল।

উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে জীবের শরীর গঠনে কোন প্রকার ব্যত্যয় হইলে, ঐ ব্যত্যয় উপশম হইবার বিশেষ কারণ সত্বেও, প্রকৃতি তাহা যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া থাকে এবং সেই জীব হইতে উক্ত ব্যত্যয় বিশিষ্ট জীবগণের উৎপত্তি হয়। যদিচ কেলিয়ার হস্তে ও পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি ছিল কিন্তু তাহার স্ত্রীর সেরূপ ছিল না। ইহাতে আপাততঃ আশা করা যাইতে পারে যে তাহার চারি সন্তানের মধ্যে দুই জনের ঐ প্রকার অঙ্গ ব্যত্যয় হইবে এবং কেলিয়ার দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণের মধ্যে তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উক্ত ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা কিন্তু ফলতঃ তাহার বিপরীত ঘটনা হইয়াছিল। প্রকৃতির এই ব্যত্যয় রক্ষা নিয়ম জীবোৎপত্তি বিষয়ক অনুশীলনে বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

নিম্ন জাতীয় প্রাণিগণের মধ্যে এ নিয়মের উদাহরণ অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কতিপয় বিবরণ প্রকটিত হইল।

শব্দ শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে বর্ণোৎপত্তির বিষয় লিখিত হইতেছে। আত্মা স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থ তদভিব্যঞ্জক শব্দ নিষ্পাদনের জন্য মনকে নিযুক্ত করে। মন এই প্রকারে প্রেরিত হইয়া মূলাধারস্থিত অগ্নি বিশেষকে চালিত করিলে, তত্রত্য বায়ু স্ফীত ও বিচলিত হয়। সেই বিচলিত ও স্ফীত বায়ু ক্রমান্বয়ে চারিটী স্থলে গমন পূর্ব্বক প্রতিহত হইয়া চারি প্রকার শব্দ উৎপাদন করে, তন্মধ্যে মূলাধারে যে অতি সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে পরাবাক্ বলে। বায়ু অগ্নি সংযোগে স্ফীত ও লঘু হইলে যে উন্মার্গ-গামী হয় ইহা অনেকেই অবগত আছেন। অতএব বায়ু মূলাধারস্থিত অগ্নি সংযোগে লঘু হইয়া নাভিদেশে গমন পূর্ব্বক তদ্দেশ সংযোগে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা পশ্যন্তী নামে কথিত হয়। অনন্তর সেই বায়ু হৃদয়-দেশ পর্য্যন্ত লব্ধপ্রসর হইয়া মধ্যমাবাক্ উৎপাদন করে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকার শব্দ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেই হেতু আমরা শুনিতে পাই না। ইহারা কেবল ঈশ্বর, দেবতা অথবা যোগিগণের শ্রুতি গোচর হয়, তবে স্বকর্ণ আবরণ পূর্ব্বক মধ্যমাবাক্ শ্রবণ করিলেও করিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত বায়ু গলবিল মার্গে নির্গত ও মূর্দ্ধাদেশে আহত হইয়া পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক কণ্ঠ প্রভৃতি অষ্টস্থান-সংযোগে যে শব্দ উৎপাদন করে তাহা বৈখরীবাক্ নামে প্রসিদ্ধ। এই বর্ণাত্মিকা বৈখরীবাকই আমাদের স্বাভিপ্রায় আবিষ্করণের অদ্বিতীয় সাধন (৪)।

[৪] আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনোযুঙক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥

যথা। " চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি,
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি,
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি——চত্বারি পদ জাতানি নামাখ্যাত নিপাতোপসর্গাখ্যানি,

তানি * * * * * * —— * * * * * * * * * * * *

গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি——গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি, ন চেষ্টয়ন্তে ন নিমিষন্তী-ত্যর্থঃ

তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি——তুরীয়মেতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু লোকেষু বর্ত্ততে চতুর্থ মিত্যর্থঃ "
ইতি মহাভাষ্যে।

সোদীর্ণোমূর্দ্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্র্মাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগো পঞ্চধামতঃ॥
ইত্যাদি শিক্ষা গ্রন্থে।

প্রাণাপানান্তরে দেবি! বাগ্ বৈ নিত্যং হি তিষ্ঠতি।
স্থানেষু বিকৃতেবায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরীবাক্ প্রয়োক্তৄনাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধিনী।
কেবলং বুদ্ধ্যুপাদানা ক্রমরূপানুপাতিনী।
প্রাণবৃত্তিমনুক্রম্য মধ্যমাবাক্ প্রবর্ত্ততে।
অবিভাগা তু পশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা।
স্বরূপজ্যোতিরেবাতঃ পরাবাগানপায়িনী।
ইতি ভারতে।

নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ ভেদে যেমন পদ চারি প্রকার, সেই রূপ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী ভেদে বাক্যও চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে তিনটী অচৈতন্য অবস্থায় গুহায় (অতি গুপ্তস্থলে অথবা পণ্ডিতগণের বুদ্ধিতে) নিহিত আছে অর্থাৎ তাহাদের সামান্যতঃ লৌকিক ব্যবহার নাই। মনুষ্যগণে যে ভাষা ব্যবহার করে তাহা চতুর্থ বৈখরী বাক্। বৈখরী বাকের এক একটী সূক্ষ্মতম অংশই বর্ণ। এই সমস্ত বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান সমুদয়ে আটটী মাত্র। ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত উচ্চারণ স্থান যথা কণ্ঠ, জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা ও বক্ষঃ (৫)। এখানে দন্ত শব্দে দন্তমূল বুঝিতে হইবে, নতুবা দন্তহীন ব্যক্তিরা দন্ত্য বর্ণোচ্চারণে অসমর্থ হইতেন। অ, আ, হ, ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; ক খ গ ঘ ঙ ইহাদের জিহ্বামূল; ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ইহাদের তালু; ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের মূর্দ্ধা; ঌ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের দন্ত; উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহাদের ওষ্ঠ। যম (কঁ খঁ গঁ ঘঁ) ঙ ঞ ণ ন ম অনুস্বার (ং) ইহারা জিহ্বামূল প্রভৃতির ন্যায় নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয়, অতএব ইহারা উভয় স্থানজ। উক্ত যমাভিধেয় কাঁদি বর্ণ চতুষ্টয় সংস্কৃত অথবা বঙ্গ ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের কেবল বৈদিক ভাষায় ব্যবহার হইয়া থাকে। বৈদিক ব্যাকরণ প্রাতিশাখ্যে এই সমস্ত বর্ণের সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। যদি বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ পরে থাকে তবেই

---

(৫) "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাং উরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌচ তালুচ"॥
ইতি শিক্ষাগ্রন্থে।

ক খ গ ঘ এই চারিটী বর্ণ নাসিকা হইতে উচ্চারিত হইয়া যম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় (৬)।

হকার, বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ (ঙ ঞ ণ ন ম) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণের (য র ল ব) সহিত সংযুক্ত হইলে, উরঃ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে উচ্চারিত হয়। একার ও ঐকারের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠতালু এবং ওকার ও ঔকারের কণ্ঠৌষ্ঠ। সংস্কৃত বৈয়াকরণ গণের মতে স্বর ও রকার ভিন্ন অন্তঃস্থ বর্ণ বিকল্পে নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয়। (৭)। সুতরাং একারাদি চারিটী স্বর এবং য ল ব এই আটটী বর্ণ অনুনাসিক পক্ষে ত্রিস্থানজ শব্দে অভিহিত হইতে পারে। আশ্রয় স্থানভাগী অযোগবাহ বর্ণ, বিসর্গ (ঃ) জিহ্বামূলীয় (≍) ও উপাধ্মানীয় (≍≍) ভেদে ত্রিবিধ। শেষোক্ত দুইটী, বিসর্গের প্রকার ভেদ মাত্র। যদি ক অথবা খ পরে থাকে তাহা হইলে বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়ের এবং প অথবা ফ পরে থাকিলে, উপাধ্মানীয়ের আকার ধারণ করে। এই দুইটীর বঙ্গভাষায় ব্যবহার নাই।

পাণিনিশিক্ষা অনুসারে সমুদায়ে বর্ণের সংখ্যা ত্রিষষ্ঠি অথবা চতুঃষষ্ঠি। বর্ণ সমূহের পরস্পর প্রভেদের কারণ না বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করিলে, পাঠকগণের বুঝিবার অসুবিধা হইবে, সেই হেতু অগ্রে বর্ণ ভেদের কারণ লিখিত হইতেছে। এই কারণ স্থান, বাহ্য প্রযত্ন, আভ্যন্তর প্রযত্ন, কাল ও স্বর ভেদে পাঁচ প্রকার।

---

(৬) " বর্গেষ্বাদ্যানাং চতুর্নাং পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্ব্ব সদৃশো বর্ণ প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ। পলিক্‌ক্নী "।——

ইতি সিদ্ধান্ত কৌমুদ্যাম্।

[৭] " অমোঽনুনাসিকো নহ্রৌ "।

শিক্ষা গ্রন্থে।

এই সমস্ত বর্ণ ভেদক কারণের মধ্যে উচ্চারণ স্থানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই একমাত্র উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ হইতে অ, আ, হ, তিনটী বর্ণ উচ্চারিত হয়। অপিচ অভিন্ন কারণ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত দুই বা ততোধিক বস্তুর উৎপত্তিই অসম্ভব। এই নিমিত্ত কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যানে হরিদাস ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যথা "——কার্য্যং বিচিত্র কারণবৎ, বিচিত্র কার্য্যত্বাৎ" অর্থাৎ যখন জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত নানাবিধ কার্য্যরূপ বস্তুজাত বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অবশ্যই এতাদৃশ জগতের নানাবিধ বস্তুর উৎপাদক নানাবিধ কারণও থাকিবে। যেহেতু একমাত্র কারণ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত একাধিক বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব অ আ হ এই বর্ণ ত্রয়ের উচ্চারণ বিষয়ে একমাত্র উচ্চারণ স্থান কণ্ঠই কারণ হইতে পারে না, অতএব অবশ্যই ইহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। সেই কারণ শিক্ষা গ্রন্থে প্রযত্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু ইহা উচ্চারণ কর্ত্তার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণোচ্চারণের যত্ন বৈ আর কিছুই নহে। এই যত্ন বা প্রযত্ন আভ্যন্তর ও বাহ্য ভেদে দ্বিবিধ। আদ্য প্রযত্ন বর্ণোৎপত্তির প্রাগভাবী বলিয়া ইহাকে আভ্যন্তর প্রযত্ন কহে। এই প্রযত্ন পাঁচ প্রকার যথা স্পৃষ্ট, ঈষৎ স্পৃষ্ট, বিবৃত, অর্দ্ধবিবৃত ও সংবৃত; সিদ্ধান্ত কৌমুদী অনুসারে অর্দ্ধবিবৃত প্রযত্ন মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। সে যাহা হউক আমরা শিক্ষা গ্রন্থেরই অনুসরণ করিলাম। প্রযত্নবিশেষপ্রেরিত প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ উরঃ প্রভৃতি স্থলে আহত হইয়া থাকে, অনন্তর বর্ণ অথবা বর্ণাভিব্যঞ্জকধ্বনি উৎপাদন করে। এই বর্ণ বা ধ্বনি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বক্তা যে যত্ন বিশেষের সাহায্যে জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূলভাগদ্বারা তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানকে সম্যক্ স্পর্শ

করে তাহা স্পৃষ্ট প্রযত্ন ও ঈষৎ স্পর্শ করে তাহা ঈষৎ স্পৃষ্ট-প্রযত্ন শব্দে অভিহিত হয়। এইরূপ যত্ন, চালিত জিহ্বার অগ্রভাগাদি, উচ্চারণ স্থানের দূরে অবস্থিতি করিলে বিবৃত, বিবৃতের অর্দ্ধাংশদূরে অবস্থিতি করিলে অর্দ্ধবিবৃত এবং উচ্চারণ স্থানের সমীপে অবস্থান করিলে সংবৃত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণে স্পৃষ্টপ্রযত্নের, অন্তঃস্থ বর্ণের উচ্চারণে ঈষৎ স্পৃষ্টের, উষ্মবর্ণের উচ্চারণে অর্দ্ধবিবৃতের ও স্বর বর্ণের উচ্চারণে বিবৃতের উপযোগিতা আছে। অকারের প্রযত্ন সংবৃত। তবে যে সময়ে এই বর্ণকে আশ্রয় করিয়া দ্বিত্বাদি কোন কার্য্য বিহিত হয়, তখনই ইহার বিবৃতত্ব স্বীকার করা যায় মাত্র (৮) অতএব বিবৃত ও সংবৃত ভেদে অকারের প্রযত্ন দুই প্রকার।

এখন একটু অনুধাবন করিলেই জানিতে পারা যায় যে, অ আ হ এই বর্ণত্রয় সমান স্থান হইতে উচ্চারিত হইলে ও প্রযত্ন ভেদই ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য জন্মাইয়াছে। যদি অকার ও আকারের প্রযত্ন ভেদ স্বীকার না করা যায় অর্থাৎ উভয়েরই বিবৃতত্ব স্বীকার করা যায়, তবে একমাত্র উচ্চারণ কালকেই পরস্পরের ভেদক বলিতে হয়। কালভেদে যে বর্ণ ভেদ ঘটিয়া থাকে ইহা পশ্চাৎ কথিত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে ক খ গ ঘ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন উভয়ই সমান, তথাপি ইহাদের পরস্পরের বিভিন্নতার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর বাহ্য প্রযত্নে সমাহিত রহিয়াছে, অতএব বাহ্য প্রযত্ন বিবেচ্য। এই বাহ্য প্রযত্ন অষ্টবিধ: যথা বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ। মহাভাষ্য ব্যাখ্যা

(৮) "অ অ" ইতি অষ্টাধ্যায়ায়াম্।

ভাষ্যপ্রদীপ কৈয়টের মতে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরও বাহ্য প্রযত্নের অন্তর্গত। সুতরাং এই মতে বাহ্য প্রযত্নের সংখ্যা সমুদয়ে একাদশ। কিন্তু ভাষ্যকার ইহাদের প্রযত্নত্ব স্বীকার করেন নাই। আমরাও এই মত যুক্তি যুক্ত বোধ হওয়াতে ইহারই অনুসরণ করিলাম।

মূলাধারস্থ-অগ্নিসংক্ষোভচালিত বায়ু কণ্ঠাদিস্থানসংযোগে বর্ণোৎ-পাদন পূর্ব্বক যদ্দ্বারা কাকলাধঃস্থান গলবিলের সংকোচ বিকাশ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বাহ্যপ্রযত্ন কহে। এই প্রযত্ন বর্ণোৎপত্তির পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া বাহ্য অভিধানে অভি-হিত হয়। তন্মধ্যে বিবার ও সংবার যথাক্রমে গলবিলের বিকাশ ও সঙ্কোচ ক্রিয়া সম্পাদন করে। বর্ণোৎপাদক শ্বাস, বিশেষ বিশেষ ধ্বনির উৎপাদক নাদ ঘোষ ও অঘোষ। যদ্দ্বারা প্রাণন ক্রিয়ার হ্রাস হয় তাহা অল্পপ্রাণ ও যদ্দ্বারা বৃদ্ধি হয় তাহা মহাপ্রাণ শব্দে কথিত হয়।

বর্গীয় প্রথম দ্বিতীয় বর্ণ, প্রথম দ্বিতীয় যম, জিহ্বামূলীয় উপাধ্মানীয়, বিসর্গ এবং শ ষ স ইহাদের বাহ্য প্রযত্ন—শ্বাস অঘোষ বিবার। এতদ্ভিন্ন সমস্ত বর্ণের অর্থাৎ বর্গীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ, তৃতীয় চতুর্থ যম, য র ল ব হ, স্বরবর্ণ ও অনুস্বার ইহাদের বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ অঘোষ নাদ। বর্গীয় প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ প্রথম তৃতীয় যম এবং য র ল ব ইহারা অল্পপ্রাণ। অবশিষ্ট বর্ণ মহাপ্রাণ (৯)।

---

(৯) খয়াং যমাঃ খয়ঃ কপৌ বিসর্গঃ শর এবচ।
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে।
কণ্ঠমন্যেতু ঘোষাঃ স্যুঃ সংবারা নাদভাগিনঃ।
অযুগ্মা বর্গযমগা যণশ্চাল্পাসবঃ স্মৃতাঃ।
ইতি সিদ্ধান্ত কৌমুদ্যাম্।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ ক খ গ ঘ এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর পার্থক্যের কারণ অনুমান করিয়া লইতে পারেন। ক খ য়ের প্রযত্ন—শ্বাস অঘোষ ও বিবার এবং গ ঘ য়ের প্রযত্ন—ঘোষ সংবার ও নাদ। অতএব ক, খ, গ, ঘ, এই বর্ণ চতুষ্টয় বাহ্য প্রযত্নানুসারে দ্বিধা বিভক্ত হইল। তন্মধ্যে প্রথম ভাগে ক খ ও দ্বিতীয় ভাগে গ ঘ ; সুতরাং প্রত্যেক ভাগে দুই দুইটী বর্ণ থাকিল। এই উভয় ভাগের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে প্রাণ ভেদই প্রত্যেক ভাগস্থ বর্ণ দ্বয়ের পরস্পর পার্থক্যের কারণ। ক অল্পপ্রাণ, খ মহাপ্রাণ, এই প্রকার গ ঘ ও যথাক্রমে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ। ক গ ও খ ঘ য়ের পার্থক্যের কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গ ও ঙ কারের পরস্পর প্রযত্ন সমান হইলেও উচ্চারণস্থান সমান নহে। যেহেতু এই বর্ণ জিহ্বামূলের ন্যায় নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয়। এখন চরম প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, যদি উচ্চারণ ভেদই ইহাদের পরস্পর পার্থক্যের কারণ, তবে গঁ ও ঙ ইহারা অভিন্ন বর্ণ না হইল কেন? যেহেতু ইহাদের স্থান বা প্রযত্ন ভেদ নাই। ইহার উত্তর এই যে জিহ্বার মূল ভাগ গঁ কার উচ্চারণ কালে কণ্ঠমূলকে যে ভাবে স্পর্শ করে ঙ কার উচ্চারণ কালে সে ভাবে করে না। এই প্রকার সূক্ষ্ম বিভাগের ব্যাকরণে উপযোগিতা নাই বলিয়া বৈয়াকরণেরা ইহার উপেক্ষা করিয়াছেন। তবে এই ভেদ জ্ঞাপনের জন্য চন্দ্রবিন্দু যুক্ত বর্ণকে অনুনাসিক না বলিয়া সানুনাসিক বলিয়াছেন। স্বর ও কালের বিষয় আগামী বারে লিখিত হইবে।

চাতক।

এমন দারুণ পণ পেয়েছ কোথায় ?
যেখানে সেখানে যাও,　　　সুশীতল জল পাও,
আপন পণের দোষে মর পিপাসায়,
চাহিয়ে ফটিক জল রয়েছ আশায়।

চির দিন পিপাসায় পরাণ বিকল।
দারুণ নিদাঘ তাপে,　　　মেদিনী বিদরে দাপে,
কাতর না হও সও প্রবল অনল,
কেবল তোমার বোল—দে ফটিক জল।

যে নয় তোমার তুমি ভাব তার তরে,
সুধালে না কথা কও,　　　শূন্য পানে চেয়ে রও,
যবে প্রাণ কাঁদে পাখী কাতর অন্তরে,
দে ফটিক জল বল সকরুণ স্বরে।

মুক্তবেণী কাদম্বিনী ঢাকিলে অম্বরে,
পশু পক্ষী কলরবে,　　　নিবাসে প্রবেশে সবে,
তোমার হৃদয়ে আর আনন্দ না ধরে,
দে ফটিক জল ব'লে উঠ পক্ষভরে।

ভীষণ অশনি নাদে মেদিনী কম্পিত,
ক্ষুদ্র পাখী নাহি ডর,　　　বক্ষপাতি বজ্র ধর,
বজ্র মাঝে নৃত্য কর, চিত্ত পুলকিত,
দে ফটিক জল শুনি উন্মাদ-সঙ্গীত।

বর্ণমালা।

—o—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রিম সাহেবের আবিষ্কৃত নিয়ম (**Grimm's law**) ভাষাবিজ্ঞানের মুল সূত্র। কোন কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা এই সূত্রে অবগত হওয়া যায় সুতরাং আদৌ সকল আর্য্য (**Aryan**) ভাষাই যে এক মুল হইতে নির্গত তাহাও অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত, পারস্য, গ্রিক, লাটিন জার্ম্মান ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা সকল যে এক আদিম জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতির ভাষা তাহা এই নিয়ম নিয়োগ দ্বারা সহজেই জানা যায়। (সংস্কৃত) ভ্রাতৃ, (লাটিন) **Frater,** (ইংরাজী) **Brother** এই তিনটী শব্দেরই এক অর্থ। কিন্তু তিনটী শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র বোধহয় না যে ইহারা মুলতঃ এক। বস্তুতঃ ইহারা মুলতঃ এক শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার অবলম্বন করিয়াছে। ভ্রাতৃ শব্দের প্রথম অক্ষর ভ, **Frater** শব্দের প্রথম অক্ষর ফ (**F**), **Brother** শব্দের প্রথম অক্ষর ব (**B**)। ভ, ফ ও ব তিনটী অক্ষরই ঔষ্ঠ্যবর্ণ ; কেবল ভাষানুসারে কোমল (**Soft**) কঠোর (**hard**) অথবা **aspirated** হইয়াছে। তাহার পর তিনটী শব্দেই র আছে। তৎপরে ভ্রাতৃ শব্দে ত, **Frater** শব্দে **t** (ত অথবা ট) এবং **brother** শব্দে দ (**th**) আছে ; অর্থাৎ তিনটী শব্দেরই তৃতীয় অক্ষর কোমল অথবা কঠোর দন্ত্যবর্ণ। তদ্রূপ (সংস্কৃত ত্র) (লাটিন ও গ্রিক) **tria,** (ইংরাজী) **three** তিনটীই এক শব্দ ; তিনটীর প্রথম অক্ষর দন্ত্যবর্ণ। গ্রিম সাহেব

এইরূপ অক্ষরের রূপান্তর পর্য্যালোচনা দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া ভাষাবিজ্ঞানের শিবসূত্র স্থিরীকৃত করিয়াছেন, স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন এবং সংস্কৃত বর্ণমালার ঔৎকর্ষ্য ও ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

১। সংস্কৃত, গ্রিক ও লাটিন ভাষায় যে শব্দে aspirated ব্যঞ্জন অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই শব্দ ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় থাকিলে সেই অক্ষর কঠোর ব্যঞ্জন হয় এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে উহা কোমল ব্যঞ্জন হয় :—যথা

গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি	KH	TH	PH
ইংরাজী ইত্যাদি	G	D	B
পুরাতন হাইজর্ম্মান	K	T	P

২। যে স্থলে সংস্কৃত, গ্রিক ও লাটিন প্রভৃতি " ভাষায় কঠোর অক্ষর থাকে সেই কথা গথিক ভাষায় থাকিলে ঐ অক্ষর কোমল (কঠোর) হয় এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে উহা aspirated হয় যথা——

সংস্কৃত ইত্যাদি	G	D	B
গথিক	K	T	P
পুরাতন হাইজার্ম্মান	Ch	Z	PH

৩। সংস্কৃতাদি ভাষায় কোমল অক্ষর থাকিলে, গথিক ভাষায় ঐ অক্ষর স্থানে aspirated অক্ষর এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে কঠোর অক্ষর দৃষ্ট হয়

যথা——

সংস্কৃত	K	T	P
গথিক	KH	TH	PH
পুরাতন হাইজার্ম্মান	G	D	B

আমরা এক্ষণে গ্রিম সাহেবের আবিষ্কৃত নিয়মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত নহি। এই সকল নিয়মে সংস্কৃত বর্ণমালার উপযোগিতা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পাঠকগণ! ঐ তিনটী নিয়ম উপরোক্ত রূপে অভ্যাস করা কি সহজ বোধ হয়? ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষার্থী অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা গ্রিম সাহেবের আবিষ্কৃত নিয়ম শিক্ষা করা অতি কঠিন বোধ করেন এবং কেহ কেহ হতাশ হইয়াছেন কিন্তু নিয়মগুলি কঠিন নহে, ইংরাজী বর্ণমালা অস্বাভাবিক, নিয়ম ও পারিপাট্য শূন্য বলিয়াই কঠিন বোধ হয়। ঐ তিনটী নিয়মের অক্ষর গুলিকে বাঙ্গালায় লিখিলেই বুঝা যাইবে যে নিয়মগুলি অতি সহজ। আমরা সংস্কৃত বর্ণমালা অবলম্বন করিয়া নিম্নে ঐ তিনটী সূত্র দিতেছি :—

১। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকিলে ইংরাজী প্রভৃতি গথিকা ভাষায় ঐ অক্ষর স্থানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে বর্গের প্রথম বর্ণ দৃষ্ট হয়।

২। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বর্গের তৃতীয় বর্ণ থাকিলে, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ঐ বর্ণ স্থানে বর্গের প্রথম বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ দৃষ্ট হয়।

৩। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে, ইংরাজী গথিক প্রভৃতি গথিক ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং পুরাতন হাইজার্ম্মানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ দৃষ্ট হয়; উচ্চারণ স্থানানুসারে বর্ণ সমুদায় বর্গে বিভক্ত থাকায় এবং প্রত্যেক বর্গস্থ বর্ণগুলি উচ্চারণ ভেদে নিয়মানুসারে নিবেশিত থাকায় গ্রিম সাহেবের নিয়মগুলি এরূপ সহজে সূত্রিত হইল। সুতরাং সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ সকল কেবল সুনিয়মে নিবেশিত নহে, বর্গের সুনিবেশ

দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষার বিলক্ষণ সহকারিতা আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র সমুদয় যে রূপে গঠিত আছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন ; বর্ণমালার সুনিবেশ না থাকিলে সে সকল সূত্র কিরূপে গঠিত হইত তাহা বুঝা যায় না।

(ক্রমশঃ)

"পাস্" "পাস্" করি সময় গোঁয়ায়নু।

"পাস্" "পাস্" করি সময় গোঁয়ায়নু,
সুখের যৌবন গেল বহি।
আন মনে ভাবনু, আন যে হয়ল,
চূণ খাইনু ভাবি দহি।
একূল ওকূল, দুঁহকূল যায়ল,
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
"অমিয়া আশয়ে চাহিয়া রহনু
বিখ বরখিল চাঁদে।"
এত যে সাধক এতা যে বাসনা
সব গেল হি দূর।
মড়ক লাগিয়ে শূন জনু ভৈগেল
সোনার গৌড় হিপুর।

সমালোচন।

পত্রিকা সম্পাদকের সকল কার্য্য অপেক্ষা কঠিন কার্য্য পুস্তকাদি

সমালোচন করা। সকল সমালোচকই যে বিচক্ষণ ও সুবিচারক তাহা নহে এবং সকল লেখা যে সকলের কাছে আদরণীয় হইবে তাহাও সম্ভব নয়। দেখা যায় যে স্বয়ং উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া যাঁহাদের গর্ব্বিত বিশ্বাস এবং যাঁহারা সমালোচক নামে এ দেশে খ্যাত তাঁহারাও কখন কখন ভ্রমে পতিত হন: এ জন্যই একই লেখা একের কাছে আদরণীয় ও অপরের কাছে নিন্দনীয় হয়। যাহা হউক, এরূপ সমালোচকদিগকে আমরা মান্য করিতে কুণ্ঠিত নহি; আর এক মহাপুরুষ সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা নিজের চক্ষে সকল বিষয় দর্শন করেন না, প্রায় সকল সময়েই পরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং নিন্দা করাই তাঁহাদের স্বভাব। ইঁহারা বড় ভয়ানক পদার্থ এবং এই সকল উপদেবতাদের হস্তে সাহিত্য-সমাজ অনেক সময়ে প্রপীড়িত হয়। একেত আমাদের দেশের সমালোচনার প্রথা আর মহানবমী পূজার বলির প্রথা প্রায় সমান—কেবল ধরা আর মারা—তার উপর আবার গালা-গালি কেন? কোন বিষয় ভাল করিয়া না দেখিয়া সহসা "চুরী চুরী" (অনুকরণ) বলিয়া চিৎকার করা বা এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া মনে যাহা আসিল তাহাই বলা কখন সমালোচনার রীতি নহে, কিম্বা "এ লেখা আমার বন্ধুর, তবে ইহা নিশ্চয়ই ভাল" ইহাও কখন সমালোচনায় নিয়ম নহে। চক্ষুলজ্জা, বন্ধুত্ব, উপরোধ, অনুরোধ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া কোন বিষয় আদি অন্ত বিচারের চক্ষে দর্শন করাই প্রকৃত সমালোচন করা। আজি কিছুদিন হইল আমাদের কাছে কতকগুলি পুস্তক আসি-য়াছে আমাদের এ ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাহাদের প্রকৃত সমালোচনা করিবার স্থান নাই তবে আধুনিক প্রথানুসারে তাহাদের সমা-লোচনা করিব বা তাহাদের সম্বন্ধে অল্প আমরা দুই চারিটী কথা

বলিব ; যদি গতিকে অপরাধী হইয়া পড়ি তবে মহাত্মা এবং দুরাত্মা মহাশয়গণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমরা যে কয়খানি পুস্তক পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে " বনফুল " ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ খানি কোন কুলমহিলা বিরচিত—কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মহিলার লেখা বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতেছি তাহা নহে, এ লেখায় বাস্তবিক লালিত্য আছে, এ বন ফুলটীর সৌরভে সত্য সত্যই আমরা আমোদিত হইয়াছি, এমন ফুল যত ফুটে ততই ভাল—আশা করি প্রতি অন্তঃপুরে ইহার সৌরভ বিক্ষিপ্ত হউগ। দ্বিতীয় পুস্তকখানি " মনুজ "——এখানি শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। এ পুস্তকখানিও মন্দ নহে, ইহার স্থানে স্থানে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আশা করি লেখক সময়ে রচনাচাতুর্য্যে তাঁহার পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার পর " যুব-রঞ্জিনী "—শ্রীতারিণী চরণ সেন প্রণীত, ভবানীপুর সুধাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা, লাবণ্যময়ী ললনার মাধুরী ও প্রকৃত কবিত্বের সৌন্দর্য্য প্রথম দর্শনেই হৃদয় নাচাইয়া দেয়। সমালোচ্য পুস্তকে সে মনোহারিত্ব যদিও নাই, তথাপি কবিতাগুলিতে সুরুচি ও মধুরতার পরিচয় আছে ; স্থানে স্থানে দুই একটী চরণ এমন মিষ্ট আছে যে পাঠ করিলে স্মরণ রাখিতে ইচ্ছা হয়। চতুর্থ পুস্তকখানি "বালারঞ্জিকা"—শ্রীশশি কুমার সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত—কলিকাতা পুরাণ প্রচার যন্ত্রে মুদ্রিত। এ পুস্তকখানিতে কবিত্বের কিছুই পরিচয় নাই, কেবল পয়ারে কতকগুলি উপদেশ লিখিত আছে মাত্র। ইহার ভাষা অত্যন্ত সরল সুতরাং শিক্ষার্থিনী রমণীগণের পক্ষে সহজেই ইহা বোধগম্য। এখানি পল্লীপ্রিয়া অবলাগণের একখানি উত্তম পাঠ্য পুস্তক। পঞ্চম—"নাটকাভিনয় প্রহসন"—শ্রীদেবকান্ত বাগচী প্রণীত,

কর-প্রেসে মুদ্রিত। বর্ণমালা বোধহীন গাঁজা-গুলিখোর বয়াটে-লোক কর্ত্তৃক নাটকাভিনয় রূপ গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইলে কিরূপ হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাজনক হয় তাহাই চিত্র করা এই পুস্তক খানির উদ্দেশ্য। বাস্তবিক নাটকাভিনয় অতি গুরুতর কার্য্য, নাটক প্রণয়ন ততোধিক। এ পুস্তকে প্রম্প্‌টারের কথা বুঝিতে না পারিয়া অভিনেতা দিগের অর্থহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তি করণ পাঠ করিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ষষ্ঠ—"অপ্সরী মিলন"—গীতি নাট্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত—সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত। রাজা পুরূরবার সহিত স্বর্গ-নর্ত্তকী উর্ব্বশীর প্রণয় অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। যে কয়খানি গীতিনাট্য এ পর্য্যন্ত সাধারণ রঙ্গ মঞ্চ সকলে অভিনীত হইয়াছে তাহার একখানিতেও বিশেষ রচনা-কৌশল বা কবিত্ব নাই; তবে সুরলয়ের গুণে ও গায়ক গায়িকা দিগের নৈপুণ্যে তন্মধ্যে কয়েকখানি সাধারণের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকের কয়েকটী গীত "সতী কি কলঙ্কিনী" "আদর্শ সতী" প্রভৃতি অপেরার সুরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, পুস্তকখানিতে এমন কোন রসের অবতারণা নাই যাহাতে হৃদয় আকৃষ্ট হয়, তবে অভিনীত হইলে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না। সপ্তম—"বঙ্গরহস্য" **The Bengal Punch** আমরা ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পূর্ব্বে বাঁদরামি আখ্যায় প্রকাশিত হইত। ইহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। প্রথম সংখ্যায় "রাজনৈতিক বঙ্গের মহোৎসব" ও তৃতীয় সংখ্যায় "ঈসপ্‌ লিখিত পুরাণ" এই দুইটী প্রবন্ধ অর্থপূর্ণ ও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

চক্ষু।

বিশ্ব-নিয়ন্তা কেবল মাত্র মানবজাতিকে অমূল্য চক্ষু রত্নে বিভূষিত করিয়াছেন। নিকৃষ্ট জীবগণ মধ্যে অনেক জাতি আদৌ চক্ষু-বিহীন। তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয় সহকারে জীবিকা কার্য্য যথা সম্ভব নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অপরঞ্চ, নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণিবর্গ যদ্দ্বারা স্থান নির্ণয়, আহারান্বেষণ ইত্যাদি শারীরিক প্রয়োজন সম্পাদন করে তাহা চক্ষুপদবাচ্য নহে। নির্জীব ক্ষণভঙ্গুর জড় পদার্থ হইতে নির্ম্মল অবিনশ্বর পরমাত্মার যতদূর প্রভেদ, খদ্যোতের ক্ষণিক-প্রভা এবং সর্ব্বশক্তিমান জগৎকারণ তেজঃকম্প খদ্যোতনের মধ্যে যেরূপ বৈষম্য, মনুষ্য-চক্ষু এবং নিকৃষ্ট-প্রাণি-চক্ষুর মধ্যে ততোধিক তারতম্য নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইতে পারে না। ফলতঃ মানব-চক্ষু আত্মার ছায়া স্বরূপ; আত্মা যখন যে ভাবে থাকে চক্ষু তখন সেই ভাব প্রকাশ করে এবং আত্মার অসংখ্য ভাব কেবল চক্ষুর দ্বারাই অনুভূত হয়। নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবগণের চক্ষু চির-কালই একরূপ থাকে। ব্যাঘ্রের চক্ষুতে হিংসা ও সাহস মিশ্রিত ভাব, মৃগের চক্ষুতে কোমলতা ভাব এবং শৃগালের চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়; কিন্তু মানব-চক্ষু প্রতি মুহূর্ত্তেই ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। যখন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে শান্তনুতনয় অর্জ্জুনাদি বিনাশে কৃত-সংকল্প হইয়া "হে হৃষীকেশ! এইবার পাণ্ডবদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া বীরদর্পে বিশ্ব-প্রলয়-ক্ষম নারা-য়ণী বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তখন কি ভয়-ঙ্কর জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়াছিল; অপরঞ্চ, ভক্ত-বৎসল যাদব

পতি নরনারীগণকে ভীষ্মদেবের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত অবলোকনে সুদর্শন চক্র হস্তে গাঙ্গেয়কে সংহার করিতে ধাবমান হইলে, বীরবর যখন ভক্তিভাবে বলিতে লাগিলেন "হে অনাদি-নাথ ভগবন্! আমাকে অনতিবিলম্বে বিনাশ করুন, আপনার হস্তে পঞ্চত্ব পাইলে আমি অনায়াসে এই দুস্তর ভব-সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইব," তখন যশস্বী দেবব্রতের নয়ন যুগল কি অপূর্ব্ব ভক্তিভাব ধারণ করিয়াছিল! পুনশ্চ, বিদেশবাসী পিতা স্বগৃহে পুনরাগমন করিলে যখন তাহার প্রাণাধিক শিশু-পুত্র অস্পষ্ট স্বরে সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট ধাবমান হয়, তখন পিতা-পুত্রের নয়ন কি প্রগাঢ় স্নেহ, কি অনির্ব্বচনীয় মধুরতা প্রকাশ করিয়া থাকে! নিশীথ সময়ে পরদ্রব্যাপহারী দস্যু পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সুষুপ্ত গৃহস্বামীর প্রাণহত্যা করিতে যখন ছুরিকা উত্তোলন করে, তখন সেই পামরের চক্ষুর্দ্বয় কি ঘৃণিত ভাবে কলঙ্কিত হয়! চক্ষু সত্যময়, ইহাতে কপটতা বা প্রবঞ্চনার লেশ-মাত্র নাই। জিহ্বা, মন কিম্বা কার্য্যের দ্বারা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে চক্ষু তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগতে মানবের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দেয়। জিহ্বা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে, কর্ণ অশ্লীলবাক্য শ্রবণে, মন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে, লজ্জিত হয় না; কিন্তু চক্ষু তাহাদের নিন্দার্হ কার্য্যে দুঃখিত হইয়া কতই লজ্জা প্রকাশ করে! অতঃপর, সকল ইন্দ্রিয়ই চক্ষুর পরিচারক ও তাহা-দের সমস্ত কার্য্যই চক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়। মনোভাব ব্যক্ত করা জিহ্বার প্রকৃত কার্য্য; কিন্তু মহা মহা কবি ও দার্শনিকগণ যে সকল গূঢ় মনোভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম, চক্ষু তাহা অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দেয়। কর্ণ শ্রবণ করে বটে, কিন্তু বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বেই বক্তার চক্ষু অবলোকনে, শ্রোতার চক্ষু

বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া লয়। দূরস্থ পূতিগন্ধ নাসিকা দ্বারে প্রবেশ করিবার অগ্রেই চক্ষু ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সতর্ক করিয়া দেয়।

এরূপ অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের গঠন এবং কার্য্য প্রণালী সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে সকলেই যে কৌতূহলাক্রান্ত হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব নিম্নে তদ্বিবরণ প্রকটিত হইল।

চক্ষু প্রায় গোলাকার যন্ত্র। ইহার সর্ব্বোপরি আবরণ এক প্রকার দৃঢ় স্থূল পদার্থ; তাহাকে বহিঃস্তর (Sclerotic) বলে। ইহার অধিকাংশ শুভ্র এবং অস্বচ্ছ; কেবল যে অংশ (cornea) আমরা পরের চক্ষে দেখিতে পাই তাহা নিতান্ত স্বচ্ছ এবং বহিঃস্তর হইতে অধিকতর ন্যুব্জ। স্বচ্ছ-স্তরের নিম্ন ভাগে এক প্রকার তরল পদার্থ (aqueous humor) অবস্থিতি করে। তন্নিম্নে দ্বিন্যুব্জ (biconvex) দীপ্তোপল (crystalline lens) এবং তৎপরে এক প্রকার গাঢ় নির্য্যাসং দ্রব্য দৃষ্ট হয় তাহাকে কাচবৎ হিমর (vitreous humor) বলে, দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলের উপরিভাগে একটী রঞ্জিত গোলাকার যবনিকা (Iris) আছে। তন্মধ্যে একটী ছিদ্র, ঐ ছিদ্র দিয়া আলোক দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলে পতিত হয়। কাচবৎ হিমরের সংলগ্ন একটী শুভ্রস্তর আছে তাহাকে রতিনা (retina) বলে। রতিনা এবং বহিঃস্তরের মধ্যগত স্তর (choroid) প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; তজ্জন্য তাহাকে কৃষ্ণস্তর বলা যাইতে পারে। নাসিকার নিকট চক্ষু গোলকে একটী ছিদ্র আছে। তদ্দ্বারা দর্শন শিরা (optic nerve) চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উল্লিখিত দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপল তন্তু বিনির্ম্মিত, স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ এবং নিতান্ত কুটিল গঠন। ইহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে এক একটী দৃঢ় বন্ধনী আছে। ঐ বন্ধনীদ্বয় কৃষ্ণস্তরের

শেষভাগে (ciliary muscle) সংশ্লিষ্ট ; তন্নিবন্ধন দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলের সম্মুখ ভাগে, নিম্ন ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ অবনত।

কৃষ্ণস্তর রঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ নির্ম্মিত। ইহার বহির্দেশ বহিঃস্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং রতিনা ইহার ও কাচবৎ হিমরের অভ্যন্তরে স্থিত। চক্ষুর সম্মুখভাগের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণস্তরের আকারের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইহার অন্তরোপরিভাগ উডুম্বর পত্রের ন্যায় দন্তুরিত হইয়া উল্লিখিত রঞ্জিত যবনিকা প্রবেশ করিয়াছে। রঞ্জিত যবনিকা গোলাকার, বিকীর্ণ, মাংসপেশী নির্ম্মিত, তন্তুময় এবং ইহার প্রান্তভাগ বহিঃস্তর ও স্বচ্ছস্তরের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন। ঐ রূপ মাংসপেশী তন্তু কৃষ্ণস্তরের সহিত সংযুক্ত আছে। এমতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত তন্তুরাজি কুঞ্চিত হইলে কৃষ্ণস্তরকে সম্মুখ ভাগে আকৃষ্ট করে এবং দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলের বন্ধনীদ্বয় কৃষ্ণস্তরের সহিত সংযুক্ত থাকায়, কৃষ্ণস্তর সম্মুখ দিকে আকৃষ্ট হইলে ঐ বন্ধনীদ্বয় শিথিল হইয়া যায় ; সুতরাং দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলের উপরিভাগ ন্যুব্জতর হয়। অর্থাৎ সামান্যতঃ যাহাকে চক্ষের তারা বলে তাহা ক্ষুদ্রতর দৃষ্ট হয়। অতঃপর রতিনা এবং দর্শন শিরার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রয়োজন।

চক্ষুঃগোলককে পার্শ্বচ্ছেদ দ্বারা বিভক্ত করিলে পশ্চাদর্দ্ধেকের অভ্যন্তরোপরি যে শুভ্র সূক্ষ্মস্তর দৃষ্ট হয় তাহাই রতিনা। ঐ রতিনার চতুর্থাংশের তিনাংশের নির্ম্মাণ প্রণালী ঝিল্লীবৎ, অপরাংশ দণ্ড এবং শৃঙ্গাকার পদার্থ নির্ম্মিত। উক্ত অভ্যন্তরে একটী ছিদ্র অবলোকিত হয়, ঐ ছিদ্র দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে দর্শন-শিরা শাখা প্রশাখায় রতিনার স্তর মধ্যে বিকীর্ণ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। দর্শন শিরা চক্ষু গোলকে যে স্থানে প্রবেশ করিরাছে সেই স্থান অতি কৃষ্ণবর্ণ এবং উহাকে কৃষ্ণ বিন্দু (blind spot) এবং তাহার অনতি দূরে

রতিনার এক স্থান পীতবর্ণ তাহাকে পীত বিন্দু (macua lutia) বলে। ঐ কৃষ্ণ বিন্দুতে রতিনার উল্লিখিত দণ্ড ও শৃঙ্গাকার পদার্থ আদৌ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পীত বিন্দুতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ইথর (ether) নামক এক প্রকার পদার্থ আলোকের মূলীভূত কারণ। ঐ ইথর যত পরিসঞ্চালন হয়, আলোক তত জ্যোতির্ম্ময় হয় এবং তদ্দ্বারা দর্শন শিরার তন্তু রাজিকে উত্তেজিত করাই রতিনার প্রকৃত কার্য্য। দর্শন শিরার তন্তুর উত্তেজন দ্বারা মস্তিষ্কে আলোকের বোধ উদ্ভাবিত হয়। আলোক এক কালে দর্শন শিরায় পতিত হইলে উহা উত্তেজিত হয় না। রতিনার সাহায্য ব্যতিরেকে উহার আলোক বোধ উৎপাদনে কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। রতিনার দণ্ড ও শৃঙ্গরাজিই আলোক বোধের প্রধান কারণ; অতএব কৃষ্ণ বিন্দু তদ্বিষয়ে নিতান্ত অপারক এবং পীত বিন্দু তদ্বিষয়ে অন্যান্য অংশ হইতে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যক্ষম।

উল্লিখিত বিবরণে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে বহিঃস্তর, কৃষ্ণস্তর এবং রতিনা পরিত্যাগ করিলে চক্ষের পরিশিষ্টাংশকে একটী দ্বিন্যুব্জাকৃতি কাচ বলিতে পারা যায়। বায়ু অপেক্ষা ঐ কাচের প্রতিক্ষেপণ ক্ষমতা অধিকতর। আলোকতত্ত্বে মীমাংসিত হইয়াছে যে যদি স্বল্পতর প্রতিক্ষেপণ-ক্ষমতা-বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিক্ষেপণ-ক্ষমতা-বিশিষ্ট পদার্থ রাখা যায়, তাহা হইলে আলোক-রেখা সমূহ প্রথমোক্ত পদার্থাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ শেষোক্ত পদার্থের ন্যুব্জ ভাগে পতিত হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট অধিশ্রয়ণে একত্রিত হয়। ইহা সামান্য পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি একটী জলপূর্ণ বাক্সের এক পার্শ্বে ঘটিকা যন্ত্রের কাচ স্থাপন করা যায় এবং একটী বাতি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ কাচের এরূপ অন্তরে

রাখা যায় যে আলোকের প্রতিকৃতি ঐ বাক্সের বিপরীত পার্শ্বে পতিত হয় তাহা হইলে ঐ জল মধ্যে আলোক পথে একটী দ্বিন্যুব্জ কাচ স্থাপন করিলে আলোক-রেখা সমূহ অধিশ্রয়ণে শীঘ্রতর একত্রিত হইয়া প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত করে। ইহার কারণ এই যে কাচে জলাপেক্ষা অধিক প্রতিক্ষেপণ ক্ষমতা আছে। সেই রূপ চক্ষুর যে অংশ দ্বিন্যুব্জকাচবৎ তাহা বায়ু অপেক্ষা, অধিক প্রতিক্ষেপণশীল। তন্নিবন্ধন জ্যোতির্ম্ময়-পদার্থ-বিনির্গত আলোক-রেখা-রাজি চক্ষুর উপর পতিত হইয়া উহার অভ্যন্তরাধিশ্রয়ণে পুনরেক-ত্রিত হইয়া সেই পদার্থের প্রতিকৃতি রতিনার উপর উদ্ভাবিত করে। রতিনার দ্বারা যে প্রকারে ঐ পদার্থের বোধ মস্তিষ্কে উদ্ভাবিত হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর দ্বিন্যুব্জ কাচে যে নিয়মে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতি-বিম্ব উদ্ভাবিত হয় তাহার পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দ্বিন্যুব্জ কাচের এই গুণটী জ্ঞাতব্য যে তাহা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের যত নিকটবর্ত্তী থাকে ঐ পদার্থের অধিশ্রয়ণ সেই পরিমাণে দূর-বর্ত্তী দৃষ্ট হয় এবং উক্ত পদার্থ কাচের যত দূরবর্ত্তী হয় তাহার অধিশ্রয়ণ সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত পদার্থ যদি এক স্থানেই সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে দ্বিন্যুব্জ কাচের ন্যুব্জতার তারতম্যানুসারে অধিশ্রয়ণের স্থান নির্ণয় হয়। অর্থাৎ, ন্যুব্জতা স্বল্প হইলে অধিশ্রয়ণ অধিক দূরবর্ত্তী এবং ন্যুব্জতার আধিক্য নিবন্ধন অধিশ্রয়ণ সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হয়। উল্লিখিত নিয়মদ্বয়ের যাথার্থ্য কতিপয় দ্বিন্যুব্জ কাচ (যথা চসমার কাচ) এবং প্রদীপ্ত শলাকা লইয়া সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে কোন পদার্থ দৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলে

যদি তাহা দৃষ্ট না হয, তাহা হইলে দূরবীক্ষণের কাচাদির স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং রীতিমত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে উক্ত পদার্থ নয়ন পথে পতিত হয়। চক্ষু সম্বন্ধে আমরা সেই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি; অর্থাৎ, চক্ষুব ন্যুব্জতার তারতম্য প্রতিমুহূর্ত্তে করিতে হয় এবং তদ্দ্বারাই নিকটস্থ এবং দূরস্থ পদার্থ অনুভব করিতে পারি। ঐ কার্য্যকে ন্যুব্জতাবর্ত্তন (Adjustment of the eyes) বলে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতিকৃতি রতিনার উপর পতিত হইলে সেই পদার্থের বোধ জন্মে। অতএব চক্ষু সম্বন্ধে অধিশ্রয়ণের স্থান পরিবর্ত্তন হইতে পারেনা এবং আমরাও এক স্থানে বসিয়া নিকটস্থ এবং দূরস্থ পদার্থ বোধ করিতে পারি এমতে উক্ত নিয়মদ্বয়ের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে উপলব্ধি হইবে যে এরূপ বোধ চক্ষের দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলে ন্যুব্জতার তারতম্য ভিন্ন অসম্ভব অর্থাৎ শত হস্ত দূরবর্ত্তী পদার্থ অনুভব করিতে হইলে চক্ষের যেরূপ ন্যুব্জতা হয় দশ হস্ত দূববর্ত্তী পদার্থ অনুভবে চক্ষের তদপেক্ষা ন্যুব্জতা আবশ্যক। বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে চক্ষুর স্বাভাবিকাবস্থায় দশ ইঞ্চ হইতে নিকটবর্ত্তী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পদার্থ দৃষ্টি করিতে হইলে কৃষ্ণ স্তরের শেষভাগ (ciliary muscle) কুঞ্চিত করিতে হয় তদ্দ্বারা দ্বিন্যুব্জ দীপ্তোপলের বন্ধনীদ্বয় শিথিল হয় সুতরাং ন্যুব্জতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে কালের কুটিল গতি দ্বারা চক্ষুর স্বাভাবিক ন্যুব্জতার হ্রাস হয় সুতরাং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নিসৃষ্ট আলোক রেখা কলাপ চক্ষু মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর অধিশ্রয়ণে একত্রিত হইবার পূর্ব্বে রতিনায় পতিত হয; এমত স্থলে ন্যুব্জ চসমা ব্যবহার করা আবশ্যক। কোন কোন ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী পদার্থ দেখিতে পায় কিন্তু দূরবর্ত্তী বস্তু দেখিতে

পায না ; তাহাদের চক্ষের ন্যুব্জতা অধিক সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিন্যুব্জ (**Concave**) চসমা উপকারক।

চক্ষু-গোলক চক্ষু-গহ্বরে বস-শয্যায় অবস্থিতি করিয়া সরল মাংসপেশী চতুষ্টয়ের এবং বক্র মাংসপেশীদ্বয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। উল্লিখিত হইয়াছে যে চক্ষু গোলকের পশ্চাতে একটী ছিদ্র দ্বারা দর্শন শিরা গোলকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঐ ছিদ্রের চতুঃ-পার্শ্বে সরল মাংসপেশী চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়া বহিঃস্তর এবং স্বচ্ছস্তরের সংযোগ স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সরল মাংসপেশী ঊর্দ্ধদিকে, দ্বিতীয় নিম্নদিকে, তৃতীয় বহিরাভিমুখে এবং চতুর্থ অন্তরাভিমুখে বিস্তৃত। সুতরাং প্রথম সরল মাংসপেশীর দ্বারা চক্ষু-গোলক ঊর্দ্ধে, দ্বিতীয় সরল মাংসপেশীর দ্বারা নিম্নে, তৃতীয় সরল মাংসপেশীর দ্বারা বহির্ভাগে এবং চতুর্থ সরল মাংসপেশীর দ্বারা অন্তর্ভাগে পরিচালিত হয়। এমতে উক্ত মাংসপেশী চতু-ষ্টয়কে পর্য্যায় ক্রমে ঊর্দ্ধ সরল মাংসপেশী, (**Superior recti**) নিম্ন সরল মাংসপেশী (**Inferior recti**) বহিঃ সরল মাংসপেশী (**External recti**) অন্তঃসরল মাংসপেশী (**Internal recti**) বলা যাইতে পারে। বক্র মাংসপেশীদ্বয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধ বক্র মাংসপেশী (**Superior obliqui**) এবং নিম্ন বক্র মাংসপেশী (**Inferior obliqui**) চক্ষু-গোলককে পশ্চাদ্ভাগে এবং সম্মুখভাগে আকৃষ্ট করে ; ইহাদের উৎপত্তি স্থান সরল মাংসপেশী চতুষ্টয়ের নিকট। চক্ষুর পাত্রদ্বয়ে এক একটী মাংসপেসী আছে তদ্দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করা যায় ; অতএব তাহাদিগকে মুদ্রণিক মাংসপেশী (**Orbicularis**) বলা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন উপর পত্রে একটী মাংসপেশী আছে তদ্দ্বারা ঐ পত্র উত্থিত হয় ; ঐ মাংসপেশীর নাম উত্থাপক (**Levator**)। পত্রদ্বয়ের অন্তর্ভাগে এই চক্ষুর সম্মুখভাগে এক

প্রকার শিরাবিশিষ্ট শূন্যগর্ভ (**vascular**) সূক্ষ্ম ত্বক্ (সংযোগিকা-**Conjunctiva**) অবস্থিতি করে এবং চক্ষুর বহির্ভাগে একটী অশ্রুৎপাদিকা মাংসগ্রন্থি (**lachrymal gland**) আছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী ঐ মাংসগ্রন্থি-বিনির্গত এক প্রকার জলবৎ পদার্থ দ্বারা উল্লিখিত ত্বকদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান পরিপূর্ণ করে এবং কতকগুলি প্রণালী দ্বারা নিম্ন তুমুলাস্থি (**Turbinal bone**) নিকটস্থ নাসিকা রন্ধ্রে নীত হয়। প্রগাঢ় মনোবেগে অথবা ধূমাদি স্পর্শে অশ্রুৎপাদিকা মাংসগ্রন্থি হইতে এরূপ অপরিয্যাপ্ত উক্ত জলবৎ পদার্থ নির্গত হয় যে উল্লিখিত প্রণালী দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ রূপে নাসিকা রন্ধ্রে নীত হইতে পারে না, সুতরাং অবশিষ্টাংশ অশ্রুরূপে পতিত হইয়া যায়।

শরীরচ্ছেদবিদ্যা অবলম্বন না করিয়া যত দূর চক্ষুগঠন অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, তাহা সংক্ষিপ্ত রূপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে দর্শন সম্বন্ধে যে বিবিধ কৌতুকজনক ভ্রম হইয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধে যে সকল আধুনিক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা ক্রমান্বয়ে প্রকটিত হইতেছে। মানববিবেক সর্ব্বদা ভ্রমপরায়ণ কিন্তু তন্মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়ক ভ্রমসমূহ নিতান্ত বিস্ময়জনক। তন্নিবন্ধন বালক-বালিকা-মনোহার শত শত ভূত প্রেতের উপন্যাস কল্পিত হইয়াছে।

(১) ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তু অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক নির্দ্ধারিত হইলে, ঐ বস্তুর একটী মাত্র প্রতিকৃতি রতিনায় উদ্ভাবিত হয় এবং দুই কি অধিক বস্তুর প্রতিকৃতির সংখ্যা বস্তুর সংখ্যানুসারে সাধারণতঃ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রতিকৃতির সংখ্যানুসারে বস্তুর সংখ্যা করা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায়। একখণ্ড কাগজে রঞ্জিত যবনিকামধ্যস্থ ছিদ্রের ব্যাসাপেক্ষা পরস্পর অল্প দূরস্থিত দুইটী

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, ঐ ছিদ্র দিয়া চক্ষুর নিতান্ত নিকটস্থ কোন অতীব ক্ষুদ্র পদার্থ দৃষ্টি করিলে, দুইটী পদার্থের বোধ হইয়া থাকে। ঐ পদার্থবিনির্গত আলোক-রেখাবলি ছিদ্রদ্বয়ের দ্বারা বিভক্ত হইয়া চক্ষু-মধ্যে প্রবেশ করে এবং ঐ পদার্থ চক্ষের নিতান্ত নিক-টস্থ থাকায় বিভক্ত আলোক-রেখারাজি সংশ্লিষ্ট না হইয়া রতি-নায় পতিত হয় এবং দুইটী প্রতিকৃতি উদ্ভাবন করে; সুতরাং দুইটী পদার্থ অবলোকন করিতেছি বলিয়া মনে ধারণা হইয়া থাকে। বেলোয়ারী ঝাড়ের একটী কাচ লইয়া কোন বস্তু দেখিলে ঐ কাচের কোণ সংখ্যানুসারে যে তত সংখ্যক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও ঐ কারণ।

(২) সমদূরস্থ বস্তুসমূহের বৃহত্ব এবং ক্ষুদ্রত্বানুসারে প্রতি-কৃতি বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে এবং দূরস্থ বস্তুর প্রতিকৃতি নিকটস্থ বস্তুর প্রতিকৃতি অপেক্ষা অস্পষ্ট হয়; সুতরাং এক স্থানে অবস্থিত দুইটী সমানাকার বস্তুর মধ্যে একটীর প্রতিকৃতি বৃহত্তর করিতে পারিলে তাহা অন্য বস্তু অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ন্যুব্জ কাচের দ্বারা বস্তুর প্রতিকৃতি বৃহত্তর এবং বিন্যুব্জ কাচের দ্বারা ক্ষুদ্রতর হয়; কারণ ন্যুব্জ কাচ তদুপরি পতিত আলোক-রেখারাজি বিস্তৃত এবং বিন্যুব্জ কাচ তদুপরি পতিত আলোক-রেখারাজি কুঞ্চিত করে: সুতরাং ন্যুব্জ কাচ দ্বারা কোন বস্তু দৃষ্টি করিলে তাহা বৃহত্তর এবং বিন্যুব্জ কাচের দ্বারা দৃষ্টি করিলে ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতীতি হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা যে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য, উদয়ে ও অস্তে, অন্য সময়াপেক্ষা বৃহত্তর উপলব্ধি হয় তাহার কারণও দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

(৩) কোন দৃষ্ট বস্তুর অবয়ব শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইলে ঐ

বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকৃতি রতিনার এক স্থানে পতিত হয়; সুতরাং যদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতিকৃতি শীঘ্র শীঘ্র রতিনার একস্থানে পতিত হয় তবে ঐ প্রতিকৃতিসমূহ এক বস্তু উদ্ভাবিত বোধে একটী মাত্র বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ত্তমাট্রোপ (Thaumatrope) নামক এক প্রকার খেলানা আছে, তাহার ছিদ্র দিয়া অবলোকন করিলে বালকেরা পরস্পরে পৃষ্ঠ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে, কয়েক জন লোক গোলক উৎক্ষেপণ করিয়া তাহা পুনরায় ধরিতেছে ইত্যাদি দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে ঐ খেলানার ভিতর একটী গোলাকার কাগজে পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ চিত্র চিত্রিত আছে অর্থাৎ একটী বালক শির অবনত করিয়া দণ্ডায়মান আছে, একটী বালক তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, একটী বালক দৌড়িয়া যাইতেছে এবং একটী বালক দাঁড়াইয়া আছে। পুনশ্চ একটী লোক গোলক উৎক্ষেপণ করিতেছে, একটী লোক তাহা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে এবং একটী লোক একটী গোলক ধরিয়া আছে। এই কাগজটী ছিদ্রের সম্মুখে ঘর্ণিত করিলে চিত্র সমূহের প্রতিকৃতি রতিনায় এক স্থানে ক্রমান্বয়ে এত শীঘ্র পতিত হয় যে একটী মাত্র চিত্র বলিয়া সহসা উপলব্ধি হয়। অতএব একটী বালকই আর একটী বালকের পৃষ্ঠ উল্লঙ্ঘন করতঃ দৌড়িয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইতেছে এবং একটী লোকই গোলক উৎক্ষেপণ করিয়া তাহা পুনশ্চ হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতেছে, এবম্বিধ ধারণা হইয়া থাকে।

(৪) স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু একমাত্র বোধ হইলে, তাহা চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারা অবলোকন করিলে, ঐ বস্তুর প্রতিকৃতির কেন্দ্র প্রত্যেক চক্ষুর রতিনায় পীতবিন্দুর কেন্দ্রের উপর পতিত হয়। কিন্তু দুইটী বস্তু এককালে চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারা দৃষ্ট হইলে দুই বস্তুরই প্রতিকৃতির

কেন্দ্র এককালে প্রত্যেক চক্ষুর রতিনায় পীতবিন্দুর কেন্দ্রের উপর সচরাচর পতিত হয় না; সুতরাং যদি কোন কারণবশতঃ দুই বস্তুর প্রতিকৃতি ঐরূপে পতিত হয় অথবা এক বস্তুর প্রতিকৃতি ঐ রূপে পতিত না হয়, এমত স্থানে বস্তুদ্বয় একমাত্র এবং তদ্বি-পরীতে একমাত্র বস্তু বস্তুদ্বয় বলিয়া অনুভূত হয়।

চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা একমাত্র বস্তু অবলোকন করিলে প্রতিকৃতিদ্বয় উদ্ভাবিত হয়, তত্রাচ আমরা যে একমাত্র বস্তু অনুভব করি তদ্দ্বারা উক্ত নিয়মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। পুনশ্চ বক্র নয়নে কোন বস্তু দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক নয়নাক্ষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঐ পদার্থাভিমুখে ধাবিত হয়; সুতরাং ঐ বস্তুর প্রতিকৃতি চক্ষুর রতিনায় ভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং তন্নিবন্ধন বস্তুদ্বয় দৃষ্ট হয়।

(৫) নিকটস্থ একমাত্র বস্তু, চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা দৃষ্টি করিলে, নয়নাক্ষ-দ্বয় যে পরিমিত কোণে (**Angle**) ব্যবচ্ছেদ করে, দূরস্থ বস্তু অবলো-কনে উক্ত কোণের পরিমাণ স্বল্পতর হয়; সুতরাং দৃষ্ট বস্তুর অবস্থান পরিবর্ত্তন না করিলে উক্ত কোণের তারতম্যানুসারে ঐ বস্তু নিকটস্থ অথবা দূরস্থ অনুভূত হয়।

সিউডস্‌কোপ্‌ নামক যন্ত্র (**Pseudoscope**) এই সিদ্ধান্ত-মূলক। তদভ্যন্তরে কয়েকটী দর্পণ এরূপ প্রণালীতে বিন্যস্ত আছে যে দৃষ্ট-বস্তু-বিনির্গত-আলোক-রেখা যে পরিমিত কোণে চক্ষুর্দ্বয়ে পতিত হয়, দৃষ্ট বস্তুর অবস্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহার তার-তম্য করিতে পারা যায়। তন্নিবন্ধন ঐ বস্তু কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ বলিয়া প্রতীত হয়।

(৬) স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু ঘন(**Solid**) বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে যদি ঐ বস্তু চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারা দৃষ্ট করা যায় প্রত্যেক চক্ষের রতিনায় ভিন্নাকার প্রতিকৃতি পতিত হয়: কারণ দক্ষিণ চক্ষে

দৃষ্ট বস্তুর দক্ষিণভাগ যে পরিমাণে দেখা যায়, বাম চক্ষে ঐ ভাগ সে পরিমাণে দেখা যায় না কিন্তু তত্রাচ ঐ দুই প্রতিকৃতি সংশ্লিষ্ট হইয়া যায় সুতরাং একটীই বস্তু দৃষ্ট হয়। অতএব যদি কোন ঘন বস্তুর বাম ভাগের চিত্রের এবং দক্ষিণভাগের চিত্রের প্রতিকৃতি দুই চক্ষের রতিনায় এই রূপে পতিত হয় যে প্রতিকৃতি সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে একটী ঘন বস্তুর অনুভব হইবে।

ষ্টেরিঅস্‌কোপ্ (**Stereoscope**) নামক যন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের সুন্দর উদাহরণ। ঐ যন্ত্রোপযোগী চিত্রসমূহে অট্টালিকাদির দক্ষিণ এবং বামভাগ চিত্রিত থাকে এবং ঐ যন্ত্র এরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত যে ঐ দুই অংশের প্রতিকৃতি চক্ষুর্দ্বয়ের রতিনায় সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে বাস্তবিক অট্টালিকাদি দর্শন করিতেছি এরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের অবশ্য প্রতীতি হইবে যে এই বিশ্ব মণ্ডলে চক্ষুর ন্যায় অদ্ভুত যন্ত্র দ্বিতীয় নাই। নয়ন-কুটীরে দিন-নয়ন কারু রূপে অবস্থিতি করিতেছে এবং রতিনা রূপ শুভ্র যবনিকায় বাহ্য বস্তুর চিত্র চিত্রিত করিতেছে। কৃষ্ণস্তর রূপ যবনিকা তাহা প্রতি-ক্ষণে লোপ করিতেছে এবং দিন-নয়ন প্রতি মুহূর্ত্তে পুনরায় নূতন নূতন চিত্র চিত্রিত করিতেছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা নিতান্ত প্রিয়তম বন্ধুর, আপন পিতা মাতার, স্ত্রী পুত্রাদিরও প্রকৃত অবয়ব জানিনা! আমরা যাহা দেখি তাহা চিত্র মাত্র। নিজের নিজের অবয়ব যে দর্পণ সহকারে দৃষ্টি করি তাহাও প্রকৃত নহে! কে বলিতে পারে যে নয়ন অথবা দর্পণ আমাদের প্রতারণা করে না। আমাদের নয়নাভ্যন্তরে যাহা চিত্রিত হয় তাহাই মাত্র অনু-ভব করিতে পারি। কি আক্ষেপের বিষয় যে এই সুন্দর বিশ্ব মণ্ডলের প্রকৃত গঠন আমরা কখনই অবগত হইতে পারিব না।

তথাচ প্রকাণ্ড সূর্য্য মণ্ডল, চন্দ্র এবং তারকারাজি, পৃথিবী এবং সাগর, জগতের সমস্ত ভয়োদ্দীপক এবং বিস্ময়জনক পদার্থ আলোক-পক্ষে একটী অতীব ক্ষুদ্র গোলক মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে আগমন সংবাদ দিতেছে এবং আত্মা তাহাদের পরিচয় লাভ করিতেছে!

অনন্ত ব্যাপ্তি চক্ষুর নিকট পরাজয় স্বীকার করে। চক্ষু পলকে অসীম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কোটি কোটি যোজন দূরস্থিত তারকারাজিতে গমন করিয়াও ক্লান্ত নহে। নয়নের দৃষ্টি-বাঞ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না। চক্ষু সময়ের উপর অনন্ত আধিপত্য সংস্থাপন করে। ভবিষ্যতের প্রগাঢ় তিমির মানব চক্ষে ভেদ করিতে পারে না বটে, কিন্তু নিশীথ সময়ে ভক্তি-রস-বিহ্বল-মানসে যখনই আমরা আকাশ-মার্গে দৃষ্টিপাত করি, তখনই যুগ-যুগান্তর-বিশ্লিষ্ট আলোকমালা কত শত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নয়ন-কুটীরে বিশ্রাম করে। ফলতঃ চক্ষু সহকারে আমাদের অনন্ত ব্যাপ্তি এবং অনন্ত সময়ের উপলব্ধি হইয়া ভূতনাথ ভগবানের জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানই আমাদের এক মাত্র অমূল্য রত্ন। ইহাতেই আমাদের সকল আশা এবং সকল ভরসা। ইহার উপরই নির্ভর করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সকলের ঘৃণিত হইয়া অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া আনন্দ মনে দিনাতিপাত করেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে মানবের হিতকর সমস্ত বিষয়েরই মূলাধার—চক্ষু।

রজনী-প্রভাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুষ্প প্রতিমা।

প্রাতঃকাল—প্রকৃতি হাস্যময়ী—উষার হাসিতে জগৎ ভরা। সেই বিশ্বমোহিনী হাসি, হরেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরস্থ-উদ্যান-বিহারিণী একটী বালিকার অমল হৃদয়ে প্রতিফলিত ও অশোক-কুসুম-বিনিন্দিত-রক্তাধরে সুহাস্যে পরিণত হইতেছিল। বালিকার বয়স ঊনপঞ্চবর্ষ; রূপ—কমনীয়, দেখিয়া দেখিয়া নয়নের দর্শন-তৃষা নিবৃত্তি পায় না। উদ্যানে প্রস্ফুটিত পুষ্পের অভাব নাই: বালিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছিল। এ ফুলটী ভাল, এইটী তুলি—বলিয়া বালিকা একটী ফুল তুলিল ও আপন কুন্তলান্তরে সন্নিবেশিত করিল। ও ফুলটী আরও ভাল—বালিকা সেটীও তুলিল; তুলিয়া কর্ণে পরিল। উঃ ঐ গাছে অনেকগুলি ফুল, সব তুলিব—বলিয়া বালিকা আপন মনে অব্যক্ত-মধুর-স্বরে গান করিতে করিতে সেই মল্লিকাবৃক্ষের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিকচ কুসুমচয় একে একে সংগ্রহ করিল। শৈশবে চাঞ্চল্য অধিক—মনের স্থৈর্য্য নাই, বাসনার ইয়ত্তা নাই, ক্রীড়ায় অপার আনন্দ! বালিকা কৌতুকবশতঃ অঞ্জলিপূর্ণ কুসুমগুলি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল—জলধারার ন্যায় তাহারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, সে মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বৃদ্ধপরিচারিকা লক্ষ্মী সেই উদ্যান-মধ্যে আসিয়া সস্নেহ-বিস্মিত-স্বরে কহিল:—ও মা! এখানে চুপি চুপি আসিয়া

বুঝি তোমার এই হইতেছে! এমন ক'রে কি ফুল নষ্ট করিতে হয়!

বালিকা লক্ষ্মীর কথায় কিছু অপ্রতিভ হইল। পরে কহিল:—তবে ফুল লইয়া কি করে?

ল। দেবতাদের মাথায় দেয়।

বা। কেন?

ল। ফুল দেবতাদের মাথায় দিলে ভাল বর হয়—রাজ-রাণী হয়।

বা। তবে বাবা সে দিন কেন মার মাথায় ফুল দিয়াছিল?

এক্ষণে লক্ষ্মী বালিকার নিকট হারি মানিল—সস্মিত বদন প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সৌভাগ্যক্রমে বালিকা একটী প্রজাপতি দেখিয়া অন্য-মনস্কা হইল নতুবা পুনঃ প্রশ্ন করিলে লক্ষ্মীকে বিষম সঙ্কটেই পড়িতে হইত। সঙ্কট কেন?—লক্ষ্মী এক্ষণে মনে মনে যাহা বলিল, তাহাই না হয় ফুটিয়া বলিত:——প্রণয়ের উপাসনা! কিন্তু লক্ষ্মী, কি জানি, কিছু লজ্জিতা হইয়াছিল।

প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছিল। তাহার বিচিত্র পক্ষদ্বয় অবিরত কম্পিত—যেন আহ্বান করিয়া বলিতেছে: এস এস; একবার এখানে আসিয়া দেখ, সুন্দরে সুন্দরে মিলন কেমন সুন্দর, কেমন প্রীতিপ্রদ!

বালিকা প্রজাপতিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তা হইল। লক্ষ্মী নিবারণ করিবার মানসে সস্নেহস্বরে কহিতে লাগিল:—ও মা কুমু! ওখানে যেওনা, পায়ে কাঁটা ফুটিবে, গাছের কাঁটায় গা' ছিঁড়িয়া যাইবে।

বালিকার নাম কুমুদিনী—হরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোল্লিখিতা কন্যা।

কু। ফুটুক কাঁটা—আমি উহাকে ধরিব।

ল। প্রজাপতি ধরিতে নাই, ধরিলে বে হয় না।

কুমুদিনী সহসা নিবৃত্তা হইয়া কহিল :—কেন ?

ল। প্রজাপতি বর আনিয়া দেয়, উহাকে ধরিয়া রাখিলে বর আসিবে না, কাহাকে বে করিবে ?

কু। তোকে।

লক্ষ্মী এবার হাসিয়া ফেলিল। কুমুও তাহার হাসি দেখিয়া উচ্চ সপ্তকের পঞ্চমস্বরে হাসিয়া উঠিল কিন্তু কি জন্য লক্ষ্মী হাসিয়াছে, সরলহৃদয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ল। আমাকে কি বে করিতে আছে !

কু। তবে কাকে বে করিব ?

ল। তোমার বরকে।

কু। যাঃ তোর মিছে কথা। তুই ত ঐ কথা রোজই বলিস্, কৈ বর ত আসে না। আমি প্রজাপতিকে ধরি।

এই বলিয়া কুমুদিনী পুনরায় প্রজাপতির অনুসরণ করিতে করিতে কণ্টকময় গুল্ম-সমাচ্ছন্ন পথে যাইয়া পড়িল। পাছে বালিকার কোমল দেহ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় লক্ষ্মী আর নিরস্তা থাকিতে পারিল না—সুহাস্য মুখে বালিকার প্রতি ধাবমানা হইল।

ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনোভাব বুঝিতে সুকুমারমতি শিশুগণের কি অদ্ভুত নৈপুণ্য ! বালিকা লক্ষ্মীর ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে সে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। কুমু কোন কথা না বলিয়া গুল্মান্তরালে উপবেশন করিল ও চম্পক-কলি-সদৃশ অঙ্গুলিচয় সমন্বিত করদ্বয় দ্বারা মুখাবরণ পূর্ব্বক কহিল :—ঝি ! আমি লুকাইয়াছি, তুই আমাকে ধরিতে পারিবি না।

ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মী কুমুদিনীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিল, এক্ষণে

সযত্নে তাহাকে কক্ষে তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল :—ভাল লুকাইয়াছ! তোমার বালাই লইয়া মরি!

কুমু, সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া বড় গোল করিতে আরম্ভ করিল। তুই আমাকে ছাড়িয়া দে—আমি প্রজাপতিকে ধরি—না ছাড়িলে, আর আমি তোর কোলে আসিব না—বলিয়া কুমুদিনী লক্ষ্মীর কক্ষ হইতে অবতরণ করিবার জন্য শারীরিক ও বাচনিক নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কুমু বিবাহের কথা শুনিতে ও বধূ সাজিয়া বেড়াইতে অতিশয় ভাল বাসিত। লক্ষ্মী তাহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত তাহার সুকোমল হৃদয়-তন্ত্রীর সেই তার স্পর্শ করিতে সঙ্কল্প করিয়া কহিল :—ও মা কুমু! স্থির হও—দেখিও আজ তোমার বর আসিবে—চল, তোমায় ফুল দিয়া সাজাইয়া দি।

তখন কুমু স্থির হইল। লক্ষ্মী তাহাকে উদ্যান মধ্যস্থ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত বেদীর উপর বসাইয়া কতকগুলি প্রস্ফুটিত প্রসূন চয়ন করিয়া আনিল ও কুমুর পুষ্পময় অঙ্গে স্তরে স্তরে পুষ্প সন্নিবেশিত করিয়া, নির্নিমেষ নয়নে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল।

এই সময়ে উদ্যান মধ্যে হরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন। কুমু দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল :—দেখ বাবা! আমায় কেমন দেখাইতেছে। আজ আমার বর আসিবে।

হরেন্দ্রনাথ সুহাস্যমুখে কুমুকে বক্ষোপরি তুলিয়া লইয়া বিমলানন্দ অনুভব করতঃ তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন ও কহিলেন :—বেস্ দেখাইতেছে, ঠিক যেন পুষ্প-প্রতিমা!

——০——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ঃ—

পরিবর্ত্তন

মেদিনীপুরের রাজপথ পার্শ্বে একটী উদ্যান বেষ্টিত ক্ষুদ্র অট্টালিকা। তন্মধ্যে বিচিত্র প্রস্তরখচিত কক্ষতলোপরি একজন পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তক—উপাধান রহিত ও অস্থির; নয়ন-যুগল—আরক্তিম ও অর্দ্ধ নিমীলিত। পরিধেয় বসন কটিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তিনি মুহুর্মুহুঃ কম্পিত-কর-পল্লব দ্বারা তাহাকে স্বস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দুষ্ট বসন প্রতিক্ষণেই তাঁহার যত্ন বিফল করিতেছে। অদূরে একজন ভৃত্য দুইটী বোতল ও একটী কাচবিনির্ম্মিত পানপাত্র লইয়া বসিয়া আছে। উল্লিখিত বোতলদ্বয়ের মধ্যে একটী শূন্য, অপরটী অর্দ্ধনিঃশেষিত পানীয় পরিপূর্ণ। কক্ষ নিস্তব্ধ—কক্ষস্থ ব্যক্তিদ্বয় উভয়েই নীরব। ক্ষণকাল পরে প্রভু ভৃত্যকে জড়িতস্বরে কহিলেন —ওরে গোব্‌রা! আর এক গেলাস দেত।

ভৃত্যের নাম গোবর্দ্ধন—জাতিতে সদ্গোপ।

গোবর্দ্ধন বাম হস্তে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে সঙ্কুচিত স্বরে কহিল:—আজ্ঞা—আজ—অনেক ——বাক্যশেষ না হইতে হইতেই প্রভু কঠোরজড়িতস্বরে কহিয়া উঠিলেন:—চুপ রও you devil of a servant—তোর বাবার কি?—বুঝে রাখ্ আমি খা'ব আর তুই দিবি।

গোবর্দ্ধন, কি করে, কোন উপায় না দেখিয়া বোতলস্থ পানীয় অল্পে অল্পে পান-পাত্রে ঢালিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে প্রভু বিরক্ত হইয়া কহিলেন:—ঢাল্ ঢাল্ বেটা পাজি—আজ এত সরু সুতা কাটচিস যে? মরবি না কি?—

গোবৰ্দ্ধন অস্ফুটস্বরে কেবল কহিল:—আজ কে মরে তার ঠিক কি?

প্রভু গোবর্দ্ধনের হস্ত হইতে পূর্ণ পান-পাত্র গ্রহণ করিয়া তাহা বিকৃত মুখে নিঃশেষিত করিলেন ও পূর্ব্ববৎ জড়িতস্বরে কহিতে লাগিলেন:—গোব্রা! বাপু গোবর! আমি তোমার উপর বড় প্রীত হলুম—এক্ষণে সেবকরাজ! বরং বৃণু—আশীর্ব্বাদ করি তুমি জন্ম জন্ম হাস আর তোমার ঘুঁটে ভায়ারা পুড়ে মরুক্।

গোবৰ্দ্ধন ভীতি বিস্ফারিতনেত্রে অবাক্ হইয়া রহিল। প্রভু পুনরপি কহিতে লাগিলেন:—Speak my man চুপ করে রহিলি যে?

গো। আজ্ঞে—না—

প্র। হাঁ—আমায় খুসি রাখ্‌তে পারিলে তোর ইহ কালেরও ভাল, পরকালেরও ভাল। আমার মতন বাবু এখানে কয়জন আছে?—জমীদার বল্, সাহেব বল্—সব তাই আমার এই হাতের ভিতর। আমি যে দিন চক্ষু বুজিব সে দিন তোর মেদিনীপুর ওজোড় হবে—বুঝেচিস্ ত?

গো। আজ্ঞে——

পরে অস্ফুটস্বরে কহিল:- কি বিপদ! এখন আজ চক্ষু বুজিলে যে বাঁচি।

প্র। Take care গোব্‌রা! তুই আমার মরণ টাঁকচিস্—well, I will cut you off with a shilling—মরবার সময় এক পয়সাও দিয়ে যাব না——

গোবৰ্দ্ধন প্রভুর ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্য কথা পাড়িবার সুযোগ পাইল। সে কহিল:—বাবু! একটা কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি: আজ সকালে জমীদার বাবু, এ কথা সে কথার পর, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে গোবৰ্দ্ধন

তোমার বাবু কি বে করিবেন না?—আমি বলিলাম, আজ্ঞে করি-বেন বৈ কি—তা আপনি বে করে ফেলুন—

প্র। What! বিবাহ?—বিবাহ'—গোবরা' fool' আমার হৃদয়ের ক্ষত স্থানে আঘাত ক'রে প্রাণে কি বেদনাই দিলি—আ—হা—হা!—What says the poet?—oh—"none but the brave"—yes—"none but the brave deserves the fair"—আমি brave নই—আমি Coward,—আমি পাষণ্ড—সিদ্ধিদাতা' মদ্য-দাতা'—দণ্ড-দাতা' শুঁড় গুটাইয়া লও—বাহন বেখোরে মারা যায় যে'—হা!—but now to the point: আর এক গেলাশ দে।

গো। আজ্ঞে, আর না। এই জন্যই লোকে আপনার নিন্দা করে।

প্র। নিন্দা—আমার নিন্দা—আমি কে তা জানে না—আমি ডাক্তার—আমি বিজয়কৃষ্ণ—বিজয়কৃষ্ণ! চিকিৎসকবর বিজয়কৃষ্ণ মদ্যদাস! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! অদ্ভুত কেন?—পরিবর্ত্তনই জগ-তের রীতি কিন্তু মনুষ্য তাহা বুঝে না, মনে করে চিরকাল এক ভাবেই যাইবে! বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, যথায় পূর্ব্বে মুক্তাপ্রভ নির্ঝর সমন্বিত উত্তুঙ্গ গিরিমালা শোভা পাইতেছিল তথায় এক্ষণে অগাধ অতলস্পর্শ; কোথায় নিবিড় অরণ্যানির পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব-সৌধ-রাজি-বিরাজিত সুরম্য নগর; কোথাও ভীষণ অগ্নি-সংকাশ মরুভূমির স্থানে নয়ন-প্রীতিকর সুনীল জলরাশি। অন্তর্জগতেও সেই রূপ: সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ—দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ" এই বাক্য যে মহাত্মার লেখনীর স্বর্ণমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত কবি, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক! শুদ্ধ সুখ দুঃখ কেন? অন্যান্য মনোবৃত্তি নিচয়ের পরিবর্ত্তও অসম্ভব নহে: আজ

যাহাকে দেখিয়া সর্পের ন্যায় ঘৃণা করিতেছ, ভয় করিতেছ, কাল হয়ত, তাহাকেই হৃদয়-স্নিগ্ধ-কর-জ্ঞানে সযত্নে বক্ষোপরি ধারণ করিবে—সেই প্রাণহর কালকূট মৃতসঞ্জীবনী অমৃত ধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। বিজয়কৃষ্ণের তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে সুরাকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন কিন্তু এক্ষণে তাহাই তাঁহার পানীয়। মানবের অবস্থাতেও সেই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়ঃ অবনতির পর উন্নতি ও উন্নতির পর অবনতি। তবে লোকে কি নিমিত্ত বিধাতার দোষ দেয়? না, ভ্রম বশতঃ—মনুষ্য দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না। একবার আকাশ পথে চাহিয়া দেখ, একবার অংশুমালীর উন্নতি ও অবনতি দেখিয়া মনে মনে পর্য্যালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে যে চিরকাল এক ভাবেই যায় না; উন্নতি হইলেই অবনতি আছে। বিজয়কৃষ্ণের সৌভাগ্য-সূর্য্য উন্নতির চরম-সীমায় উঠিয়াছিল এক্ষণে অবনতির পথে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্র-ব্যবহার নাই—লোকের ততদূর বিশ্বাস নাই, ভক্তির সেরূপ দৃঢ়তা নাই। তিনি এক্ষণে প্রায়শঃ ব্যবহার-হীন—তিনি মদ্যদাস! কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তার।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহম্মদের বাণিজ্য শিক্ষা—খাদিজার পাণি গ্রহণ—পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ—গ্রেব্রীলের আবির্ভাব—মহম্মদ অবতার।

আবুতালিব মহম্মদকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যতদিন তিনি স্বদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন মহম্মদ একটী পাঠশালায় নিযুক্ত থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বাণিজ্যব্যপদেশে জ্যেষ্ঠতাত দেশান্তর-গমনোৎসুক হইলে তিনিও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতেই তিনি বাণিজ্য-শিক্ষাকরণোদ্দেশে উষ্ট্রপৃষ্ঠে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। এই রূপে নানাস্থান পর্য্যটন, নূতন নূতন দৃশ্য সন্দর্শন ও বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া তাঁহার নব উদ্দীপ্ত কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে করিতে তিনি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সারগিয়স নামক জনৈক খৃষ্টপরিব্রাজকের সহিত মহম্মদের আলাপ হয় এবং তাঁহার নিকট হইতেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্ব সকল অবগত হন। কেহ কেহ বলেন এই সন্ন্যাসীর নাম সারগিয়স নহে, বহিরো নামে ইনি প্রসিদ্ধ। আবার অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিয়া কহেন যে সারগিয়স ও

বহিরো নামক দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন না, এক ব্যক্তিই ঐ দুই নামে আখ্যাত হইতেন, এবং তিনিই তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহম্মদকে খৃষ্টসম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ প্রদান করেন। প্রথিত নামা ভন হেমার মহোদয় বলেন মহম্মদ-জননী আমিনা এক সম্ভ্রান্ত য়িহুদীয় কন্যা, বালিকাবস্থায় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট হইতে মহানুভব খৃষ্টের বিষয় কিছু অবগত হইয়া সমস্ত বাইবেল পাঠ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া উঠেন এবং প্রাগুক্ত পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ সংসাধন করিয়া লন। * এ বাক্য কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারি না। আমিনা যদি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনীই হইবেন, তবে পৌত্তলিক আবদুল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ মহম্মদের পিতাও খৃষ্টান ছিলেন না। ভন হেমারের মত যদি বাস্তবিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমিনা খৃষ্টধর্ম্মকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া পুনরায় পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদের প্রকৃতি দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, দিন দিন পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইল। জনশ্রুতি আছে, একদিন মহম্মদ ভ্রমণ করিতে করিতে লোহিতসাগর সমীপবর্ত্তী ইলা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব্বে এই গ্রামে কতিপয় য়িহুদী বাস করিত; তাহারা সকলেই ঘোর পৌত্তলিক, এই জন্য ঈশ্বর ক্রোধপরবশ হইয়া বৃদ্ধগণকে শুকরে ও যুবকগণকে বানরে পরিণত করিয়া সে স্থান মানবপরিশূন্য করিয়াছিলেন। এবংবিধ অদ্ভুত উপাখ্যান সকল

* Von Hammer's History of the assassins. Ch. I. দেখ।

শ্রবণ করিয়া তিনি যে প্রতিমা পূজার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া পড়িবেন তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ক্রমশঃ তিনি বিষয় কর্ম্মেও পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার ন্যায় মার্জ্জিতবুদ্ধি, শ্রমশীল, বাণিজ্যকুশল ও সচ্চরিত্র যুবা সমগ্র আরব দেশে অল্পই পরিলক্ষিত হইত। মক্কানগরীতে খাদিজা নাম্নী এক ধনশালিনী রমণী বাস করিতেন, তিনি যুবার গুণগ্রাম সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অতুল বিষয় সম্পত্তির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সুচতুর মহম্মদ শীঘ্রই খাদিজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকের কার্য্যতৎপরতা, বিনয়-নম্র-স্বভাব, যৌবন-সুলভ-কমনীয়-কান্তি ও অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করিবার বাসনা খাদিজার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল। খাদিজার বয়ঃক্রম এক্ষণে চত্বারিংশ বৎসর মাত্র, তিনি মহম্মদকে বিবাহ করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন কিন্তু সহসা হৃদয়-কপাট কিরূপে উন্মুক্ত করিবেন, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। একদা জনৈক বিশ্বাসী বিচক্ষণ দাসকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বান করিয়া মনোগত অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিলেন ; সে তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কার্য্যকুশল সুচতুর দাস, মহম্মদকে বিরলে পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল : "মহাশয়! আপনার এত বয়স হইয়াছে, বিবাহ করেন না কেন?" মহম্মদ উত্তর করিলেন "আমি দরিদ্র, অর্থ পাইব কোথায় ; নিজের উদরান্ন জুটিয়া উঠে না, বল দেখি ভার্য্যার গ্রাসাচ্ছাদন কোথা হইতে সংগ্রহ করিব?"

"আচ্ছা মহাশয়! যদি কোন উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরী আপনাকে পতিরূপে বরণ করিতে অভিলাষিণী হন, আপনি কি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হন না?"

" তিনি কে ? "

" খাদিজা "

" তাহা কি সম্ভব ! খাদিজা ' কর্ত্রী, নিতান্ত অসম্ভব !! "

" আমি সংঘটন করিয়া দিতেছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। "

দাসের আশ্বাস বাক্য কার্য্যে পরিণত হইল—চত্তারিংশ বর্ষীয়া প্রৌঢ়ার সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবকের পরিণয়কার্য্য সত্বর সুসম্পন্ন হইল। খাদিজার বৃদ্ধ পিতা প্রথমে আপত্তি করিলেন, খাদজা শুনিলেন না, কাজেই বৃদ্ধকে সম্মত হইতে হইল। আবুতালিব উৎসবে যোগ দিলেন। দুইটী উষ্ট্র হত্যা করিয়া মহম্মদ একটী ভোজের আয়োজন করিলেন, খাদিজার সখী ও সহচরিবর্গ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। একটী বিষয় উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। খাদিজা বিধবা রমণী, ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুইটী স্বামী পরলোক গমন করেন ; তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্বামী মহম্মদকে লাভ করিয়া আরববালা সুখ সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। যতদিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, মহম্মদ আর বিবাহ করেন নাই। এই স্ত্রীর গর্ব্ভে মহম্মদের চারিটী সন্তান জন্মে ; তন্মধ্যে একটী মাত্র পুত্র, ইহার নাম কাসিম, এই কারণেই কখন কখন মহম্মদ আবু কাশিম অর্থাৎ কাশিমের পিতা বলিয়া অভিহিত হইতেন। শৈশবাবস্থাতেই কাশিম কালগ্রাসে নিপতিত হয়। মহম্মদ এই ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীর ভর্ত্তা হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিপতি হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই মহম্মদের চরিত্র বিমল ও পরিশুদ্ধ, স্বভাব নম্র, প্রকৃতি ধীর ও শান্ত ; কখন বৃথা আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইতেন না, মদিরাপানের প্রতি তাঁহার ঘৃণা বিজাতীয়, সত্যের অপলাপ তিনি কখন সহ্য করিতে পারিতেন না ; মুখশ্রী গম্ভীর ও প্রশান্ত, অহরহঃ

চিন্তামগ্ন, এত বড় ধনবান হইয়াও তিনি কখন এক কপর্দ্দকও বৃথা ব্যয় করিতেন না; তাঁহার এবম্বিধ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহাকে "আল্ আমিন" অর্থাৎ অতি বিশ্বাসী বলিয়া ডাকিত। এই সময় ওয়ারকা নামক এক ব্যক্তি মক্কায় বাস করিতেন। তিনি প্রথমে য়িহুদী ছিলেন, পরে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, ইঁহা দ্বারাই বাইবেল গ্রন্থ সর্ব্ব প্রথমে আরবভাষায় অনুবাদিত হয়। মহম্মদ তাঁহার নিকট থাকিয়া বাইবেল শিক্ষা করেন। এখন মহম্মদ ধর্ম্মালাপ, সাধন ভজন ও পারমার্থিক চিন্তায় সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখন কখন মাসাবধি উপবাসী থাকিয়া অতি নিভৃত প্রদেশ হেরা নামক পর্ব্বতগুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ফলমূল দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া দিবস রজনীর অধিকাংশ সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। জগৎ ভুলিতেন, সংসার ভুলিতেন, স্ত্রী পুত্র সমস্ত ভুলিতেন, বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া আপনাকেও ভুলিয়া প্রেমময় অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অপার্থিব প্রেমে নিমগ্ন হইয়া একবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। একদা ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে মহম্মদ এই নিভৃত গুহামধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সহসা চমকিত, ত্রস্ত হইয়া নেত্রোন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। অচিরাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন গুহা আলোকিত, এক দিব্য পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, মহম্মদ তাঁহার বিবিধ রত্ন বিভূষিত রজতগিরিসন্নিভ স্বর্গীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক দূত কহিল ভয় নাই পড়িয়া দেখ," এই বলিয়া বহুমূল্য একখণ্ড বস্ত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিল। মহম্মদ কহিলেন, "আমি পড়িতে জানি না।"

"পড়, পারিবে ; অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম লইয়া পাঠ করিতে প্রয়াস পাও, পারিবে।" নিমেষ মধ্যে অমনি তিনি বিনায়াসে আদ্যোপান্ত সমুদয় পাঠ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ঈশ্বরের কতিপয় আজ্ঞা লিপিবদ্ধ ছিল। ইহাই কোরানের উপক্রমণিকা। "গৃহে যাও, ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও, সফল হইবে ; আমি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার নাম গ্রেব্রীল।" দেখিতে দেখিতে দূত নিমেষ মধ্যে শূন্যে অন্তর্হিত হইল। সত্বর-পদ-সঞ্চারে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মহম্মদ সমুদয় বৃত্তান্ত প্রিয়তমা গেহিনী সমীপে অভিব্যক্ত করিলেন। খাদিজা একাগ্রচিত্তে সমস্ত শুনিলেন। আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে মহম্মদকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "প্রাণাধিক! বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তোমার হস্তে যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিলেন, প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ কর। ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর। ঈশ্বর যাহার সহায় তাহার ভয় কি?" বাইবেল অনুবাদক মহম্মদের পূর্ব্ব পরিচিত ওয়ারকা এতৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহম্মদ! বিমর্ষ কেন? উঠ, নিশ্চয়ই তুমি ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।" এবম্প্রকার আশ্বাসবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া মহম্মদ বাস্তবিক ভয় ও লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন মহম্মদের মূর্চ্ছারোগ ছিল ; তিনি এই রোগাক্রান্ত হইয়া নানারূপ অদ্ভুত খেয়াল দেখিয়া অনর্গল প্রলাপ বকিতেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেই সুচতুরা খাদিজা তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিতেন, কাজেই সাধারণ ব্যক্তি বর্গ তাঁহার এই মূর্চ্ছারোগের বিষয় অস্পষ্ট অবগত ছিল। চিন্তা ও উপাসনা দ্বারা পীড়া ক্রমশঃ

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এই অবস্থাতেই তিনি ইলা গুহাভ্যন্তরে গেব্রীলের আবির্ভাব সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই রূপ ত অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ গেব্রীলের আবির্ভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

মহম্মদ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। খাদিজা, তাঁহার অনুগত স্নেহাস্পদ ক্রীতদাস জিয়দ, আবুতালিবের পুত্র আলি, আবুবেকার, ওসমানপ্রমুখ মক্কানগরীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শীঘ্রই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। নূতন সমাজসংগঠনের ইচ্ছা তাঁহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল; কিন্তু তিনি বৈরিবৃন্দে পরিবৃত, স্বীয় অভিলাষ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবেন এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। ক্রমাগত তিন চারি বৎসর অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর তিনি চল্লিশটী শিষ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুকুমারমতি বালক, তরলমতি যুবক, অবলা অঙ্গনা ও অনক্ষর ক্রীতদাস। গোপনে সভা করিয়া ইহাদের লইয়াই সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্নি কতদিন বস্ত্রাবৃত থাকে! যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এতদিন তিনি সযত্নে হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা প্রদীপ্ত শত জিহ্বা বহির্গত করিয়া সামাজিক কুপ্রথা ও কুনীতি সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবার জন্যই যেন দিগ্ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ধূমায়মান বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর কি সহজে নির্ব্বাপিত হইবে? একটী প্রকাশ্য সভায় মহম্মদ আপনার অভিপ্রায় সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে অভিব্যক্ত করিলেন। অমনি লোষ্ট্রের পর লোষ্ট্র, যষ্টির পর যষ্টি, তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ হইল। তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত, শত্রুর সংখ্যা অনেক, নিরুপায় হইয়া কাজেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। আবু সোফিয়ন তাঁহার বিপক্ষ দলের অধিনায়ক;

মক্কায় তাঁহার ক্ষমতা অসীম। মহম্মদের বৈবাহিক আবুলাহার, সোফিয়নের ভগ্নি ওম্‌জিমিয়নকে বিবাহ করেন, তিনিও মক্কার একজন ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তিনি মহম্মদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সোফিয়নের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পিতার প্ররোচনায় মহম্মদের কন্যা রোকেয়াকে তদীয়া স্বামী বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অভাগিনী পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল। এই রূপ দুর্দ্দান্ত বৈরিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া মহম্মদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পুরঃসর তিনি পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, পুনরায় তিনি গেব্রীল দূতের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইলেন, হৃদয়কে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিবেন কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবুলাহার সহিত তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সত্বর সে বন্ধন দ্বিধা ছিন্ন করিয়া তদীয় ধর্ম্মাবলম্বী এক উপযুক্ত ভর্ত্তার হস্তে স্বীয় দুহিতারত্নকে সমর্পণ করিলেন। আপন দলবল লইয়া পুনরায় আর একটী সভা আহ্বান করিলেন। এই সমিতিক্ষেত্রে শিক্ষিতাশিক্ষিত বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাগম হইযাছিল। আবুসোফিয়ন তদীয় সহোদরা ওম্‌জিমিয়ন্‌ এবং আবুলাহার তিন জনেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। ওম্‌জিমিয়নের বিদ্রূপ ও হাস্যধ্বনিতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল। সেই কোলাহল ভেদ করিয়া মহম্মদ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। অমনি আবুলাহার রোষ কষায়িত ভ্রূকুটিকুটিল লোচনে মহম্মদের দিকে একবার চাহিলেন। মহাদেবের যে কটাক্ষে রতিপতির সুন্দরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, এ কটাক্ষ তাহা অপেক্ষাও তীব্রতর, কিন্তু মহম্মদের হৃদয় আর কাঁপিল না। তিনি অচলবৎ অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জলদ-

গম্ভীর স্বরে স্বাভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। লাহার আর থাকিতে না পারিয়া গালিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন; যখন দেখিলেন ইহাতেও কোন ফল দর্শিল না, ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারা হইয়া একখণ্ড প্রস্তর লইয়া মহম্মদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। সভা ভঙ্গ হইল, কিন্তু মহম্মদের হৃদয় এখন লৌহবৎ কঠিন, ভাঙ্গিল না। তিনি লাহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "যে দুরাচারের হস্ত আজ আমার অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হইল, আমি অভিসম্পাত করিতেছি, অচিরে দেহ সমেত তাহা হুতাশনে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ওম্‌জ্জিমিয়ন! পাপীয়সি! সাবধান! তুমিই তোমার ভর্ত্তার মৃত্যুর কারণ হইবে।"

কিছু দিন পরে আর একটী সভা আহুত হইল। মহম্মদ একটী ভোজ দিলেন। পানাহার পরিসমাপ্ত হইলে মহম্মদের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শুদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে সকলেই শ্রবণ করিলেন। প্রোৎসাহিত হইয়া জলদগম্ভীর রবে সগর্ব্বে মহম্মদ কহিলেন, "সুরগণ! ভ্রাতৃগণ! তোমাদের মধ্যে কে আজ হইতে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইবে? কে আমার সহকারী, মন্ত্রী ও স্নেহময় ভ্রাতা হইতে বাসনা কর?" সকলেই নিস্তব্ধ ও নীরব, অসাড় জড়ের ন্যায় নিস্পন্দভাবে সকলেই উপবিষ্ট। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আলি চিৎকার স্বরে কহিলেন, "আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, আমি আপনার সেবক ও শিষ্য হইয়া আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব, মরিতে হয় মরিব, তথাপি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।" বক্তার হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি অনেকক্ষণ স্বীয় বাহুযুগলদ্বারা আলির গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। বুকের নিকট টানিয়া আনিয়া আনন্দ ভরে একবার

অশ্রুপাত করিলেন। প্রকাশ্যে মহম্মদ আপনার ধর্ম্ম বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ আর তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। নিভৃত পর্ব্বত কন্দর হইতে যে ক্ষুদ্র নদীটী এক দিন অলক্ষিত ভাবে উৎসারিত হইয়া বহির্গত হইয়াছে, অগণ্য পাহাড় পর্ব্বত বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া খরধারে প্রবাহিত হইতে হইতে তাহা সাগরে গিয়া মিশাবেই মিশাবে। তাহার গতি রোধ করিতে যাও, স্রোতমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইবে।

মহিলা। *

(১ ম অংশ)

বহুদিনের পর আমরা একখানি কাব্য পাঠ করিলাম। এরূপ সুন্দর কবিতা আর কখন পাঠ করি নাই। কাব্য খানির নাম—"মহিলা"। কোন "বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকা" কবির নায়িকা নয়, "সমুদয় নারী-জাতি" কবির নায়িকা এবং এ রচনা—

শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।

এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ জগতে রমণী সুষুমার চরমোৎকর্ষ। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে সৌন্দর্য্যের এরূপ চাক্ষুষ প্রতিমা আর দ্বিতীয় নাই। সেই "মোহিনী মহিলার" "মহীয়সী মহিমা" সঙ্কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত

* ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

এই সুললিত কাব্যের সৃষ্টি। কেহ যদি বলেন যে মহিলার আবার মহিমা কি? তবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমরা কবির সমস্বরে বলিব—

" বিষয় মদিরা পানে মত্ত চিত যার,
তারে কি পারিব বুঝাইতে ?—
ধাতার করুণা মর্ত্ত্যে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে,
তার মনে আছে স্থির,
কাম-পিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর !—
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার ! "

*　　*　　*　　*　　*

" কখনো কি জান নাই স্বাস্থ্যের পতন,
পড়ো নাই পীড়নে অরির,
কখনো কি ভাঙ্গে নাই সম্পদ-স্বপন,
ভুঞ্জ নাই দুঃখ প্রবাসীর !
বান্ধব-বিহীন দেশে,
শীতাতপ ক্ষুধা ক্লেশে,
ঠেকে যদি না থাক কখন,
জান না, কি মধুচক্র মানবীর মন ! "
" ঝঞ্ঝাবাতে দোলে যথা বালু-বীচি-চয়,
চরে যথা ভীম পশুপাল,
গরজে গরলকণ্ঠে ফণী ভয়ময়,
বন যথা শ্বাপদ করাল ;—
সকলি বিকট যথা,
কামিনী কোমলা তথা,

বাঁচে তায় পথিকের প্রাণ ;—
অবনি ! রমণী তব গরিমার স্থান ! ”

মানব চারিত্রে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে তদবধারণের এক মাত্র উপায় মানব চরিত্রের সম্যক পর্য্যালোচনা। নারী নরজাতির শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গ সুতরাং নারীচরিত্র পর্য্যালোচনা যে ফলপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে নিজের চরিত্র নিজে বুঝিতে অক্ষম সুতরাং নারী-চরিত্র যে সুচারু রূপে বুঝিবে ইহা আশা করা যায় না। এই নিমিত্ত নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। সেই কুসংস্কার দূরীকরণার্থ কবি “ মহিলা ” বিরচন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করি এবং তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কাব্য স্বভাবের ছায়াছবি। কবি “ মহিলা ”য় নারী চরিত্রের এমন সুন্দর ছবি তুলিয়াছেন যে তাহা একবার দেখিলে মনের তৃপ্তি হয় না। যতবার দেখি ততবারই দেখিতে ইচ্ছা করে এবং প্রতিবারেই বোধহয় যেন এ সৌন্দর্য্যটী পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। বাস্তবিক “মহিলা” নারী চরিত্রের একখানি সজীব চিত্র। কবি এক স্থলে নারীর সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এমন সুন্দর কবিতা বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

“ নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে,
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখীপরে,
সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে ! ”

"শূন্যমনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার!
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার!—
বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা!"

* * * * *

"পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!
পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা;
এলকেশে কে এল রূপসী!—
কোন্ বনফুল কোন্ গগণের শশী!!"

কবির উপমা দিবার চাতুর্য্যে আমরা মোহিত হইয়াছি। "বনফুল" ও "গগণের শশী"র পূর্ব্বে দুইটী "কোন্" কথা বসাইয়া তিনি কল্পনার যে স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

কবি রমণীর যে অলোকসামান্য চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও অতীব মনোহর।——

"সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,

মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাব ভাব রমণীর ;—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার-ফণীর !”

*　　*　　*　　*　　*

“ যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার !
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন !—
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনার,
হৃদে ক্ষোভ,—মূকের স্বপন !
মনের মতন কায় !—
কেমন বা মন তায় !!
কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু !
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধানে কি শোভন সেতু !”

নারী কেবল ভোগের পদার্থ নহে তাহা সপ্রমাণ করিতে কবি একটী চিত্র দিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।———

“ কেবল কি ভোগ সুখ করিয়া বিধান,
পুরুষে মজালে ললনায় ?
শূর হলো নর, ধরি করাল কৃপাণ,
পদ্মমুখী প্রেমের আশায় ;—
বিপদে না গণে অণু,
লক্ষ্য বিন্ধে, ভাঙ্গে ধনু,
একাকী অভীত শত রণে !—
সব ক্ষত পূরে প্রিয়া-প্রেম-প্রলেপনে !”
“ স্বদেশ ঘেরিলে শত্রু, কি কারণে নরে

করে হেন বিক্রম প্রকাশ ?
মারে, মরে, সীমন্তিনী, সন্ততির তরে !—
রণভূমে নারী করে বাস !—
গলাইয়া আভরণ
করে গোলা বিরচন,
বেণী কাটে গুণ বিনাইতে,
কেবা হেন, হেরি হেন না চায় মরিতে !"
"কামিনী কাতরা ত্রাসে—কে ভাষে এমন ?
দেখ খুলি গত কালদ্বার ;—
চিতোরে অনল-শিখা পরশে গগণ,
নারিগণে প'রে অলঙ্কার,
এলো কেশে দলে দলে,
হাসি মুখে কুতূহলে
ঢালে কুণ্ডে নবনীত কায় !—
কে হেন মরিতে পারে কৌতুকে খেলায় !"

পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্ণনা অতি প্রগাঢ়ভাববিশিষ্ট। আমরা দুঃখিত হইলাম যে স্থানাভাবে অবতরণিকা হইতে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তার পর "মাতা"র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বর্ণনা পাঠ করিলে চিত্ত পুলকিত হয়।——

"সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া,

হে জননী কর পুনঃ বালক আমায়!
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো বিষয়ের রণে!--
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম স্বর্গ কথা কিছু নাই মনে!—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে!"

* * * *

"কোন সুখ স্বপ্ন কথা,
অন্তরে জাগিছে যথা,
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে;
যেন বা প্রবাস বাসে,
দূর হ'তে ভেসে আসে,
দেশ-প্রিয় গীত খণ্ড, সান্ধ্য সমীরণে;
বৃদ্ধকালে অন্বেষিয়া,
পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া,
স্বগ্রাম সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর;
জাতিস্মর হৃদে হেন,
প্রথম প্রকাশ যেন,
বিয়োগ-বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর;
তুল্য এবে এ সব সে শৈশব স্মৃতির!"

স্নেহপূর্ণ জননীর অবিচলিত মমতার বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী।

"কভু ভার-নিপীড়িতা
বসুন্ধরা বিচলিতা;

দোষ পেলে রোষ হয় উদয় পিতায় ;
সরসীর সুধা-পয়,
হিমপাতে শিলা হয় ;
সতত না পূর্ণ রয় সুধাংশু সুধায় ;
করে মেঘ ধারা পাত,
কভু ঘটে বজ্রাঘাত ;
জগৎপ্রাণ, প্রাণ হরে মাতিয়া বাত্যায় ;
রবির মুখের হাসি,
বারিদে আবরে আসি ;
সমান প্রকৃতি কারু দেখা নাহি যায় !—
চির অবিকারী মাতা মমতা তোমায় !"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে গর্ভবাস বহুদুঃখপূর্ণ। কবির মত তাহা নহে।——

"ধরাপরে করি বাস,
গর্ভবাসে পায় ত্রাস,
ফণি-তুণ্ড মুণ্ডে, শঙ্কা মধুমক্ষিকায় !
আহার আহর তরে,
মরিতে কি শ্রম-জ্বরে ?
পারিত কি রাজকর পীড়িতে তথায় ?
কাণে কাণে কহি কথা,
আশা কি আসিয়া তথা,
নাচাইত বানাইয়া বাতুল তোমায় ?
হিংসা-কীট প্রবেশিয়া,
দাঁতে কি কাটিত হিয়া ?
ছিল কি কৃপাণ, বাণ, কামান তথায় ?

নিদ্রা কি হ'ত না পর-নারীর চিন্তায় ? ”

শেষে “ মাতৃস্তুতি ”। ইহার সম্যক্ গুণ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। আমরা এইটী উদ্ধৃত করিতেছি বলিয়া যে এইটীই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহা নহে, যেটী পড়িবেন সেটীই উৎকৃষ্ট।——

“ জনন, পালন, পুনঃ শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ ;—
যাঁর প্রেমসিন্ধুপরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্নমনা জননী আমায় ! ”

এ কাব্যখানি আপনিই আপনার সমালোচনা। উদ্ধৃত করিয়া মনে তৃপ্তি জন্মায় না, যে স্থান খুলি সে স্থানই মধুর। আমরা বহুদিন এমন সরল, সতেজ ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাঠ করি নাই। এরূপ রচনাচাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য বঙ্গীয় কবিতায় অতি বিরল। সুরেন্দ্র হৃদয়ের কমনীয় ভাব-সমূহ বর্ণনা করিতে অদ্বিতীয়। তাঁহার একটী একটী পদবিন্যাস এক একটী ভাবের উৎস স্বরূপ। রমণীর চরিত্র আদর্শ-চরিত্র। সেই আদর্শ-চরিত্রের আদর্শচিত্র দর্শন করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি।

আমরা প্রকাশক দেবেন্দ্র বাবুকে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি যেন আমরা ত্বরায় মহিলার দ্বিতীয় অংশ দেখিতে পাই।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই——যে কবি কুসুমকোমল তুলিকায়, কল্পনার বিচিত্রবর্ণে জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্মরণীয় নাম ও কীর্ত্তি যেন প্রতি গৃহে মুক্তকণ্ঠে গীত হয় !

শব্দশাস্ত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

বর্ণপ্রভেদক কারণ সমূহের মধ্যে আমরা পূর্ব্বে স্থান ও প্রযত্নের বিষয় বলিয়াছি ; এক্ষণে কাল ও স্বর বিবেচ্য। ইহারা ব্যঞ্জনবর্ণ প্রভেদের নিয়ামক নহে। স্বর ও কালভেদে কেবল স্বরবর্ণেরই বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। স্বরবর্ণ সকল অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ংই উচ্চারিত হয়। তজ্জন্যই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন যে "অচঃ স্বয়ং বিরাজন্তে"। স্থূলগণনায় স্বরবর্ণের সংখ্যা সমুদায়ে নয়টী। যথা অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ। মাহেশ্বর সূত্রেও এই নয়টী মাত্র স্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্, এ ও ঙ্, ঐ ঔ চ্ (১)। তবে ইহাদের কালকৃত ও স্বরকৃত ভেদ বশতঃ অনেক অবা-

(১) আচার্য্য সোমদেব ভট্ট সঙ্কলিত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে লিখিত আছে, উপবর্ষ পণ্ডিতের বররুচি (কাত্যায়ন) ব্যাড়ি ও পাণিনি এই তিনজন প্রধান ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাণিনি অল্পবুদ্ধিতানিবন্ধন স্বশ্রেণী হইতে তাড়িত হইয়া নির্জ্জন বনে গমন পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট নিখিল বিদ্যালাভ করেন। অনন্তর মহেশ্বর প্রসাদাৎ—

অ ই উ ণ্ (১), ঋ ৯ ক্ (২), এ ও ঙ্ (৩), ঐ ঔ চ্ (৪), হ য ব র ট্ (৫), ল ণ্ (৬), ঞ ম ঙ ণ ন ম্ (৭), ঝ ভ ঞ্ (৮), ঘ ঢ ধ ষ্ (৯), জ ব গ ড দ শ্ (১০), খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ (১১), ক প য়্ (১২), শ ষ স র্ (১৩), হ ল্ (১৪), এই চতুর্দ্দশ সূত্র প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এতাবন্মাত্র সাহায্যে সূত্রস্থান, ধাতুপাঠ, গণপাঠ ও লিঙ্গানুশাসনরূপ চতুঃপ্রস্থানাত্মক সর্ব্বোৎকৃষ্ট একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর বিপক্ষগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া তদানীন্তন বৈয়াকরণগণের সর্ব্বোচ্চতম আসন অধিকার করেন। তদবধি তৎকাল প্রচলিত ঐন্দ্রাদি ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি এইসমস্ত সূত্র মহেশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে মাহেশ্বর সূত্র কহে।

এতদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহলে যে মাহেশ ব্যাকরণের কথা প্রচলিত আছে, তাহা বোধহয় এই

স্বর ভেদ ঘটিয়াছে। উচ্চারণ কালের বৈষম্য প্রযুক্ত স্বর সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, যথা হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ কাল একমাত্রা, দীর্ঘের দ্বিমাত্রা এবং প্লুতের ত্রিমাত্রা ; যথা

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্।

আবার আচার্য্যগণ মাত্রার এই প্রকার সময় নিরূপণ করিয়াছেন যে, যে সময়ের মধ্যে করতল জাঁনুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে পারে তাহাকে মাত্রা বলে ; যথা

"কালেন যাবতা পাণি পর্য্যেতি জানুমণ্ডলে।
সা মাত্রা কবিভির্জ্ঞেয়া উক্তং চামরবেদিভিঃ॥"

মহামুনি পাণিনি মাত্রাশব্দের সাহায্যে হ্রস্বাদির উচ্চারণ কাল নিরূপণ করেন নাই। তিনি উদাহরণ স্বরূপ উ--ঊ—ঊ—— এই হ্রস্বাদি উকারত্রয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক ইহাদের সমকালে উচ্চারিত স্বর সকলকে যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতশব্দে অভিহিত করিয়াছেন ; "যথা উকালোঽজ্ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতঃ।" ১,২, ২৭।

অ ই উ ঋ এই চারিটী স্বর প্রত্যেকে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে ত্রিবিধ। ৯ কারের দীর্ঘ নাই সুতরাং হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ ঐ ও ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই, কাজেই ইহারাও দীর্ঘ প্লুত ভেদে প্রত্যেকে দ্বিধাবিভক্ত। আবার হ্রস্বদীর্ঘাদি সংজ্ঞায় বিভক্ত স্বরও প্রত্যেকে তিন ভাগে বিভক্ত। যথা

মাহেশ্বর সূত্র দৃষ্টেই কল্পিত হইয়া থাকিবে, নচেৎ মাহেশ নামেকখ ব্যাকরণ ছিল তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না : তবে এতৎ সম্বন্ধে একটী উদ্ভট শ্লোক শ্রুত হওয়া যায় : যথা——

যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥

"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বোদীর্ঘঃ প্লুতশ্চেতি কালতো নিয়মা অচি॥"

অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর এবং হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ইহাদের কালকৃত ভেদ। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাধ্যায়ি-প্রণেতা মহর্ষি পাণিনি লিখিয়াছেন যে তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের ঊর্দ্ধভাগে উচ্চারিত স্বর উদাত্ত ও তদধোভাগে উচ্চারিত স্বর অনুদাত্ত এবং উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্বরূপ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত স্বর স্বরিত [২]। স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধ উদাত্ত ও শেষার্দ্ধ অনুদাত্ত [৩]। এসমস্ত ভিন্ন আর একপ্রকার স্বর আছে তাহাকে একশ্রুতি কহে। ইহাকে স্বরিত বলিলেও বলা যায়, তবে স্বরিতের ন্যায় ইহাতে উদাত্তানুদাত্তের বিভাগ নাই, এই মাত্র বিশেষ।

অতঃপর আমরা বর্ণসমূহের সংখ্যাবধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষাগ্রন্থ অনুসারে সমুদয়ে বর্ণ সমষ্টি ত্রিষষ্টি বা চতুঃষষ্টি। যথা—

"ত্রিষষ্টির্বা চতুঃষষ্টির্বর্ণাঃসম্ভবতোমতাঃ।
স্বরা বিংশতি রেকশ্চ স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ॥
যাদয়স্তু স্মৃতাহ্যষ্টৌ চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ।
অনুস্বারো বিসর্গশ্চ কপৌ চাপি পরাশ্রিতৌ।
দুস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্ঞেয়ো ৯ কারঃ প্লুত এব বা॥"

অর্থাৎ অ ই উ ঋ এই চারিটী স্বরের সংখ্যা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে সমুদয়ে দ্বাদশ, এ ঐ ও ঔ এই সমস্ত স্বরের হ্রস্ব নাই বলিয়া ইহাদের সংখ্যা অষ্ট, ৯ কারের দীর্ঘ নাই ; অতএব ইহার সংখ্যা এক, [প্লুত ৯ কারের কথা, পরে লিখিত হইবে]। গ্রন্থকার স্বর গণনা কালে উদাত্তা-

(১) উচ্চৈরুদাত্তঃ, ১, ২, ২৯। নীচৈরনুদাত্তঃ, ১, ২, ৩০। সমাহারঃস্বরিতঃ, ১, ২, ৩১।
(৩) তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্, ১, ২, ৩২।

দির প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; অতএব স্বর সংখ্যা সমুদয়ে একবিংশতি। আবার স্পর্শবর্ণের সংখ্যা পঁচিশ, অন্তঃস্থ বর্ণ উষ্মবর্ণ ও যম ইহারা প্রত্যেকে চারি চারিটী বলিয়া ইহাদের সংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ ; অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্মানীয় ইহাদের সংখ্যা চারি এবং ঈষৎ স্পৃষ্ট (ব্যঞ্জন) ঌ কারের সংখ্যা এক ; অতএব যাবতীয় বর্ণসংখ্যা ত্রিষষ্টি। আবার মতান্তরে প্লুত ঌ কার স্বীকৃত হয়, এমতে বর্ণ সংখ্যা চতুঃষষ্টি। মহর্ষি গণনা কালে সানুনাসিক যঁ বঁ প্রভৃতির পরিহার করিয়াছেন। এই প্রকার অঁ প্রভৃতিও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহম্মদ প্রচারক—প্রতিবন্ধক—অবমাননা—হামজার ক্রোধ ও প্রতিশোধ—ওমারের ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ—ওথমান সমভিব্যাহারে মহম্মদের শিষ্যগণের আবিসিনিয়ায় পলায়ন।

মহম্মদ শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে একদিন কোরাণ পাঠ করিতেছেন, মক্কাবাসী কতিপয় বৃদ্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহম্মদ, বাস্তবিকই যদি তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ হও, ইষা মুশা প্রভৃতি ভবিষৎ বক্তাগণের ন্যায় তুমিও অত্যদ্ভুত ক্রিয়া সমুহ সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তবে আমাদের চক্ষের

সম্মুখে একটী ক্রিয়াও কেন সম্পন্ন করিতেছ না?” মহম্মদ কহিলেন, ভ্রান্ত মনুষ্য! অলৌকিক কর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছ? কোরাণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখ, অবাক্ হইবে; আমি মুর্খ, আমার দ্বারা কি প্রকারে কোরাণ রচিত হইল? ইহা কি অধিকতর বিষ্ময়কর বিষয় নহে? অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইবার জন্য নহে, বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষাও মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আমি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।” একদিন তিনি প্রকাশ্য রাজবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন, অগণ্য ব্যক্তি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছে; কেহ বিদ্রুপ করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি, কেহ বিষ্ঠা কেহ বা কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া খল খল শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; কেহ বা অশ্রাব্য গান গাহিতে আরম্ভ করিল; কেহ তারস্বরে ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অশ্রাব্য কবিতাপাঠে প্রবৃত্ত হইল; আমরু ইবিন আল্ আস্ নামক এক সুরসিক যুবা সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন, তিনি মহম্মদের প্রতি বিদ্রুপ করিয়া প্রতিদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেন এবং সাধারণ ব্যক্তিপুঞ্জের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিকূলতাচরণ করিতেন, সুযোগ বুঝিয়া তিনিও এই দলে মিশ্রিত হইলেন; “মহম্মদ না আবদুলমোতালেবের পৌত্র? যে বালক উলঙ্গ হইয়া পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত, সেই আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা!! স্বর্গের সংবাদ সেই বালক হইতে আমরা পাইব! এ কৌতুক মন্দ নহে! বালকের স্পর্দ্ধা দেখিয়া বাস্তবিক অবাক্ হইয়াছি!” এই বলিয়া বৃদ্ধগণ ব্যঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় ভীমদর্শন প্রকাণ্ড এক ষণ্ড রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মহম্মদ দেখিলেন। শিষ্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া মহম্মদের সম্মুখে আনয়ন করিল। বৃষের শৃঙ্গদ্বয়ে দুই খণ্ড

পত্র বিজড়িত রহিয়াছে, মহম্মদ বৃদ্ধগণকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন ; ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল সেই দুই খণ্ড পত্রে লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। মহম্মদ বলিলেন, "আল্লা এই বলীবর্দ্দদ্বারা কোরাণের দুই খণ্ড পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিলেন।" অনেকে ইহাই বিশ্বাস করিল। কেহ কেহ বলিল "মহম্মদ অগ্রেই বৃষের শৃঙ্গে কাগজ জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সুযোগ বুঝিয়া খুলিয়া লইলেন।" আর এক সময় মহম্মদ এইরূপ বক্তৃতায় উন্মত্ত রহিয়াছেন, একটী সুন্দর বিহঙ্গম সহসা তাঁহার স্কন্ধদেশে শূন্যমার্গ হইতে উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দিয়া সহসা আবার শূন্যপথে উড়িয়া গেল। মহম্মদ বলিলেন, "স্বর্গীয় দূত পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া আল্লার আদেশ আমার কর্ণবিবরে বলিয়া গেল।" তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ অমনি বলিয়া উঠিল, "মহম্মদের এক পোষা পাখী আছে। কর্ণবিবরে শষ্য রাখিয়া মহম্মদ তাহাকে তাহা ভক্ষণ করাইতে শিখাইয়াছে, সেই শিক্ষা বশতঃই পাখী তাহার কর্ণবিবর মধ্যে চঞ্চু প্রবেশ করাইয়া দিল।" তিনি এইরূপ বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মন আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেন এবং উল্লেখ করা বাহুল্য, যে তাঁহার মনস্কামনা অনেক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার বিপক্ষদলের সংখ্যা এখনও অধিক থাকায় তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

এইরূপে মহম্মদের দলপুষ্টি ও নববিধানপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইতেছে দেখিয়া পৌত্তলিক আরববাসীগণের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। খোরিসবংশধরগণ একদিন আবুতালিবকে কহিল "হয় আপনি মহম্মদকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত করুন,

নয় আমরা সত্বরই তাহার প্রাণসংহার করিয়া দেশকে নিরাপদ করি।” “যাহা ইচ্ছা কর, আমি প্রাণান্তেও মহম্মদকে দূর করিয়া দিতে পারিব না।” অবিলম্বে তিনি মহম্মদকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। “যদি কেহ আমাকে তুষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া হত্যা করে, তথাপি নিশ্চয় জানিবেন, তাত! মহম্মদের সুদৃঢ় মন আর বিচলিত হইবে না। মৃত্যুকে ভয় করিয়া কে কবে অমর হইতে পারিয়াছে? তবে কিসের ভয়? ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম যতদিন না পাইতেছি ততদিন ইহা পরিত্যাগ করিব না; এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।” আবুতালিবের হৃদয় স্তম্ভিত হইল, নয়নপ্রান্ত হইতে এক বিন্দু অশ্রু বিমোচন করিয়া বলিলেন, “না পুত্র না, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে পরিত্যাগ করিব না; আমি জীবন দিয়াও তোমাকে রক্ষা করিব, আমারও ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।” আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, গৃহ হইতে দ্রুতপাদ সঞ্চারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। খোরিসগণ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতে লাগিল। একদা কাবা মন্দিরাভ্যন্তরে তাহারা মহম্মদের গলদেশ দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া চর্ম্মোপানহ দ্বারা উপর্য্যুপরি এত প্রহার করে, যে তাঁহার নাসিকা বিকৃত হইয়া যায় এবং গণ্ডদেশ হইতে এত অধিক পরিমাণে শোণিতপাত হয় যে তাঁহাকে বহুদিবস রুগ্ন শয্যায় শয়ান থাকিতে হইয়াছিল।

একদা একাকী মহম্মদ বিরলপ্রদেশে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, আবুজান নামক খোরিসবংশোদ্ভব তাঁহার জনৈক আত্মীয় সহসা তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সজোরে তাঁহার বক্ষস্থলে এক পদাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠানিক্ষেপ করিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিল। মহম্মদ একটী কথাও কহিলেন না। হামজা নামক তাঁহার

এক উদ্ধত-স্বভাব পিতৃব্য ছিলেন, তিনি মৃগয়াব্যপদেশে দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মহম্মদকে কিছু বিমর্ষ দেখিলেন। মহম্মদ স্বীয় অবমাননা বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক পিতৃব্য সমীপে অভিব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র হামজা শিহরিয়া উঠিলেন, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, দিক্ বিদিক্ জ্ঞান হারা হইয়া বৈরনির্যাতন মানসে তাড়িত বেগে গৃহ হইতে সেই ভৈরববেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আবুজানের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহার সম্মুখীন হইয়া এক নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। আবুজানের বন্ধুগণ সেই ঘটনাস্থলে সত্বরই সমুপস্থিত হইল কিন্তু আবুজান নিষেধ করিয়া কহিল, "কায নাই, বন্ধুগণ! হামজার সহিত বিবাদ করিয়া কায নাই। ভাই হামজা ক্ষমা করিও, মহম্মদের অবমাননা করিয়াছি—অপরাধী হইয়াছি—প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আর কেন?" অবজ্ঞাসূচক স্বরে তীব্ররবে হামজা কহিলেন, "বল প্রয়োগ করিয়া, নির্ব্বোধ! তোমরা কি মহম্মদকে প্রতিমা পূজায় অনুরক্ত করিতে পারিবে? পাথরের ঠাকুর আমিও মানি না, সাধ্য থাকে আইস আমার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হও।" তিনি সেই দিবসেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

মহম্মদের আর এক দুর্দ্দান্ত শত্রু সহসা অভিনয় স্থলে আসিয়া সমুপস্থিত। ইহার নাম ওমার। বয়স ২৬ বৎসরের অধিক হইবে না। দেখিতে সুশ্রী, আকৃতি সুদীর্ঘ, শরীরে সামর্থ্য যথেষ্ট, সাহস ও অসামান্য। এই ষড়বিংশ বর্ষীয় প্রিয়দর্শন হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি যুবক অবমানিত আবুজানের ভ্রাতৃতনয়। পিতৃব্যের এই বিজাতীয় অবমাননা বার্ত্তা শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক তিনি মহম্মদকে শমন সদনে প্রেরণ করিবেন। ইতি মধ্যে কোন আত্মীয় প্রমুখাৎ শুনিলেন

যে তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়েই মহম্মদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছে। প্রজ্বলিত অনলশিখায় ঘৃতাহুতি পড়িল। তাঁহার কোপাগ্নি ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সেই রুদ্রবেশে বজ্রগতিতে ভগ্নীর ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পতিপত্নী আনন্দবিহ্বল-চিত্তে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া একাগ্রমনে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। ওমার আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ভগ্নীর পৃষ্ঠদেশে সজোরে এমনই আঘাত করিলেন যে পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। শোণিত-পরিপ্লুত অবসন্ন শরীরটী নির্ম্মম ভ্রাতৃচরণে তাঁহার অজ্ঞাত-সারে বিলুণ্ঠিত হইল। ওমারের পাষাণহৃদয় এই বার বিগলিত হইল। ভগ্নীর এই শোচনীয় দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। কোরাণ কিরূপ, তাঁহার দেখিতে বাসনা হইল। তাঁহার ভগ্নী এই পবিত্র গ্রন্থখানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া ভগ্নীপতি সিয়ড্ তৎ-পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরাণ ওমারের কর্ণরন্ধ্রে যেন অমৃতসিঞ্চন করিতে লাগিল, তিনি মোহিত হইলেন, যাঁহাকে দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিয়াছিলেন, মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহারই পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে মহম্মদের ভবনে আসিয়া উপস্থিত; দ্বার অবরুদ্ধ। ধীরে ধীরে করাঘাত করিয়া মহম্মদকে ডাকিলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তিনি ঝটিতি মহম্মদের পদদ্বয় স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ অবাক্! ব্যাপার কি কিছুই অবগত নহেন। পরিশেষে সবিশেষ বিদিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লপ্রাণে তঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দাবাগ্নি হিমানীর ন্যায় শীতল হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার ঘোর বৈরী ওমার তাঁহার অভিন্নহৃদয়

বন্ধু ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত রহিলেন।

এই সমস্ত বিষয় চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া খোরিসবংশধরগণের অন্তরে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা সমবেত হইয়া মহম্মদের শিষ্যগণের প্রতি কঠোর নির্যাতন আরম্ভ করিল। রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ় রূপে হস্তপদ সংবদ্ধ করিয়া সারাদিন অনশনে জনমানবপরিশূন্য দিগন্তব্যাপী উত্তপ্ত মরুস্থানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে, ফেলিয়া রাখিয়া হৃদয় বিহীন পিশাচের ন্যায় অবিরত প্রহার করিত। বিজাতীয় যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, কাজেই বাধ্য হইয়া মহম্মদের শিষ্যগণকে পুনরপি পৌত্তলিকতার আশ্রয় লইয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে হইল। মহম্মদ দেখিলেন মহা বিভ্রাট সমুপস্থিত, তাঁহার এত দিনের তাবৎ পরিশ্রমই পণ্ড হইতে চলিল। একটী উপায় উদ্ভাবিত হইল। মহম্মদ তাঁহার আশ্রিতগণকে রক্ষা করিবেন মানস করিলেন। তিনি বুঝিলেন আরবদেশ হইতে পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই—নিস্তার নাই। কিন্তু পলাইবেন কোথায়? কে তাঁহার শিষ্যগণকে রক্ষা করিবে? তিনি জানিতেন আবিসিনিয়ার নরপতি একজন উন্নতচেতা খৃষ্টান। লোহিত সাগর পার হইয়া আবিসিনিয়ায় গমন করাও তত কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। তিনি তাঁহার আশ্রিতগণকে অবিলম্বে সেই নিরাপদ প্রদেশে প্রেরণ করিতে বাসনা করিলেন। তনয়া রোকেয়া, জামাতা ওথমান্ ও আর দশজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রী মিলিত হইয়া সচ্ছন্দে আফ্রীকা উপকূলে উত্তীর্ণ হইলেন। মহম্মদ আরব পরিত্যাগ না করিয়া আবুতালিবের সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ছাবা।

—:—

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। গৃহিণী বলিলেন—"না ভিজ্‌লে নয়?" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন—"স্ত্রীলোকটী মারা যায়।"

গৃ। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বি। কি জান পরোপকার পরম ধর্ম্ম।

শিশু সন্তানটী জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা তুমি যে বাইরে গেলে আমার পূজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমায় দাও।" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল "আমি অভাগা, পরোপকার! আমার উপকার কৈ? বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে একব্যক্তি বহির্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গা?" আগন্তুক উত্তর করিল—"হরমণির পরমকাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন—"যাও, যাচ্ছি।" কিন্তু গেলেন না।

পূজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটীকে জুতা দিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান্ হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে। আজ সেই ক্ষোভ হইল। তেমন বয়স নয় যে পুনর্ব্বার উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে সংসার নির্ব্বাহ হয়, মোটা ভাত মোটা কাপড়। তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগি-

লেন। এমন সময় বহির্বাটীতে আবার ডাক হইল—"বিশ্বনাথ বাবু বাটীতে আছেন ?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সংবাদ ?" আগন্তুকের নাম কেনারাম, উত্তর করিলেন—"মহাশয়ের কৃপায় যে চাকরিটুকু পাইয়াছিলাম তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায়বাহাদুর আমায় চোর ঠাওয়াইয়াছেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন "আমি কি করিব ?"

কে। দুই এক কথা আমার হ'য়ে বলিয়াদিবেন।

বি। আমার লাভ ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। "লাভ" এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই। সুতরাং উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে ?" বিশ্বনাথ বলিলেন—"আজ্ঞে, রাখ। ল্যাভ এ কথার অর্থ বুঝ না ?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন—"তাইত তাইত।" কেনারামের কার্য্য সিদ্ধি হইল না।

বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগেনা। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন—"পল্লীতে এমন কে আছে যে আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই ? কেহ লাট সাহেবের দাওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহার একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহার আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্যদশা কে দেখে ?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিশ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগেনা। ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পর পীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পর পীড়ন

করিব? ক্ষতি কি?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না, সাব্যস্ত হইল পর পীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন—ঘনঘটাবৃত রজনী, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন। এরূপ যাওয়া তাঁহার বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন। কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর চরমকাল উপস্থিত তাহা তিনি জানেন।

দেবেন্দ্র বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য কিন্তু তৎসত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশুসন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্র বাবুর রুগ্ন শয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্র বাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে।

কিন্তু একটী রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছেনা। সৌদামিনীকে পূর্ণ যৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্প বয়সে দুটী সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে "জল চাই, বা বাতাস চাই," কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই।

এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে

প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা আহার হইয়াছে?” একথায় সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না। বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ এইরূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেমন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন, কার্য্য সমান হইল কিন্তু সে ভাব নাই।—সৌদামিনীকে বলিলেন—“আমি শিয়রে বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর।” ক্ষুধার অনুরোধে যত হ'ক বা না হ'ক বিশ্বনাথের কথার অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন, সকলকে বলিলেন—“ডাক্তার বাবু আমায় বলিয়াছেন এত লোক সমাগম ভাল নয়।” সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরেধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন—“দেবেন্দ্র বাবু, দুটী ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।”

দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন—“বিশ্বনাথবাবু আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে আমি বাচিব?”

বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন—“আমি তা' বলিতেছিনা, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।”

দেবেন্দ্র বলিলেন——“বুঝিলাম কিন্তু সৌদামিনী একথা না শুনে।”

বিশ্বনাথ বলিলেন—“শুনা আবশ্যক। কারণ তিনি ব্যতীত আর অছি হইবার দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।”

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—“কেন, মহাশয় অছি হউন না?”

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন—“আমার ইচ্ছা বটে কিন্তু ভয়পাই, পাঁচজনে কি বলিবে?”

দে। পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সৌদামিনী ছেলে মানুষ, আমার সন্তান গুলির আর উপায় দেখি না।

বি। ভাল, ঝঞ্ঝাট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিন কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটী একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুদ দিয়াছে তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল—সৌদামিনীকে "মা" বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন—"আমার নীরদ কোথা"? নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস দাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন।—বলিলেন "মাগো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম তুমি তিন দিন আহার কর নাই। শোক কর, শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু এক এক বার ছেলে গুলিকে না দেখ্‌লে ত নয়? মা, চিনির পানা আনিয়াছি একটু মুখে দাও।"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন—"উঠ, স্নান কর। রাধামণি দুটী প্রসাদ আনিয়াছে, তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, "কাঁদিব" ভাবিল, "কিন্তু মরিব না"। উঠিল, রাধামণির প্রসাদও স্পর্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন—"মা, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটী গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াগিয়াছেন। আমি

কখন বিষয়ী নহি, এ বিষম কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখিব শুনিব, সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুইবার আসিতে হইল, কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে আমি তাই ভাবিতেছি।”

সৌদামিনী উত্তর করিলেন—“বাবা তুমি না আসিলে কে ছেলে দুটীকে দেখিবে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে?”

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায় থাকেনা। সৌদামিনীর মুখে সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয় কিন্তু ঘনমালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি সহজ জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে তাঁহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এবাড়ী কাল সেবাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বনাথ বলেন আবশ্যক, সুতরাং স্বাক্ষর দেন কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন।

বিশ্বনাথের আর দৈন্যদশা নাই কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গ্রাসে গ্রাসে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখ ছিল তাহা আর বিশ্বনাথের নাই। পরোপকার পরম ধর্ম্ম এই কথাই প্রচার, তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপসত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন। পাঠক, সেই ছেলেটীকে মনে করুন যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা, সে নোট কাটে, সৈরভকে রাখিয়াছে, পূজাতে সৈরভের মাকে বারাণসীর সাটী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয় ইহাতে যদি সুখ থাকে থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে—ভয়ে সৌদামিনী কাঁদে না—বলে—"মাগো, হাবাকে আমি মানুষ করে তুল্‌ব, আর আমি কি মোট বইতে পারিব না?" সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সমবয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না—বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পায় এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল—এখন তাহার আবশ্যক নাই। ম্লানচীর, রুক্ষকেশ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে তথাপি রূপ কেন ধরে না? একি রূপ? একি সন্ন্যাসিনী? না, তাত নয়। নীরদ ও হাবা দুটী ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ মলিনা স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘ-মলিন দিনকরের রশ্মি পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদামিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সে রূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশুসন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদামিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, কি জানি যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? "নীরদ নীরদের ন্যায় গম্ভীর। সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক দিন সৌদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।"

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী বলি বলি করিয়াছে যে তুমি দুরাত্মা,

কিন্তু বলে নাই। বদ্ধশ্বাসবশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ তাহা প্রেমে নয়, যে লজ্জা দেখিতেছ, তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধিমতী সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা-করে—বলে—"কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর" কিন্তু অবলা ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত। বিশেষ কার্য্য, দাসী সৌদামিনীর শয়নগৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না। অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সৌদা-মিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন——"আমায় দয়া কর।" সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না, নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক বিপরীত হইল। এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয় পাঠক ভাবুন, আমরা নীরদের কাছে যাই।

পরচর্চাপ্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন ইহা যে জিজ্ঞাস্য তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, এত রাত্রে বিশ্বনাথ বাবু কেন আসিয়াছিলেন?"

সৌ। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, এ কি মা?

সৌ। এ কি? আর বলিব না। নীরদ, আমার বোধহয়,

যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন। হাবা নিদ্রিত। সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল—"মা তুমিত আমায় একুলা শুয়াও, আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।" সৌদামিনী বলিলেন—"হাবা ওঠ্, আমার বিপদ, স্বামী নাই, তুই সন্তান তোরে না বলিয়া কারে বলিব?"

হাবা বোকাছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশুসন্তানের চাহুনিতে বহুদিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

"মা তুমি দাদাকে বলনা, দাদার গায়ে বেশি জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই। চল মা আমরা পালাই।"

সৌদামিনীর মনের দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশুসন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়! কিন্তু ছেলেটী বলিল পালাই। কেন পালাইব? হাবা বলিয়াছে পালাই, পালাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আবার বলিল—"মা চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে দেখার দরকার নাই। আমি জানি আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক এক বার আদর করিয়া চায়, আমার বোধহয় আমায় মর্‌তে বলে।"

হাবা হাবানয়, হাবা যেন উন্মাদ।

সৌ। হাবা ঘুমো।

হা। না মা চল আমরা দুজনে পালাই, দাদা গায় যাবে, নয় চল আমরা দুজনে পালাই।"

পূর্ব্বদিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দরশন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল—"মা" বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—"মা কৈ চল।"

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল আমরা জানিনা। কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্যহৃদয়ে উদয় হয়। কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটী সত্য।

সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাত্রেই জানেন যে তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। " কি এত স্পর্দ্ধা আমাকে বিমুখ করে ? " তাঁহার রোষ উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনীর সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল—" এখন মা চল। "

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, তারি ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল—" মা তুই কি আমায় কোলে করিতে পারিবি ? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাব। "

সৌ। কোথায় যাবি হাবা ?

হা। কুটীরে।

সৌদামিনী অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা করিতে ছিলেন হাবা বলিল—" কেন মা কাঁদ ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই। "

সেইদিন প্রাতে নীরদ বাটী নাই। সৌদামিনী তিনদিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল—" দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না। " সাতদিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ-প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ-সম্ভাবনা বলিয়াছে।

সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার

সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল, হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল কহিল—"তুই কে-রে—কে-রে?" হাবা বলিল—"আমি দেবেন্দ্র বাবুর ছেলে।"

মা। তোর সঙ্গের মাগীটা কে রে?

হা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদ প্রান্তে ঢিপ করিয়া গড় করিল কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ত্রুটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল—"আয়, এদিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই, চ'।" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল—"মা—চল এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতা-লের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন। মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ত্রুটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শয় বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইব তার স্থির নাই, ইহাতে মাতাল কি, পুরাতন গপ্পের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন।

বহির্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল—সৌদা-মিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল, মাতাল কহিল—"এই নাও।"

গৃহিণী "কি লব" না বুঝিয়া দুইজনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়াগেল। সেই দিন গৃহিণীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পর দিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিতচক্ষু মাতাল সৌদামিনীকে বলিল—"মা, এ ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুরে তোমার মনে পড়ে একটা ছোঁড়া পালিয়ে

এসেছিল। বাড়ীর লোকের বালাই বিদায় হল জ্ঞান। মা বাপ্ ছেল না, এক কাকাবাবু। তিনি ছেলেটাকে পায়া যায় না ব'লে পার পেলেন। দেবেন্দ্রবাবু ইস্কুলে দিয়ে আমায় উকিল করেছেন। বেশ দুটাকা পাই। মা আমার মনে হচ্চে তুমিও ছেলেটীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। এখন ধ'রে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল। সেই স্থানেই রহিলেন।

এক দিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে, সৌদামিনী জানেন না, সৌদামিনী আর্ত্তি করিয়া বলিতে গেলেন—"বাবা তুমি আমার ছেলে।"

মাতাল উত্তর করিল—"তার হিসাব কি ?" সৌদামিনী ভাবিলেন—"একি উত্তর !" কিন্তু ভয় হইল না।

মাতাল তখন ভাবিতেছিল—যে নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে, বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে তাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে। মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল—যে সেই নীরদ ইহারাই সন্তান। সেই কথা ভাবিতেছিল যে কেমন করে তাহাকে বাঁচাইবে ; তাই উত্তর করিল—"তার হিসাব কি ?"

যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ, বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব। কিন্তু কি জানি যখন তাহার উপর ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, খুন করিবার নিমিত্ত নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকিল, যে কথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসি যাইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল ভাবিতেছিল—"দূর হ'ক, ঝাল্লাইয়ে কায নাই, কাল আপিল করিব।"

দীপে দীপনির্ব্বাণের ন্যায়, হৃদিবেদনায় হৃদিবেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী রমণীর নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করে।

সেইদিন ফাঁসির দিন। প্রমদা বলিল—“ম্যাঙ্গো, আজ তোমার নীরদের ফাঁসি। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।”

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন—রহিলেন না। হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক নির্ণয় নাই, অথচ যেদিকে ফাঁসি হইতেছে সেইদিকে চলিতেছেন। কোমলপদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। রুক্ষ কেশ আকাশে দুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল, তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জন সমাগমে স্থান নাই। ফাঁসি দর্শনেচ্ছু নির্দ্দয়-হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল। সকলে স্থান দিতে লাগিল।

ঠিক ফাঁসির সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত—কহিলেন—“নীরদ, আমি অসতী নহি।”

নীরদ ফাঁসিতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর কথা কাণে গেল কিনা জানি না। উন্মাদিনী সেইখানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়িতে লইয়া আসিল।

যথা নিয়মে সৌদামিনীর সংকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকিলের কৌশলে পিতৃ অর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসি ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত—“মা আমায় এইরূপ চুম্বন করিতেন।”

—:—

সন্ধ্যার প্রদীপ।

১

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরাপরে,
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আন্ধার-সাগরে :
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বিনা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিদ্যমান।

২

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জবা যেন যমুনার নীরে।
আন্ধারের কাল কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্ত মাখা ক্ষত স্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

৩

জ্বালিয়া প্রদীপ, ঝাঁপি বসন অঞ্চলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,

রক্ত আভা মাখা রক্ত বদন মণ্ডলে,
রক্ত শিখা সীমন্তে সিন্দুর,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা,—
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা।

৪

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,—
নদী পারে প্রদীপ সন্ধ্যার,
প্রিয়া-মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-সুত বিধবার,
হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ,
আছে এক মাত্র আশ,
হেন নয়-হৃদয়ের দেখায় আভাষ
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল * প্রকাশ।

৫

ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্য্যটনে,
অজানিত দেশ, শুধু চৌদিগে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ;
হেন কালে হেন স্থলে,
দূরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার ;
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার !

* মঙ্গল গ্রহ।

৬

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়.
হেরে মাতা স্নেহের নেশায় ;
আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণেনা আপন,
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

কলিকাতার বড় মানুষী মজ্‌লিস্‌।

একেলে কলিকাতার বড়মানুষী মজ্‌লিসে শুদ্ধ পোষাকী আত্মীয়তা ; পোষাকী বন্ধুত্বের চেকণাই ভাল, সারতা নাই, কদাচিৎ কালে ভদ্রে ব্যবহার না করিলে পদে পদে ছেঁড়া টুটা লোক্‌সানের ভয় ; নিরন্তর নিশ্চিন্ত সুখে রাখিতে তোমার সদাদলিত আট্‌পৌরের কাছে আর কেহ নাই—ভাই! এখানে কেবল পোষাক দেখাও, আর পোষাক দখ, আর কিছুরই আবশ্যক নাই ; মিষ্টালাপ রসিকতা দূরে থাক, সাদাসিধে কথাবার্ত্তারও বড় প্রয়োজন নাই ; বাক্যব্যয়ে নিমন্ত্রণকারার যেমন অদ্ভুত কৃপণতা, কথাবন্ধ করিতে তেমনই দুর্দ্দান্ত আগ্রহ ; আসিবামাত্র, বদন-রন্ধ্রে, ছাঁচিপানের ছিপি সব উত্তমরূপ আঁটিয়া দেওয়া হইল, মুখবন্ধের বাকি কাজটুকু হুঁকায় সারিল,

যেন বাড়ীওয়ালার একান্ত ইচ্ছা—নিমন্ত্রিত সকলে পানের জাবর কাটিতে কাটিতে অবাক্ হইয়া, প্রতি দেওয়ালের আরসী-আলোক-আলেখ্যময়ী লক্ষ্মীশ্রী ধ্যান করিতে থাকেন, আর হুঁকার ধূমধামে ঘণ্টায় বাট্ ছিলিম বন্ধুত্বের পরিচয় দেন। এখানকার রাজত পিচ্-কারীর গোলাপী অভ্যর্থনায়, কথা ব্যয় নাই, মন ভিজান নাই, শুদ্ধ বাহিরের বসন ভিজাইলেই হইল। এখানে করযোড়ে দেঁতো-হাসি-বিকসিত একপেশে মাথানাড়ার নির্ব্বাক্ শিষ্টতা। রসিকতা, এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না, অঙ্গভঙ্গীর কতশত রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা শুন, তাহা ভ্রেষা-হাসির উড়ো রসিকতা মাত্র, আর কিছুই নয়। এখানে রোসনাই, শুদ্ধ চোকে ধাঁদা দিবার জন্য। গীত বাদ্য, দেখাইবার জন্য, কে বলে শুনাইবার জন্য ? গোলাব, আতর, ফুলের তোর্‌রা, সুখী করিবার জন্য নয়, সুখের ইন্দ্রত্বের পরিচয় দিবার জন্য এখানে, বিদ্যার বিদ্যাসাগর হও, গুণের গুণনিধি হও, বিনা পোষাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেই, সুশিক্ষিত দ্বার-বানরদের ভ্যাংচামুখের কিচির-মিচির শুনিয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হয়। প্রবেশ মাত্র দেখিবে—সভাগৃহের গৃহ-জাত-তপ্ত-জ্যোৎস্না-রঞ্জিত, নবীন, প্রাচীন, সঙ্গত, অসঙ্গত, দেশীয়, বিদেশীয়, সংলগ্ন, অসংলগ্ন, দেখানে, দোকানে, অগণিত গৃহ-সজ্জা সব, নির্ব্বোধ প্রশংসার্থীর ন্যায়, তোমার মুখ চাহিয়া প্যাট্ পেটিয়ে রহিয়াছে। দেখিবে—বাড়ীওয়ালার বিপুল কুটুম্ব-লক্ষ্মী, সাটীনমোড়া ঝকমকে জামাই, বেহাই, ভাগিনেয়, ভগ্নী-পতির বিবিধ বিশালরূপে, চারিদিকে বিরাজমান। দেখিবে—হাসি, হুকুম, হুঁকার কলরবের মধ্যে, দুর্দ্দান্ত কালোয়াতীগানও হাবুডুবু খাইতেছে। দেখিবে—রাজপথের নিশাচর মুস্কিলআসানজী, আজ দুই পাশে দুই তানপূরা-দণ্ডধারী সংস্থাপিত করিয়া, কালোয়াত-রাজ-রূপে জানুপাতিয়া বসিয়াছেন ; ওস্তাদের মুস্কিলআসানী কণ্ঠের

অট্টহাসিনী সুর-সুন্দরী, মাম্ মা, রের্ রে শব্দে ঢালিপাক খেলিয়া বেড়াইতেছে ; সুর-দেবীর ভৈরবরূপে, দুর্ব্বোধ্য নিনাদে, সঙ্গীতের শাক্ত সম্প্রদায়, ভাবে আর্দ্র হইতেছেন, গদগদ ভাবের ঘর্ম্মরসে, ভাবুক আপ্লুত হইয়া পড়িতেছেন। দেখিবে—বড়মানুষ-মণ্ডলী, দশ-মেসে মণ্ডলোদরে, মজ্‌লিসের সর্ব্বস্থানে অভ্রান্তভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন—যাহারা বসিলে, উঠিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না, উঠিলে, চলিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না ; যাঁহারা হেলান না দিয়া উপবেশনে অসমর্থ ; যাঁদের পশ্চাতে তাকিয়ার ঠেশ্, সম্মুখে পৃথুল ভুঁড়ির ঠেশ্ ; যাঁদের সকরযোড়-মাথা-নাড়ানাড়ী দেখিলে, বোধহয় যেন কথার অভাবে শিষ্টতার পুত্‌লোভঙ্গীসব অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন ; যাঁদের ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ, বুদ্ধিপ্রভা, হাতে হীরার আংটীর উপর প্রস্ফুটিত হয়, চোকে মুখে কদাপি দেখা দেয় না। বড়মানুষ চিনিতে, বড়মানুষী ভুঁড়িটী যেমন অসূক্ষ্ম অব্যর্থ লক্ষণ, এমন আর কিছুই নয় ; গাড়ী যুড়ী ধারে চলে, তোমায় ঠকাইতে পারে, কিন্তু শান্ত ভুঁড়িবেচারা কখন ঠকাইতে জানে না। ভুঁড়ী ছাড়া বড়মানুষ নাই, বঙ্গের লক্ষ্মীশ্রী অর্থে ভুঁড়ো শ্রী, এ সব কথা স্বতঃ-সিদ্ধ, বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও, আমাদের যে তিন চারিটী অকাট্য যুক্তি আছে, তাহার দুই একটা দেখান চাই : প্রথমটী বাইবেল-মূলক যুক্তি—যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন যে সূচীছিদ্র দিয়া উষ্ট্র গলিয়া যাইতে পারে, তবু বড়মানুষের স্বর্গলাভ সম্ভব নয় ; সত্য-স্বরূপ যাশুখৃষ্টের এই কথাটী খামকা নিরর্থক হইয়া পড়ে, যদি বড়মানুষ অর্থে ভুঁড়ো মানুষ না বুঝিয়া লও, যদি ভাব, যে, বড়মানুষের ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এ কথা কথিত হয় নাই ; কারণ, উটগলা সূচী-মুখে বড়মানুষের ভুঁড়ি বই আর কিছুই কোনমতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়টী সটীক মনস্তত্ত্বঘটিত যুক্তি—

"যত মনের চাস—তত ভুঁড়ির হ্রাস,
মনের তেজে ভুঁড়ির ক্ষয়,
বিপুল পেট যোগীর নয়।"

মনস্তত্ত্বের এই কারিকাটী, দেখিতে সামান্য দেশী, কিন্তু অসমসাহসে ডাক্তার ওয়েবরের জন্মাষ্টমী তত্ত্বের অসমকক্ষ নয়; কোবিদা-গ্রগণ্য কলিকাতার ন্যায়পঞ্চানন সাহেবের মতে ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা টোলের টীকায় বিলক্ষণ দশপাত বাড়িতে পারে এবং ইহাকে বাসিমুখে নিত্য তিনটীবার অভ্যাস করিলে, ছোট হোক্, বড় হোক্, পেট্‌টী দেখিবামাত্র, বাচাল ব্রাহ্ম-যোগীর গৈরিক বসনাবৃত অস-তীত্ব ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোলকের কালি কসিতে না জানিলেও, শুদ্ধ ফিতার মাপে বঙ্গীয় ধনিত্বের তারতম্য সবিশেষ বুঝা যায়। ইহার টীকায় উল্লিখিত ডক্‌টর্ ন্যায়-পঞ্চানন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, শাস্ত্র-শ্লেষ-দধি-রস-স্নিগ্ধ, অম্ল-মধুর চিঁড়া-মুড়কি ভাষায় লিখিয়াছেন;— "কি একাগ্র meditation, কি absorbed অধ্যয়ন, কি অবিচলিত zeal, কি দয়া ভক্তি প্রেম প্রভৃতি Conative feelings, এতৎ সর্ব্বং ভুঁড়ি ক্ষয়করং; এবং Bengali বড় মানুষের উৎসাহ, অনুরাগ, দয়া, মায়া, ভক্তি, ভাবানুভাব, চিরপ্রসিদ্ধ কুমুদ্বতীর (বোটানীর Lilium candidum of the ইষ্টের) ন্যায়, সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাতে wither হইতে থাকে বলিয়া বঙ্গীয় lord, laird মাত্রেই অনা-য়াসে বিপুল-bellied হইতে পারেন।" ডক্‌টর্ ন্যায়-পঞ্চানন টীকা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

বড়মানুষের মজ্‌লিস্ থেকে মজ্‌লিসের বড়মানুষ, বড়মানুষ থেকে বড়মানুষের ভুঁড়ির কথা কহিতে কহিতে বহুদূর আসিয়া পড়া গিয়াছে, এখন আবার একবার মজ্‌লিসে ফিরে যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

এখানে দেখিবে—বহিমধুরা পাপরূপিণী নর্ত্তকী নাচিতেছে, গাইতেছে, দেহবিবশকর-তড়িম্ময়-বিলোকনে চাহিতেছে, যেন কামকুহকাভিভূত করিবার জন্য, প্রেত-বাহিতা মায়াবিনী, মায়িক হস্ত-চালনানুকূলিত সঙ্গীত-স্নিগ্ধ কত কি মন্ত্র পাঠ করিতেছে। দেখিবে—ভুঁড়ো বাবুরা সব আসিতেছেন, চ'চারিটী কথার চাটের সঙ্গে অনর্গল ধূম পান করিতেছেন, গণা পাঁচ মিনিট বসিয়াই বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে মাথা-নাড়ানাড়ী হাত-যোড়াযুড়ী করিয়া যাইতেছেন, যেন কত কুচিন্তা, কত কুকাজ, কালিকাতার বারাণ্ডাওয়ালী বারাঙ্গনার মত, রাস্তার দুইধারে সারি গাঁথিয়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। বড়মানুষী সৌহার্দ্দের যদি এইরূপ পাঁচমিনিট স্থিতি, যদি এইরূপ হাত-যোড়া-যুড়ী মাথা-নাড়ানাড়ী দাঁতবেরুণ মূর্ত্তি হয়, তা হ'লে, হে অদৃষ্ট! দোহাই তোমার, মানুষ যেন কস্মিনকালে বাঙ্গালার বড়মানুষ না হয়। হে বাঙ্গালার বড়মানুষ! তুমি এই সৌহার্দ্দ, এই আত্মীয়তা লইয়া কেমন ক'রে সুখী থাক! হে বঙ্গের মধ্যবিত্তগণ! তোমাদের সভায় গাঢ় সৌহার্দ্দের কেমন মন খোলা হাসি, কত সরস কথা বার্ত্তা. কত-শত বুদ্ধি-জ্যোতির্ম্ময় মুখ, পাঁচমিনিট সৌহার্দ্দের পরিবর্ত্তে কত দণ্ড স্থায়ী আত্মীয়তা দেখিয়া থাকি ; তোমরা যদি না থাকিতে, তা হ'লে নিশ্চয়ই এই সুবিশাল সমগ্র ধরাতলেও বঙ্গের একতিল দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না ; তোমরাই বঙ্গে সব, তোমরাই বঙ্গোন্নতির বদ্ধমূল অচল ভিত্তি ; এঁরা সব কেবল বাহারের ফুলকাটা বালির কাজ,আর মোসাহেব-হাঁড়গিল খোসামুদে-কাক-চিল-আশ্রয়ের আলসে, কার্নিস্, চিলের ছাদ।

———

আয়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বেদের সময়ে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হয়, এবং ইহা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া গণ্য; কিন্তু বেদ ভাষায় লিখিত কোন আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ অদ্যাপি আমাদের নয়ন-গোচর হয় নাই এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মধ্যেও কেহ দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ-স্থল। কেবল ঋষি-বচন মাত্র ইহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে *। অবস্থা-বৈগুণ্যে অথবা আমাদের ভাগ্যদোষে আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উগ্রতপোবল-লব্ধ কত রত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। প্রাচীন-তম গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, সহস্র বৎসরের মধ্যে যে সকল গ্রন্থের জন্ম হই-য়াছে তাহাদের মধ্যে কত শতের কেবল নাম-ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সে যাহা হউক সেই বিষয়ের অনুশোচনে কোন ফলোদয় নাই।

এইক্ষণে ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ যেমন দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা ফিজিশন্ ও সার্জ্জন্, অতি প্রাচীন কালেও এই দেশে এইরূপ সম্প্রদায়-বিভাগ ছিল, যথা কায়-চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎ-সক; তন্মধ্যে কায়-চিকিৎসকগণ জ্বরাদি সার্ব্বাঙ্গিক রোগের চিকিৎসা

---

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ব-বেদস্যানুৎপাদ্যৈব

প্রজাঃ শ্লোক শত সহস্র মধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।

সু শ্রু ১।

করিতেন, এবং শল্য-চিকিৎসকেরা অস্ত্র-সাধ্য রোগের চিকিৎসাও করিতেন।

আমাদের এক জন বন্ধু এক দিন উপহাস-চ্ছলে বলিয়াছিলেন "পড়া অপেক্ষাও আমাদের বিদ্যা বেশী" অর্থাৎ যে বিষয় জানি না তাহা লইয়া আমরা সময়ে সময়ে বিদ্যাবত্তা ও বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিয়া থাকি। অন্যত্র যাহাই হউক এক্ষণকার চিকিৎসকের মধ্যে এই ধাতুর লোকের সংখ্যা অধিক। যদি কোন ব্যবসায়ে বিশেষ গুরুত্ব থাকে তাহা চিকিৎসাতেই আছে, এক জন ব্যবহারাজীবের বাক্‌পটুতার অভাবে একজন একটী বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন, একজন শিক্ষকের অনভিজ্ঞতা দোষে একটী বালক মূর্খ হইতে পারেন কিন্তু একজন চিকিৎসকের অজ্ঞতা বশতঃ এক ব্যক্তির অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব এরূপ গুরুতর বিষয়ের ভার যে কিরূপ ধর্ম্মভীরু বিচক্ষণ লোকের হস্তে প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তাহা লেখা বাহুল্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ের বিলক্ষণ ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়; অপরিণত-বয়স্ক কোন ব্যক্তি কিছু দিবস শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি লোকে অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার হস্তে আপনাপন আত্মীয় বর্গের চিকিৎসার ভার অর্পণ করিতে লাগিলেন, অথবা অজ্ঞাত নামা কোন ব্যক্তি কয়েক দিবস মাত্র সামান্য শিক্ষা পাইয়া অথবা কোন সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত বলিয়া সংবাদ পত্রে কিম্বা রাজপথের স্থানে স্থানে বৃহদক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন, অমনই তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিয়া আপনাপন বহুযত্ন-লালিত, সন্তান সন্তুতি গণকে সেবন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ ভাগ্যক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়া বিজ্ঞাপন দাতার যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অনেকে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়া মাতা পিতাকে শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত

করিতে লাগিলেন ; এরূপ ঘটনা কত যে সংঘটিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে! ফলতঃ এক্ষণকার অনেক চিকিৎসক ও রোগীর সাহস ও বিশ্বাসকে ধন্যবাদ! রোগী বহুদূরে অবস্থিত, তাহার ধাতুগত-ক্ষয়-বৃদ্ধি পরীক্ষিত হইল না, রোগের কারণও নির্ণীত হইল না, কেবল বিজ্ঞাপন দৃষ্টে ব্যবস্থা হইতে লাগিল! এতদ্ভিন্ন আরও কত অনক্ষর নিরুপায় ব্যক্তি গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত ঔষধ-তালিকা [পৈঁতে] অবলম্বন করিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। অনধিকৃত বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রবল অধর্ম্ম-ভয় আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিত।

উক্ত উভয় বিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে শল্য চিকিৎসকেরই গৌরব অধিকতর ছিল। লিখিত আছে যে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় শল্য চিকিৎসার গৌরবেই যজ্ঞাংশ-ভাগী হয়েন। দেবগণ তাঁহাদের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করেন। এইক্ষণে সেই গৌরব আমাদের বৈদ্যসমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য ভিষগ্‌গণ সেই উচ্চ আসন অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু এক বলিয়া বৈদ্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
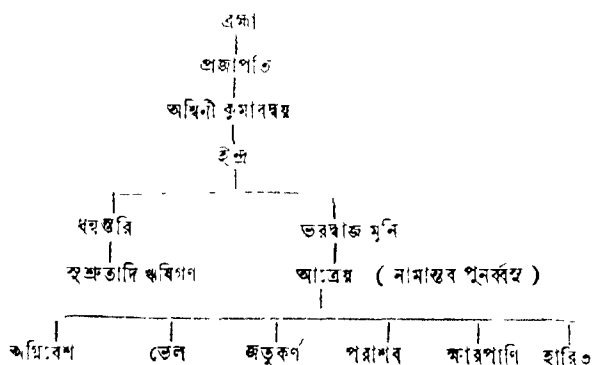
ইহাঁদের পরে কে কাহার শিষ্য হইয়াছেন তাহার নিরূপণ নাই। সুশ্রুতাদি ঋষিগণের মধ্যে সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত এই চারিজনের প্রত্যেকেই শল্যাঙ্গের এক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই চারি খানি গ্রন্থই ঐ সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থের মূল। ইহাঁদের মধ্যে সুশ্রুতের গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। অপর কয়েক খানি কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইয়াছে।

কায-চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অগ্নিবেশাদি ছয় জন ঋষির প্রণীত ছয় খানি গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে অগ্নিবেশ ও হারিতের গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। অপর চারিখানি বিলুপ্ত হইয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থের মধ্যে অগ্নিবেশের গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় ও উৎকৃষ্ট।

আমরা এক্ষণে যে গ্রন্থকে সুশ্রুত ও অগ্নিবেশের গ্রন্থ বলিয়া জানি তাহা তাঁহাদের প্রণীত আদিম গ্রন্থ নহে। উহা অন্য কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রতি-সংস্কৃত। তন্মধ্যে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কারক নাগার্জ্জুন ঋষি এবং অগ্নিবেশের গ্রন্থের প্রতি-সংস্কারক চরক। নাগার্জ্জুন ঋষিকর্ত্তৃক প্রতি-সংস্কৃত গ্রন্থ তদ্‌গুরু সুশ্রুতের নামে প্রসিদ্ধ এবং চরক-কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ চরক নামে বিখ্যাত আছে।

সুশ্রুত এবং চরক উভয়ের মধ্যে সুশ্রুতই পূর্ব্বতন বলিয়া অনুমিত হয়। সুশ্রুত একজন ঋষি। কথিত আছে, এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র মুনির পুত্র। সুশ্রুত ধন্বন্তরির নিকটে আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহাই গ্রন্থাকারে নিবন্ধন করেন। ধন্বন্তরি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপন্যাস এদেশে প্রচলিত আছে, ঐ সমস্ত উপন্যাসে কল্পনার ভাগ এত অধিক, যে যথার্থ বিবরণ নিষ্কাশিত করা অতি দুরূহ। হিন্দুদিগের দেবতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—আদি-দেবতা, প্রয়োজন-দেবতা ও কর্ম্ম-দেবতা। আদি-দেবতা (মূল দেবতা) যথা ব্রহ্মাদি; পৃথিবীর উৎপাত-নিবারণাদি কোন

প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে যে যে দেবতার সৃষ্টি হয় তাঁহাদিগকে প্রয়োজন-দেবতা কহে যেমন কার্ত্তিকেয়াদি; যজ্ঞাদি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারা কর্ম্ম-দেবতা যেমন ইন্দ্র। ধন্বন্তরি আদি দেবতা। সমুদ্র মন্থন-কালে ধন্বন্তরি অমৃত কলশ মস্তকে ধারণ করিয়া সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হন, এইরূপ বর্ণনা পুরাণে ও বৈদ্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে ধন্বন্তরির কোন না কোন ইতিহাস পাওয়া যায়। যেমন সমুদ্রমন্থনে তদ্রূপ বিক্রমাদিত্যের সভাতেও ধন্বন্তরি নামক অনেক ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা ধন্বন্তরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের নামানুসারে অনেক ব্যক্তিই বিখ্যাত হইয়া উঠেন, কিম্বা চিকিৎসানৈপুণ্য বশতঃ অনেক ব্যক্তিই উক্ত গৌরবান্বিত নামে প্রতিষ্ঠিত হন *। এক্ষণে সুশ্রুত কোন্ ধন্বন্তরির শিষ্য তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। পুরাণ পাঠে কাশীধামে দিবোদাস নামে এক পুরাতন রাজর্ষির ইতিহাস পাওয়া যায়; ইনিও ধন্বন্তরি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সুশ্রুত স্বয়ংই ইহাঁর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং এই দিবোদাসের সময় নিরূপিত হইলে সুশ্রুতের সময় নিরূপিত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র; বিশ্বামিত্র রাজা রামচন্দ্রের সমকালীন; রামচন্দ্র ত্রেতা যুগে অবতীর্ণ হয়েন; পৌরাণিকেরা দিবোদাসের ঘটনাও ত্রেতা যুগে সম্ভূত বলিয়া অনুমান করেন। তাহা হইলে সুশ্রুত ত্রেতাযুগের ব্যক্তি এবং তৎপ্রণীত আদি গ্রন্থও ত্রেতাযুগে লিখিত ইহা নির্দ্ধারিত হইবে।

---

* ধন্বন্তরিঃ—ধনুঃ শল্যং তরতীতি ধন্বন্তরিঃ।

সুশ্রুত টীকা ভানুমতী।

যিনি শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহাকে ধন্বন্তরি কহে।

পূর্ব্ব কালে লোকের ভক্তি অধিক ছিল, শাস্ত্রীয় কোন কথা বলিলে তাঁহারা অসন্দিগ্ধ ভাবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, কিন্তু মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বলে অনেকেই আমাদের অনেক বিধি-বিহিত নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মাদিতে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কালের কি মহিমা! এক্ষণে আবার সেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বলেই অর্থাৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণায় অনেকে পূর্ব্বাচরিত ক্রিয়া কলাপে দোষ দর্শন করেন না বরং সেই সকল বিধির প্রণয়নে আর্য্য-গণ বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও ভাবি-ফলাফলজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনে সাহসী হইয়া আমরা বাইবেল মতে মানব-সৃজন-কাল ছয় সহস্র বৎসরের অধিক নহে জানিয়াও আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ প্রমাণ উপেক্ষিত হইলেও কালের আরও পরিবর্ত্তনে এ মত উপহাসের যোগ্য না হইতেও পারে। যাহা হউক এক্ষণে মনু প্রভৃতি গ্রন্থের মতানুসারে সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। মনুতে লিখিত আছে এবং আয়ুর্ব্বেদও স্বীকার করেন যে সত্য যুগে মনুষ্য-গণের পরমায়ুঃ চারি শত বর্ষ, ত্রেতায় তিন শত, দ্বাপরে দুই শত এবং কলিযুগে এক শত বৎসর, এইরূপে ক্রমে আয়ুর হ্রাস হইয়া আসিতেছে; পৃথিবীর এক শত বৎসর গত হইলে এক বৎসর করিয়া পরমায়ুঃ ক্ষয় পায় *। সুতরাং এক শত বৎসর ক্ষয় পাইতে দশ সহস্র বর্ষ অতীত হয়। অতএব এক এক যুগের

* সংবৎসর-শতে পূর্ণে যাতি সংবৎসর-ক্ষয়ম্।
দেহিনামায়ুষঃ কালে যত্র যন্মান মিষ্যতে॥
চরক বিমান স্থান।

পরিমাণ অন্যূন দশ সহস্র বৎসর। এই গণনা অবলম্বন করিলে কলিশতাব্দ ও ত্রেতা যুগের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্বাপর যুগের পরিমাণ গ্রহণ করিলে সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল দশ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে।

অগ্নিবেশের গ্রন্থ অথবা চরক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, এই মাত্র উত্তর প্রদান করা যায় যে, অগ্নিবেশের আদিম গ্রন্থ বহুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহা উহাঁদের গুরু পরম্পরার ক্রম দেখিলেই স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে সুশ্রুতের প্রকাশের পরে অগ্নিবেশের গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। তবে চরক প্রচারের সময় নির্ণয় করিতে হইলে, সুশ্রুত ও চরক অধ্যয়ন করিয়া উক্ত উভয় গ্রন্থের ভাষার সম্যক সমালোচনা করিলে যে সহজ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় তাহা এবং অনুমান অবলম্বন করিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা সুশ্রুতের পরবর্ত্তী এবং ভারত-প্রণেতা ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী †; কারণ সুশ্রুতের রচনা প্রাঞ্জল, এবং চরকের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও উহার স্থানে স্থানে সুশ্রুত-গুরু ধন্বন্তরির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় *।

ভাষার সমালোচনে অর্থাৎ ভাষার প্রাঞ্জলত্ব, দুরূহত্ব, রচনা-পাটব ও সারল্যদৃষ্টে যদি কিছু অনুমান করিতে পারা যায় তদনু-

* (১) তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।
বৈদ্যানাং কৃত যোগ্যানাং ব্যধ-শোধন রোপণৈঃ॥
চরক চিকিৎসা স্থান।

(২) সর্ব্বাঙ্গাভিনিবৃত্তিরিতি ধন্বন্তরিঃ।
চরক শারীর স্থান।

† ধন্যো ধন্বন্তরির্নাত্র চরকশ্চরতীহ ন।
নাসত্যাবপি নাসত্যাবত্র চিন্তাম্বিবে বিল॥
কাশী খণ্ড।

সারেও পূর্ব্ব লিখিত মত সমর্থিত হইবে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ স্বরূপ সুশ্রুত ও চরকের একার্থ-প্রতিপাদ্য একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয় প্রমাণ করা যাইতেছে——

পঞ্চ মহাভূত-শরীরি সমবায়ঃ পুরুষ ইতি,
তস্মিন্ ক্রিয়া ; সোঽধিষ্ঠানম্। সুশ্রুত।

পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম) শরীরী (জীবাত্মা) এবং মনঃ এই তিনের মিলনেই পুরুষ। পুরুষে চিকিৎসা। পুরুষই সুখ দুঃখাদি সর্ব্ব বিষয়ের অধিষ্ঠানভূত।

সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎ তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
চরক।

যেমন তিন খণ্ড কাষ্ঠিকা পরস্পর-সংযোগে স্থির-ভাবে অবস্থিতি করে, একের অভাবে অপর খণ্ডদ্বয় পতিত হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব (মনঃ) আত্মা (জীবাত্মা) এবং শরীর এই তিন পরস্পরসাহায্যে অবস্থিতি করে, একের অভাবে অপরে নিশ্চেষ্ট হয়। সেই সংযুক্ত পদার্থে (পুরুষে) চিকিৎসাদি সর্ব্ব কার্য্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই উদ্ধৃত স্থল-দ্বয়ের বিষয়ে ধীর-ভাবে চিন্তা করিলে পাঠক মহাশয়ের এতম্মধ্যে কোন্‌টী আদিম তাহার নির্দ্ধারণে সমধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না বরং তাঁহার স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে সুশ্রুতের লেখা প্রাচীন ও প্রাঞ্জল ; এবং চরকে ঐ মতই বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তবে চরক, সুশ্রুতের পরবর্ত্তী ; এবং ভারতাদি গ্রন্থে চরকের বহুল বার উল্লেখ থাকায় ভারত-প্রণেতা ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত

হইল। যদি এই সিদ্ধান্ত অমূলক না হয়, তবে ব্যাসদেবের আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইলেই তৎপূর্ব্বে চরক লিখিত হইয়াছে ইহা অবধারিত হইবে। ব্যাস দ্বাপর যুগের শেষে বা কলিযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হন। যেহেতু কলির আগম ভয়েই যুধিষ্ঠিরাদি স্বর্গারোহণ করেন, তৎকালে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন। এক্ষণে কলি গতাব্দ ৪৯৮১ বৎসর, তাহা হইলে ব্যাসদেব বর্ত্তমান সময়ের ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব এরূপ বলা যাইতে পারে যে, চরক পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে প্রচারিত হয়।

ক্রমশঃ।

সমালোচন।

লীলাবতী—অর্থাৎ ব্যক্তগণিত। মহামহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্য কৃত মূলের অনুবাদ। পূর্ব্বার্দ্ধ। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গোবিন্দ বাবু ইতঃপূর্ব্বে "মৃণ্ময়ী অর্থাৎ সংস্কৃত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত ভূগোল বিদ্যা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আপনার নাম স্মরণীয় করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানি তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যশোগৌরবের পরিপুষ্ট করিবে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম রচিত পুস্তকখানির তাঁহার মৃতপত্নীর নামানুসারে নামকরণ করেন। এই পুস্তকখানি "গুণভূষণাঢ্যা" দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী রাধাকিশোরী দেবীর প্রীতিবর্দ্ধনাভিলাষে রচিত হইয়াছে। গোবিন্দ বাবু যে একজন প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি তাহার অণমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার অধ্যবসায় এবং প্রযত্নের আমরা

সমধিক প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভারতভূমি গণিত বিদ্যার আদি প্রসূতি ইহা চিন্তা করিলে কোন সহৃদয় ভারত-বাসীর হৃদয় পুলকে পূর্ণিত না হয়? কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে ভারত-প্রসূতা সেই মহাবিদ্যার আলোচনায় আমাদিগের দেশীয়গণের সবিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষারচিত গণিত গ্রন্থাবলির বিশেষ আদর ও সম্মাননা করেন। যদি একবার পূর্ব্বতন আর্য্যগণের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ গণিতশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন তাহা হইলে পূর্ব্ব মনীষী বুদ্ধিশক্তির কতদূর পরি-স্ফুরণ হইয়াছিল জানিতে পারেন। তাঁহারা গণিতের কোন কোন অংশে এরূপ বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাহা অনুধ্যান করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যে ইউরোপ এক্ষণে সভ্যতার আদর্শ স্থান, সেই ইউরোপ যে ভারতের নিকট গণিতশাস্ত্র বিষয়ে শিষ্যরূপে চিরকাল গণিত হইবে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। এক্ষণে আমাদের এই প্রার্থনা যে এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, ও বঙ্গীয় কৃতবিদ্যসমাজ ইহার যথোচিত আদর ও আলোচনা করেন, এবং ধনিসমাজ গ্রন্থকারের সদুদ্দেশ্য ও মহোদ্যম বিষয়ে সবিশেষ সহায়তা করেন। যদ্যপি এরূপ প্রয়াস উপযুক্ত আদর এবং সাহায্যাভাবে ফলবান না হয় তাহা হইলে আমাদিগের দেশের অতিশয় নিন্দিত অবস্থা বলিতে হইবে।

মনোবিকার।

আজ এই উন্মত্ত মনে বিকার জন্মিয়াছে। এতদিন জীবনের মনোরম উপকূলে সর্ব্বসুখময়, নবপ্রস্ফুটিত যৌবন-উদ্যানে শয়িত ছিলাম, সম্মুখস্থ প্রকৃতির কর্ব্বুরবর্ণা. জীবন-নাট্যভূমির সুদূরব্যাপিনী যবনিকা পড়িয়া ছিল, এমন সময় হয় নাই, এমন ইচ্ছা ছিলনা, মনে এমন ভাবের উদ্রেক হয় নাই যে সেই যবনিকা উত্তোলন করিয়া আপনার, মানব জীবনের অসারতা, এই জলবুদ্বুদের কার্য্যকারিতার বিষয়, ভবিষ্যতের অন্তরতম গূঢ় প্রদেশ সকল একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দর্শন করি। মনে করিলাম গহ্বরস্থ সুপ্ত সিংহের নিদ্রা ভঙ্গ করি, কিন্তু এই মায়াময়ী—এই চির কুহকিনী পৃথ্বীতে সে আশা মনের ভিতর উৎপন্ন হইয়াই মনে বিলীন হইয়া গেল। সে আশা মিশাইল, অন্য আর একটী চিন্তা মনকে অধিকার করিল। আশায় একটী কক্ষ পূর্ণ না হইতে হইতেই দারুণ চিন্তানলে চিত্তখানি পুড়িয়া গেল—মনের বিকার উপস্থিত হইল। সংসারের প্রতি স্তর, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, দেহের প্রতি তন্ত্রী, শিরার প্রতি রক্তবিন্দু, কি যেন একরকম ভাব ধারণ করিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল—জীবনের প্রাতঃকালে যখন জননীর কোলে শয়ন করিয়া চন্দ্রকর সদৃশ কোমল কর-পল্লব-দ্বয় সঞ্চালন পূর্ব্বক নৈশগগন-শোভী পূর্ণিমার চন্দ্র দেখিয়া ধরিতে উঠিতাম, আবার উঠিয়া যখন ডাকিতে বসিতাম, চন্দ্র নিকটে আসিল না বলিয়া যখন আবার অভিমান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মার কোলে গিয়া শয়ন করিতাম; যখন জননী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন, তখন সেই মনে, চন্দ্রকর সদৃশ সেই পরিষ্কার

মনে, কত সুখ ছিল, কত আমোদ ছিল, মন আনন্দে কত ভরপুর ছিল; সুখের তরঙ্গ, ঘাত প্রতিঘাত করিয়া, কেমন ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইত। তখন এই জীবনে কত যে কি সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিতে পাইতাম, তখন এই হৃদয়াকাশে কত যে সুন্দর উজ্জ্বল পরিমল-পরিপূর্ণ কুসুমরাশি ছড়ান থাকিত, তাহা বলিতে পারি না। ঈশ্বর জানেন সে দিন—জীবনের মধ্যাহ্ন প্রখর সূর্য্যের উজ্জ্বল সুখের কিরণরাশি কোথায় গেল! বয়োবৃদ্ধি সহকারে, জীবনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সুকুমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি জীবনের একটী কক্ষ—একটী কক্ষ, যে কক্ষ চিন্তায় নহে, অহঙ্কারে নহে, বিদ্যার অহঙ্কারে নহে, জ্ঞানের অহঙ্কারে নহে, ধনের অহঙ্কারে নহে, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারে নহে, অহঙ্কারের অহঙ্কারে নহে, এ সকলের কিছুতেই নহে, কেবল সুখে, মনের নির্ম্মলতাতে, সংসারের বিসদৃশ জীবচবিত না জানাতে পরিপূর্ণ ছিল তাহাঁও—সেটীও বুঝি গিয়াছে। কেনই বা বলিব যায় নাই? পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, তোমার আমার, রামের শ্যামের যখন গিয়াছে—যখন তরুণ বয়সের অপগমের সঙ্গে, দুঃখের ঊর্ম্মিমালা তরঙ্গের ভাব ধারণ করিতে থাকে তখন কেনই বা না বলিব যায় নাই? যখন বাল-স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা, মনের উদার প্রবৃত্তি, জ্ঞান, দেহের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, সে দয়া, সে সৌহার্দ্দ, সে সরলতা, সে মধুর সম্ভাষণ গিয়াছে, তখন যে 'সেই কক্ষটী' যায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? হরি হরি—আর যদি যায় নাই তবে সে আমোদ, সে সরলতা, সে যা-তাই কোথায়? তবে কেন মনের ভিতর হু-হু করে? তবে কেন এ জীবন অসার বলিয়া বোধ হয়, কেন এ হৃদয়ে—এই এতটুকু হৃদয়ে দুঃখের দুরন্ত সাগর উছলিয়া পড়িতেছে? কেন এই জীবন-মরুভূমির ওয়েসিসে আর সে প্রফুল্লতা নাই? এতদিন ত ছিল না—এই আজ হইতে কেন হইতেছে? শৈশবে কোন

দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে কত ভক্তি, কত সম্মান মাখান ভয়, এই হৃদয়ের কি জানি কোন প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া এই মনকে, এই দেহের প্রতিরক্তবিন্দুকে ঢাকিয়া ফেলিত—কিন্তু এখন বোধ হইতেছে দশ বৎসর পূর্ব্বে যে শরীর ধারণ করিয়াছিলাম তাহার সঙ্গে আর এই দেহের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কই নাই!

এ বাণিজ্যে এবার লোকসান হইয়া গেল। কি পাপ! মনে করি আমার যাহা আছে তাহাই থাকিলেই আমার এই পৃথিবীতে, এই বাণিজ্যালয়ে অনেক লাভ হইল, কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, পাপ মনই আমার সামুদায়িক সুখ সম্পত্তি একেবারে অকূল সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দিল (১)। হায় মনুষ্য কি অসার, কি অপদার্থ! চক্ষে ধূলা দিয়া নিষ্ঠুর কাল কেমন প্রতি বৎসর, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত মনুষ্যকে বঞ্চনা করিতেছে। সকলেই জানিতেছে, সকলেই বুঝিতেছে, কিন্তু কেহই আয়োজন করে না—কেহই তাহার প্রতিবিধানে সাহসী নহে—অক্ষম। দুর্জ্জয় সিংহের উদ্যম ভঙ্গ করিতে কে সাহস পাইবে? দেবতারাও যখন এ বিষয়ে অক্ষম, তখন তুমি আমি কে (২)? মানব-মন কি ক্ষুদ্র!—কি অসার! এ পাপ পৃথিবীতে আবার দেবতা কি? আমি যাহাকে দেবতা বলিয়া জীবন-বেদিস্থ হৃদয়-মন্দিরে মানসোপচারে পূজা করি, নিরন্তর যাহার সম্মুখে হৃন্মেদ যজ্ঞ করিতেছি,

---

(১) " O enviable early days,
When dancing thoughtless pleasure's maze,
To care and guilt unknown,
How ill exchanged for earlier times,
To feel the follies or the crimes.
Of others—or my own. ! "

(২) শৈব পুরাণ, তৃতীয় অধ্যায় ২০—২২ প।

সেই দেবতা—সেই গুণ বিশিষ্ট দেবতা কর্ম্মের দাস (৩)। তবে আবার দেবতা কি ?—কে পূজা করে ? আজ হৃদয় বিসর্জ্জন করিব।

সকলই যায়, কালের সঙ্গে সঙ্গে সকলই যায়, এক জনের সুখ, স্বাস্থ্য, ধন, মান, ভালবাসা, প্রেম, ব্রীড়া, সবই যায়—মর্ম্মভেদী, শোণিতপিপাসু, মনোবিকারের আদি কারণ " চিন্তা " যায় না কেন ? আজ যাহা দেখিয়া মন আনন্দ সাগরে ভাসিয়া গেল, বুকের ভিতর সহস্র চন্দ্র কিরণ ফুটিয়া উঠিল, যাহাকে দেখিয়া নৈশ সমীরণ হৃদয়োপবনস্থ মন্দার পরিমলে ভরপূর হইয়াগেল, দেহের প্রতি তন্ত্রী বলবান হইয়া উঠিল, আজ যাহাকে দেখিয়া এই নশ্বর দেহকে অবিনশ্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, যাহাকে দেখিলে নয়নের প্রীতি জন্মে, আজ যাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতর করিয়া রাখিতে ইচ্ছাকরে, কাল তাহার মুখদর্শন করিলে আর সে ভাব থাকে না কেন ? বুকের ভিতর খালি খালি বোধ হয় কেন ? মনের ভিতর ধূ ধূ করিতে থাকে কেন ? তখন বাঁচিবার সকল আশা যায় কেন ? তখন ত মনে হয় না (৪) তখন প্রাভাতিক গগনস্থ চন্দ্রকরের ন্যায় মন খানি মলিন হইয়া যায় কেন ? যাকৃ ও পাপ কথায় আর আমার

(৩) নমস্যামোদেবান ননু হতবিধে স্তেপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যোঃ বিধিরপি নয়েভ্যঃ প্রভবতি॥

শান্তিশতকম্।

(৪) The chain is loosed, the sails are spread,
The living breath is fresh behind,
As with the dews the sun rise fed,
Comes the morning laughing wind.

কাজ নাই। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, মনোবিকারের প্রায়শ্চিত্ত কি নাই? শুনিয়াছি সকল রোগের শান্তি নাই—এ বুঝি আমার সেই রোগ। এ পৃথিবীই নরক—যেখানে যন্ত্রণার শেষ নাই সেই স্থানই নরক। যেখানে শত বৃশ্চিক দংশন সদৃশ বিষয় চিন্তার, তদপেক্ষাও অধিক অর্থ চিন্তার, দুর্বিসহ ক্লেশ এবং আত্মীয়ের অঙ্কুশ সদৃশ জঘন্য বাক্য-যন্ত্রণা সেই নরক। যেখানে পরের অহিত চিন্তা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, অপবাদ, চৌর্য্যবৃত্তি, লোকের শিরোভূষণ সেই নরক। যে স্থানে চিরশত্রুতা রাজা, পীড়ন যাহার দাস, সেই ঘৃণিত, জঘন্য স্থান নরক ভিন্ন আর কি? তর্কশাস্ত্রের মূলনিয়মে একথা ভাসিয়া যায় বটে, তাই বলিয়া তুমি আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তুমি অস্বীকার করিতে চাও কর, কিন্তু একথা যখন আমার সম্মুখে বলিবে তখনই আমি তোমার মুখের উপর বলিব—বালক! তুমি সংসারের নয়ন-প্রীতিকরী, হৃদয়-ছিন্নকারিণী মূর্ত্তি দর্শন কর নাই—পাপ সংসারের সহিত তুমি কারবার কর নাই। যদি এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য সে পাপ মূর্ত্তি দর্শন কর তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—মনোবিকার কিসে হয়।

বিধবা বালা।

প্রভাতে নীহার-ধার, কেন ফেলি বার বার,
কাঁদে রে কুমুদবালা রক্তিম লোচনে ;
কি ভীষণ কীটে তার, হৃদি করি ছারখার,
কাটে রে মরম গ্রন্থি সদা সংগোপনে,
কে ভাবিতে চায় তাহা একবার মনে?

স্নেহের কুসুমলতা, জড়িত সরস পাতা,
ভারত কানন মাঝে বিহীনা আশ্রয় ;
প্রণয়োৎস রজোচ্ছ্বাস, সরল মধুর ভাষ,
অমৃতে গঠিত কম কোমল হৃদয়,
সতীত্ব সোনার পদ্ম চারু কুবলয়—
শুষ্ক প্রায় দিন দিন, কেন হয় শ্রীবিহীন,
কি অনল জ্বলে সদা হৃদয় কন্দরে ?
হৃদয়োৎসে ভাসি ভাসি, শোকের তরঙ্গ আসি
প্রস্রবণ সম কেন নেত্র হতে ঝরে ?
কে চায় জানিতে তা'হা ব্যথিত অন্তরে ?
অভাগী বিধবাবালা, সহিছে অসহ্য জ্বালা,
তবু না বলিতে পায় হৃদয় বেদন,
পাষাণ চাপায়ে বুকে, চাপিয়া রয়েছে মুখে,
পারদ-তরল-তপ্ত তরঙ্গ ভীষণ,
ভাসি ভাসি অন্তস্থল করিছে দহন।
জ্বলেনা হৃদয় বহ্নি, নিভেনা দারুণ অগ্নি,
ধূমে ধূমে পোড়াইছে হৃদয় পাতায় ;
বাসনা বুদ্বুদ মত, উঠিতেছে অবিরত,
নিরাশ পবন পুন ভাঙ্গিছে তাহায় ;
হৃদয় বুদ্বুদ মরি হৃদয়ে মিলায়।
নাহি রে কুসুম হাস, ফুরায়েছে সব আশ,
বিধবা হৃদয় মরু তপ্ত বালুময় ;
বহিছে ভীষণ শ্বাস, সদা করি হা হুতাশ,
জ্বালিতেছে ধু ধূ করি বিধবা হৃদয় ;
পুড়ে পুড়ে তবুও ত পুড়িবার নয়।

"রোদনেও অধিকার, নাহি কিরে বিধবার ?—
তা হলেও তপ্তহৃদি হইত শীতল।
এই জ্বালা নিভাইতে, বিধবারে জুড়াইতে,
আছে মাত্র এ জনমে শুধু চিতানল ;
বঙ্গ বিধবার মাত্র মরণি সম্বল।"

আমার এই জ্বলন্ত সেজটী বেড়িয়া
কীট পতঙ্গ সমাজ।

সবে মাত্র বাতিটী জ্বালাইয়াছি, এর মধ্যে হে আলোক! তোমার অমোঘ আকর্ষণে দেখ কত প্রকার কতশত কীট পতঙ্গ চারিদিকে একত্রিত হইয়াছে! দেখ, তোমার দেখিতে দেখিতে শান্ত তৃপ্তি-রসে আর্দ্র হইয়া, কতকগুলি স্পর্শবোধের সূক্ষ্ম শূঁয়া দুটী কেমন মৃদু মন্দ কাঁপাইতেছে। হে নেত্রসখ! দেখ, আর কতকগুলি কেমন প্রবল সুখে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; এরা কি তোমার দীপ্তিমান গুণ, আলোক-প্রলিপ্ত চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া ঘুরি-তেছে ?—নহিলে, যে যেখানে তুমি প্রফুল্ল ভাবে শুইয়া আছ, সেই সেইখানে উহারা ঘুরে ফিরে নেচে কুঁদে নিরন্তর ব্যস্ত কেন? আর দেখ, কতকগুলি, সুখ-বিকারের প্রকোপে থাকিয়া থাকিয়া কেমন উল্লম্ফন দিয়া উঠিতেছে ; ইচ্ছা তোমাতে লীন হয় ; কিন্তু সাধ্য কি, তোমার স্বচ্ছ কাচাবরণে মাথা ঠুকিয়া আবার ভূতলে ঘুরিয়া পড়িতেছে ; কতবার পড়িল, কতবার পড়িতেছে, কিন্তু এক বিন্দু শ্রমবোধ, উৎসাহ নিবৃত্তি তো বুঝিতেছি না। হে নয়ন-মোহন!

বল, তুমি কি যাদু-মন্ত্র জান? কীটদের এমন পাগল করিয়া তোমার কি সুখ? দেখিতেছি তুমিও আনন্দে তদ্‌গদ; তাই তোমার মুখ এত প্রস্ফুটিত, প্রফুল্লোজ্জ্বল। হে আলোকরূপী আনন্দ! দেখ, কতকগুলি তোমার কিরণে সুস্থির হইয়া, ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায়, নিষ্পন্দ দেহে, তোমার হর্ষময়ী জ্যোৎস্না মন ভরিয়া উপভোগ করিতেছে। হে নবননাথ! দেখ তোমার ভক্তগণ, তোমার স্নিগ্ধ প্রভায় একেবারে আবিষ্ট মোহিত মড়ার মত হইয়া কেমন সারি সারি সারি সুন্দর বসিয়া রহিয়াছে। তোমার কি জাজ্বল্যমান মহিমা! তোমার জ্যোৎস্নায় কি সুধা আছে? নহিলে, স্বভাব-চঞ্চল কীটদের কেন এমন নিষ্কম্পা জীবন-স্ফূর্ত্তি, কেন এমন সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত প্রচ্ছন্ন জীবন-ক্রিয়া? মধু-প্রচুর ফুলে প্রজাপতিও তো এতক্ষণ এমন মোহিত হইয়া রহে না। হে আনন্দময়ী প্রভে! তুমি কি? তোমার কি প্রকৃতি? এসব কিছুই না বুঝিয়া বুঝিতে অপারগ হইয়াও, কীট পতঙ্গগণ, শুদ্ধ তোমার কিরণে বসিয়া, হরষে তদ্‌গদ তুষ্ট কেন? তুমি এত নিকটবর্ত্তী, এই সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত, চারিদিকে এমন স্পষ্ট বিরাজমান, তথাপি তোমার কাচাবরণের স্বচ্ছ ছলনায় তুমি ইহাদের কেমন সম্পূর্ণ নাগালের বার! দেখ, কেমন ইহারা এই অবিশ্রান্ত চেষ্টায়ও তোমায় ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।

হে নেত্র-হর! তোমার কাচাবরণের কি অদ্ভুত শক্তি! এমন অতুল স্বচ্ছ! এমন পরিষ্কার অক্ষুণ্ন ভাবে তোমায় সকলের নয়নে নয়নে দেখাইয়াও তোমাকে কেমন লুকাইয়া রাখিয়াছে! 'তুমি কোথায়' 'তুমি কোথায়' ভাবাইয়া কীটগণকে পাগলের মত কেমন এই চিরকাল ঘুরাইতেছে! হে নেত্র-তোষ! এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শুদ্ধ তোমার প্রভায় থাকিয়া কীটগণ সুখী হইবে বলিয়াই তোমার এই মধুরোজ্জ্বল আবির্ভাব, তোমায় পাইবার

জন্য নয়—চির দিন দেখিতে দেখিতে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য নয়। হে পরিস্ফুট-সুখ! সেই অবধি নেচে কুঁদে দেখে ভেবে পরিতৃপ্ত হইয়া এই শুন উচ্চিঙ্গড়াগুলি বিধূননস্বনিত পাখার স্বরে তোমার কি স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল; আবার শুন, তোমাকে দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া সুধাধবলিত দেওয়ালের ঐ সবুজ পতঙ্গটী, তীব্রস্বরে কি গান ধরিল, গাইতে গাইতে কেমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কেমন স্তরে স্তরে তীব্রস্বর তীব্রতর তীব্রতম করিয়া তুলিল; ইচ্ছা যেন আর চুপ করিতে না হয়। হে মন-নয়ন-চোর! শুদ্ধ দেখা দিয়া তুমিই মূর্খ কীটের আহার নিদ্রা ছাড়াইতে পার, বিনা ডোরে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পার। এই সদা নবীন আমোদ প্রমোদ, অবিশ্রান্ত নৃত্য গীত দেখিয়া শুনিয়া কাহার না বোধ হয় যে, এই আলোকানন্দময়ী পৃথিবীর অন্ধ কীটগণই, নিতান্ত বঞ্চিত। হে প্রত্যক্ষ-প্রীতে! বল দেখি, তোমাকে ঘন-ঘোর কৃষ্ণাবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া, এত প্রাণীর এত মধুময় অমেয় তৃপ্তি নিবাইয়া ফেলিতে, এই সুখিসম্প্রদায়কে হঠাৎ সশঙ্কিত জড়সড় করিতে চক্ষুষ্মান কোন্ সহৃদয়ের প্রবৃত্তি হয়? দুই চারি পঙক্তি লেখক-কীট কহে—হে আলোক! তুমিই জ্ঞানের দর্শনীয়চ্ছবি, হে জ্ঞান! তুমিই ঈশ্বরের চিন্তামরী মূর্ত্তি, হে জ্ঞানালোক! তোমার জন্য মানব চিরকালই এই রূপ লালায়িত, তোমায় দেখিয়া চিরকালই এইরূপ মনোমোহিত; হে ঈশ্বর মনোভাবন! তুমি এত নিকটে, এত নির্ম্মল প্রভায় সদা সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়াও, কেন এমন দুর্ল্লভ, কেন তোমার এমন সুন্দর স্বচ্ছ মায়াবরণের এমন নিদারুণ প্রতিযোগিতা, কেন তুমি এমন মনোমোহন, যে তোমায় পাইবার চিরবিফল চেষ্টায়ও সাধকের অণুমাত্র ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই।

মাধবী।

ভুবন ও বিপিন দুই বৈমাত্র ভাই, কালেজে পড়ে, কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকে। ভুবন, বিপিনের অপেক্ষা প্রায় দুই বৎসরের বড়, অতি শান্ত, অতি সুবোধ, আর শিক্ষকের অতি প্রিয়-পাত্র। কিন্তু বিপিন ঠিক্ ইহার বিপরীত। শিক্ষক যখন তখন ছাত্র দিগকে উপদেশ দিতেন "তোমরা ভুবনের মত হইতে চেষ্টা কর।" শিক্ষকের তিরস্কার অপেক্ষা তাঁহার এ উপদেশ বাক্যটী বিপিনের কাণে অধিক বাজিত। দিন দিন ভুবন যতই প্রশংসিত হইতে লাগিল, বিপিন তত তাহাকে শত্রু বোধ করিতে লাগিল। ভুবন যে জলপানির পয়সা পায়, তাহা জমাইয়া কাহাকে পুস্তক কিনিয়া দেয়, কাহাকে বা বিদ্যালয়ের বেতন দেয়। বিপিন যাহা পায় সব কি করে তার ঠিক্ নাই।

যত বদ্ ছেলের সঙ্গে বিপিনের আলাপ, তাহার কুমতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায়ই স্কুল কামাই করে, বাসাতেও থাকেনা, কোথায় যায় তার ঠিক্ নাই। ভুবন জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আমার দরকার আছে।" স্কুল হইতে নাম কাটা গেল। ভুবন পিতাকে পত্র লিখিল। প্রত্যুত্তরে হরনাথ লিখিয়া পাঠাইলেন—"বিপিনকে ত্বরায় দেশে পাঠাইয়া দিবে"। বিপিন দেশে গেল। যাইবার কালীন বলিয়া গেল—"আমার সহিত শত্রুতা করিলে, আচ্ছা দেখিব।"

বিপিন রামমণির আদরের ছেলে। বাটী যাইয়া মার কাছে কত কাঁদিল। বলিল "মা! দাদা আমায় দুই বেলা ভাল করিয়া খাইতে দেয় নাই। আমাকে রোজরোজই বলিত যে—"আমার বাপের

বিষয় তুই কে ?" রামমণির ক্রোধ হইল, বলিলেন—" বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা ? আমি কাল সাপ পুষিতেছি ? "

শীতের ছুটিতে ভুবন বাটী আসিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিপিন এখন কিরূপ চলিতেছে।" হরনাথ উত্তর করিলেন—"এখন আর কোন দোষ নাই।" বাটীর ভিতর গিয়া রামমণিকে প্রণাম করিল; রামমণি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, কিছুই বলিলেন না। বিপিন তাহাকে দেখিবা মাত্র কোথায় চলিয়া গেল। ভুবন ডাকিল—"বিপিন, বিপিন" বিপিন কথা কহিল না। ভুবন ভাবিল "বিপিনের রাগ হইয়াছে, যখন বুঝিতে পারিবে, তখন আর রাগ থাকিবে না। "

বাটী আসিয়া বিপিন বলিল " মা ! দাদা বড় গোঁয়ার, ওর কাছে থাকিতে আমার ভয় করে। আমি না হয় দিন কতক মামার বাড়ী গিয়া থাকি।" রামমণি বলিলেন " তুমি কার জন্য বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবে ? আমি শীঘ্র সকল বালাই নিবৃত্তি করিয়া দিব।" ভুবন বাটী আসা অবধি রামমণি কত কি তাহার নামে লাগান্। কর্ত্তা চুপ করিয়া শোনেন্। ভুবন দিন দিন রামমণির ভাবান্তর দেখিতে লাগিল। ক্রমে কর্ত্তারও ভাবান্তর হইতে লাগিল। ভুবন কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। একদিন দ্বিপ্রহরে ভুবন কোথা হইতে বাটী ফিরিল—উদরে অন্ন নাই, ক্ষুধায় কাতর। বিমাতার নিকট অন্ন চাহিলে, রামমণি রাগভরে উত্তর করিলেন " আমি এই ভাত নিয়ে বসে রয়েছি আর কি ? তিন প্রহর বেলা, উনি এখন এসে বল্লেন—ভাত দাও। " ভুবন বলিল—কেন মা ! আমি কি কেউ নই ? বিপিন যে আমিওত— ভুবনের চক্ষে জল আসিল, অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখিল। রামমণি বলিলেন " তা লোকের আরাম ব্যায়রাম ত আছে। " ভুবন বলিল "মা ! আমিত তা জানিনা।" এই বলিয়া চলিয়া গেল, সঙ্গে

একটী পয়সা ছিল তাই দিয়া মুড়ি আনিয়া খাইল। তখন কর্ত্তা ঘরে ছিলেন না, কাহাকে আপনার দুঃখ জানাইবে ? ভুবন ঘরে দ্বার দিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

হরনাথ যখন বাটী ফিরিলেন, রামমণি তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা বলিলেন না। ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরনাথ বলিলেন—কি হয়েছেই ছাই বলনা।"

রাম। তোমার আর দূর ছাই কর্ত্তে হবে না! উনি দূর ছাই করবেন, ওঁর বেটা দূর ছাই কর্‌বেন। কেন আমি কি ভেসে এয়েছি ?

হর। কে বল্লে তুমি ভেসে এয়েছ ? কে কি বোলেছে ?

রাম। আর বাকি কি ? সকালে অম্‌নি আমার গা টা মাটি মাটি কর্‌ছিল বলে ভাত দিতে দেরি হ'য়েছিল। ভুবন আমায় যা'চ্ছে তাই বল্লে ; আমাকে পাল্‌কি ডাকিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

অনেক বাক্‌ বিতণ্ডার পর হরনাথ বলিলেন "বটে ? এত বড় স্পর্দ্ধা ? আমি এখনি ইহার বিহিত করিতেছি।" রামমণি বলিলেন "এখন থাক্‌, এই ঘুরিয়া আসিতেছ, একটু স্থির হও। তুমি খানিক ঘুমোও, আমি বাতাস করি, তার পর যা হয় কোরো এখন।" কর্ত্তা গৃহিণীর এই মৌখিক যত্নে আরও রাগিলেন, বলিলেন—"না, আগে উপায় করি।"ভুবনকে ডাকিলেন, ভুবন আসিলে বলিলেন—"তোমার বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তুমি যাকে তাকে গাল দাও, অমন ছেলের আমি মুখ দেখি না।" ভুবন বলিল—"মা! আমি তোমায় কি বলিয়াছি ?" রামমণি বলিলেন—"কি বল্‌বার বাকি রেখেছ ?" ভুবন এ মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হরনাথ বলিলেন—"থাক্‌ সে সব কথায় কাজ নাই, তুমি স্থানান্তরিত হও।" ভুবন বলিল— "বাবা! আমি নিরাশ্রয় হইয়া কোথায় যাইব ?" "তোমার যথা

ইচ্ছা” বলিয়া কর্ত্তা সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ভুবন পুনরায় ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ঘরে আসিবা মাত্র ভুবন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রথম উচ্ছ্বাস কিছু শমিত হইলে, ভুবন ভাবিল—“এখন কোথা যাই? যাইবারই বা আবশ্যক কি? বাবার এ রাগ থাকিবে না।” কিন্তু তখনই সে শুনিতে পাইল—“এখনও যায় নাই।” ভুবন ভাবিল আর না—এখনই যাইব।” ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; আকাশে চন্দ্র নাই, তারা নাই,—চারিদিকে কেবল রাশি রাশি স্তুপাকৃতি মেঘ। মাথার উপর ক্ষণে ক্ষণে দামিনী হাসিতেছে। যখন সূতিকাগারে ভুবনের মাতার মৃত্যু হয়, তখন হরনাথকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—“ইচ্ছা হয় বিবাহ করিও, কিন্তু ছেলেটী যদি বাঁচে ত, অযত্ন করিও না।”

ভুবন বাটীর বাহির হইল, অনেকে দেখিল, কেহ ফিরাইবার যত্ন করিল না। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দুই একটী পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—“ভুবন, এমন সময় কোথা যাইতেছ?” ভুবন ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিল—“নিকটেই প্রয়োজন আছে।” যতক্ষণ গ্রামের ভিতর ছিল, স্থানে স্থানে ক্ষীণ দীপালোক দেখিতে পাইতেছিল, এখন গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িয়াছে, সম্মুখের নির্ব্বিঘ্ন অন্ধকার কেবল মাঝে মাঝে ক্ষীণ ক্ষণপ্রভার হাসিতে ভঙ্গ হইতেছে। দিক্‌ নির্ণিত নাই, ভুবন বিদ্যুদ্দর্শিত পথে চলিতে লাগিল। মনে ভয়ের লেশ মাত্র নাই, যে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিতেছে, তাহার কিসের ভয়? নিঃসহায়, নিরাশ্রয় ভুবন চলিল।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, বজ্র হুঙ্কারিল, বায়ু ছুটিল। পথিক নিঃসহায়, নিরাশ্রয়,

নিরাহার, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, হৃদয়ের বেগভরে চলিতেছে। মুষল ধারে বৃষ্টি আসিল, বায়ুর বেগে গতিরোধ হইতে লাগিল, আর চলা যায় না। ক্ষুধায়, পথশ্রমে, শরীর বিকল ; শীতে অঙ্গ কাঁপিতেছে। পথিক নিস্তেজ হইয়া আসিল। যতক্ষণ শরীরে তেজ ছিল, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এখন সে তেজ নাই ; ভুবন চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইল—সম্মুখে, দূরে এক খানি অট্টালিকা রহিয়াছে। মনে আশার সঞ্চার হইল, সেই পথ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। বহুকষ্টে অট্টালিকায় পহুঁছিল। ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কেও ?" ভুবন উত্তর করিল "পথিক নিরাশ্রয়, নিরাহার।" প্রশ্ন-কর্ত্তা বলিলেন—"অমন পথিক অনেক আসে, এখানে কিছু হবেনা, ফিরে দেখ।" ভুবন ফিরিল ; একবার আকাশের দিকে চাহিল, রহিল না, চলিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আর কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিব না।" ভুবন এক মনে চলিতে লাগিল। ক্রমে বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল, আকাশ অল্প পরিস্কার হইল, বায়ু একটু থামিল। ভুবন চলিতেছে, পথ পিচ্ছল, মাঝে মাঝে পিছ্লাইয়া পড়িতেছে। এরূপে কতদূর গেল বলিতে পারি না।

অনেক দূর গমন করিলে, ভুবন দেখিতে পায় নাই, সম্মুখে এক খানি খোলার ঘর ছিল, প্রতিঘাতে পড়িয়া গেল। পতনের শব্দে গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা ?" কোন উত্তর পাইলনা, ভুবন মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহস্বামী বাহিরে আসিয়া দেখিল কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। ডাকিয়া বলিল—"মাধবী, পিদিম্‌টা নিয়ে আয়ত।" মাধবী দীপ আনিল। গৃহস্বামী পথিককে মুর্চ্ছিত দেখিয়া গৃহমধ্যে উঠাইয়া লইয়া গেল। ভাবিল—"এ আবার কি পাপ !" একদিন ভুবনের চেতনা হইল না। পরে চেতনা হইলে জ্ঞান নাই,

কত কি আবল তাবল বকে। মাধবীকে দেখিলে কি মনে করিয়া কখন বলে—"আর কেন, অনেক সহ্য করিয়াছি।" কখন খুন করিতে যায়। গৃহস্বামী মধুসূদনকে দেখিলে কখন কখন বলে—"কি দোষে আমায় ত্যজ্য করিলে?" মধুসূদন বড় বিপদে পড়িল, অনেক দূরে একজন কবিরাজ ছিল, তাহাকে আনিল। কবিরাজ সুচিকিৎসক; অনেক যত্নে পীড়ার উপশম হইতে আরম্ভ হইল।

ভুবন এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত কাহিল, শয্যা হইতে উঠিতেও কষ্ট হয়। মাধবী, মধুসূদনের কন্যা, নিয়তই কাছে থাকে। কবিরাজ বলেন, মাধবী না থাকিলে, ভুবন বাঁচিত কি না সন্দেহ। ভুবন কৃতজ্ঞতা পূর্ণ নয়নে মাধবীর দিকে চাহিয়া দেখে, মাধবী বলে—"তুমি আগে যে আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইতে।"

ভুবন কহিল—মাধবী, তুমি না থাকিলে আমি বাঁচিতাম না, তুমিই আমায় বাঁচাইয়াছ।"

মাধবী প্রত্যুত্তর দিল—"বাবা যে বলে আমি পাগ্‌লী।"

ভু। ও ফুলের বালা দু'গাছি শুকাইয়া গেছে, খুলে ফেল।

মাধবী ফেলিতে চায় না।

ভু। তুমি কি বড় গহনা পরিতে ভাল বাস?

মা। হ্যাঁ। বাবা কত সোণার গহনা দেয়; কিন্তু পরিতে বারণ করে—কাহাকে বলিতেও বারণ করে। তুমি কাহাকেও বোলো না।

ভু। তোমার বাবা গহনা পায় কোথা?

মা। তা জানি না।

অনেক বার ভুবন ভাবিয়াছে—"মধুসূদন কি করে" কিছুই ভাল করিয়া ঠিক্ করিতে পারে নাই। "দিনের বেলা মধুসূদন বাটী থাকে, এখন বাহির হইয়াছে। অনেক রাত্রে ফিরিবে। সোণার গহনা আসে কোথা হইতে? পরিতেই বা বারণ কেন? 'কাহাকেও বলিওনা!'

মধুসূদন কি দস্যু ? দস্যু এত দয়ালু ?" ভাবিতে ভাবিতে ভুবন ঘুমাইয়া পড়িল।

দিন যাইতে লাগিল—দিনে দিনে ভুবনের কান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধিতপ্রভ হইতে লাগিল। মধুসূদন এখন সকলই বলিয়াছে। ভুবন নিত্যই "যাই যাই" করে। মধুসূদন বলে—"ভাল করিয়া সার, তার পর যাইবে। আর কি করিবে তা'ও একটা স্থির কর।" ভুবন মাধবীর মুখের দিকে চায়, আর যাইতে ইচ্ছা করে না।

গভীর রাত্রে মধুসূদন জনকতক লোক সঙ্গে করিয়া একদিন বাটী আসিল। যে ঘরে ভুবন বসিয়া ছিল, সেই ঘরে সকলে প্রবেশ করিল। ভুবনকে দেখিয়া সকলে কুণ্ঠিত হইল। মধু বলিল—"ভুবন সকলই জানে, ইহাকে লুকাইবার আবশ্যক নাই।" সকলে বসিল। সে দিন ডাকাইতি করিয়া অনেক পাইয়াছে, সকলে তাহা ভাগ করিতে বসিল। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ভুবন সেইখানেই রহিল। মধু চারিদিক্ দেখিয়া আসিল, কেহ কোথাও নাই। জিনিস পত্র ভাগ হইতেছে, দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া কক্ষ মধ্যে পুলিস্ প্রবেশ করিল। ডাকাইতের দল উঠিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল, পুলিসের দল অধিক, কেহই পলাইতে পারিল না, সকলেই ধরা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ভুবনও ধৃত হইল। মালসমেত সকলেই চালান হইল। মাধবী তখন ঘুমাইয়া আছে।

ভুবনের সাপক্ষে কিছুই নাই। পুলিস্ বিরুদ্ধে। মোকৰ্দ্দমা সাজাইতে কিছুই ত্রুটি করিল না, শক্ত মোকৰ্দ্দমা। বিচারপতি ভুবনকে অল্প বয়স্ক ও কিছু সুশিক্ষিত দেখিয়া যথা সাধ্য অল্প দণ্ড বিধান করিলেন। ভুবনের তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস আজ্ঞা হইল।

ভুবন বাটী হইতে চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরেই বিপিন নিজ

মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকল দিন বাটী থাকে না, প্রায়ই টাকার দর-কার। বৃদ্ধ না দিলে ঋণ করে। রামমণি বলে—“ছেলে জেলে যাবে?” বৃদ্ধ অগত্যা ঋণ পরিশোধ করেন। এই রূপে দিন যাইতে লাগিল। হরনাথ ভাবেন “আমি অভাগা, নহিলে আমার এমন দশা ঘটিবে কেন?” ক্ষোভে শোকে বৃদ্ধ এক বৎসর পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। উইল রামমণির নামে হইয়াছিল। রামমণি টাকা না দিলে, বিপিন গালাগালি দেয়, মারিতে যায়। তিনিও ভাবিলেন—“আমার অদৃষ্ট মন্দ।”

এই রূপে দিন যায়। বিপিন এখন মস্ত বাবু। সর্ব্বক্ষণই সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেবের দল ফিরিতেছে। যখন তখনই বৈটকখানা হইতে তব্‌লার আওয়াজ ও মধুর কণ্ঠ উঠিতেছে। রামা খানসামা শুদ্ধ বোতল বিক্রয় করিয়া মাসে অনেক উপরি রোজ্‌কার করে।

সন্ধ্যার পর দু’তিন জন মোসাহেব সঙ্গে করিয়া বিপিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। চারিদিকে বেশ জ্যোৎস্না, মন্দ মন্দ বাতাস বহি-তেছে। এমন রাত্রে বিপিন প্রায়ই বেড়ায়। পথের ধারে দেখিতে পাইল, একটী বালিকা বসিয়া আছে। লোক দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়া-ইল। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—“কে গা?” বালিকা বলিল—“আমি মাধবী।” স্বরে বোধ হইল বালিকা রোদন করিতেছিল।

বিপিন। কাঁদিতেছ কেন?

মাধবী। আমার কেহই নাই। এইখানে একজনদের বাটীতে চাকরী করিতাম, তাহারা তাড়াইয়া দিয়াছে। এখন কোথায় যাইব।

বিপিন। আমার সঙ্গে আইস।

অসহায় অবস্থায় দয়ার আহ্বান শুনিলে সকলেই বশীভূত হয়। মাধবী বিপিনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু বিপিনের মনে হঠাৎ এমন দয়া হইল কেন? তাহা বলিতে পারিনা, বোধ হয় বালিকার মুখ খানি দেখিয়া।

মধুসূদন ও ভুবন ধৃত হইলে মাধবী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একটী ভদ্রলোক তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া চক্ষের জল ফেলিলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া গেলেন। মাধবী তাঁহার পত্নীর নিকট রহিল। এক বৎসর দুই বৎসর গেল, মাধবী বয়স্থা হইতে লাগিল। ভদ্রলোকটী বালিকার সরলা প্রকৃতি ও অনেক গুণ দেখিয়া দিন দিন অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রমদা ভাবিল—"গতিক বড় ভাল নয়, ছুঁড়ি বুঝি আমাকে মজায়।" অনেক দোষ ধরিয়া মাধবীকে বাহির করিয়া দিল।

বিপিন মাধবীকে সঙ্গে করিয়া বাগানে লইয়া গেল। বলিল—"তুমি এইখানে থাক।" বাটী হইতে একজন দাসী আনাইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াদিল। শেষে গোপনে বলিয়া গেল—"যদি ইহাকে আমার করাইয়া দিতে পারিস্, আচ্ছা করিয়া বক্‌সিস্ দিব।" দাসী একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা।"

এখন "হে দেবি অমৃতভাষিণি!" তুমি একবার আমার স্কন্ধে চাপ, আমি প্রভাত বর্ণনা করিব। প্রাতঃকালে উষা হাস্যময়ী, যেমন চিরদিন হাসেন, আজিও তেমনই হাসিতেছেন। শিশির-সিক্ত নব দূর্ব্বাদলে তেমনই মুক্তা ফলিয়াছে। মন্দ পবন তেমনই বহিতেছে। বিপিনের বাগানের গাছে গাছে, লতায় লতায়, তেমনই ফুল ফুটিয়াছে। সরোবরে তেমনই হিল্লোল বহিতেছে। তেমনই পদ্মবন কাঁপিতেছে। সে সরোবর-তীরে আর আর চারি দিকে কোকিল তেমনই গাইতেছে। সবই সেই আছে—নূতন কেবল একটী স্থলপদ্ম ফুটিয়াছে। বাগানে সবই তাই—নূতন কেবল মাধবী। মাধবীর দিন কতক বড় ভাল লাগিল না। কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবে। কিন্তু ক্রমে সে ভাব গেল। পরিচারিকা তাহাকে বড় যত্ন করে।

মাধবীর গহনা পরিবার সাধ চিরকাল; সকালে সরোবর-তীরে

বসিয়া ফুলের গহনা গাঁথিতে ছিল। কাছে পরিচারিকা ছিল, বলিল—"বাবুকে বিবাহ করিলে বাবু কত সোণার গহনা দিবেন।"

মাধবী। তুমি রোজ রোজই ঐ কথা বল। তোমার বাবু আমায় বিবাহ করিবেন কেন?

দাসী। কেন বাবুত প্রায়ই তাই বলেন। তিনি যে তোমায় কত ভাল বাসেন, তা'ত তুমি জাননা।

মাধবী। এখন বাবা নাই, কে আমায় বিবাহ দিবে?

দাসী। কেন যার বাবা নাই তার কি বিবাহ হয় না?

মাধবী চুপ করিল। পরিচারিকার মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিপিনের কোন গুণই ছিলনা। যদি গুণ বলা যায়, তবে একটু রূপ ছিল। পাগলিনী মাধবী সে রূপ দেখিয়াছিল। মাঝে মাঝে বিপিনের মুখ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইত। ক্ষতি কি?—মধুসূদনও মাঝে মাঝে মদ খাইত। মাধবী জানে বাবা যা করে তাহাতে কোন দোষ নাই। কিছুদিন পরে ছলে কৌশলে বিপিন মাধবীকে মিথ্যা বিবাহ করিল। বালিকা বিবাহের বড় একটা বুঝিত না। অভাগিনী মজিল।

বিবাহের কিছুদিন পর হইতে মাধবীর প্রতি বিপিনের আর সে ভাব রহিল না। আসে যায়—আসা যাওয়া মাত্র। বালিকা আপনার হৃদয়ের ভরে সে ভাব বুঝিতে পারিলনা। ভালবাসার অন্ধের প্রকৃতি, অল্প ত্রুটি লক্ষিত হয় না। মাধবী প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে।

বিপিনের ভাবান্তরের কারণ—সে মাধবীকে প্রকৃত রূপে ভাল বাসিত না। মাধবীকে দেখিয়া অবধি অজেয় রূপ-তৃষ্ণা তাহাকে কাতর করিয়াছিল। তৃষ্ণাতুরের সঙ্গে জলের যে সম্বন্ধ, বিপিন ও মাধবীতে সেই সম্বন্ধ। তৃপ্ত হইলে জলের আর আদর থাকেনা। মাধবীর প্রতি বিপিনেরও আর সে যত্ন রহিল না।

কিন্তু বিপিন এখন একেবারে আসা বন্ধ করিয়াছে। মাধবী

পরিচারিকার দ্বারায় বলিয়া পাঠায়। "যাইব" বলিয়া বিপিন আর আসে না। দিন যায় থাকে না, মাধবীর সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে লাগিল। মাধবী মনে মনে ভাবে—"আমি তোমার কথার ভিখারী, তোমায় একবার পাই না কেন ?"

ক্রমে বিপিনের বিপক্ষে মাধবীর কাণে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। একদিন বিপিন আসিলে মাধবী কাঁদিয়া তাহার পদ প্রান্তে পড়িয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। বিপিন বলিল—"তুমি যখন সবই শুনিয়াছ, তখন আর আমার গোপন করিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমায় কিছু কিছু মাসহারা দিব, তুমি আর আমার সমক্ষে আসিও না। উন্মাদিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিছুই বলিল না। সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ভুবন খালাস হইয়া মধুসূদনের বাটীতে আসিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চালে স্থানে স্থানে খড় উড়িয়া গিয়াছে, দরজায় উই ধরিয়াছে, মাধবীর সাধের ক্ষুদ্র ফুলের বাগানটী বন হইয়া গিয়াছে। ভুবন ব্যাকুল হইল। নিকটে যে দুই এক ঘর লোক ছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসা করাতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল "পাগলের মত হইয়া গিয়াছে।" ভুবন কি শুনিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় থাকে ?" তাহারা বলিল ঠিক্ নাই, মাঝে মাঝে আসিয়া ঐ ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া থাকে।

ভুবন মাধবীর সম্বন্ধে সমস্তই শুনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না, হেথায় সেথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে সেই ভাঙ্গা ঘরে আসিয়া এক একবার দেখিয়া যায়।

একদিন দেখিল মাধবী শুইয়া আছে। নয়ন নিমীলিত। রুক্ষ কেশ বায়ুভরে দুলিতেছে। মলিন বাস। কান্তি মলিন—কিন্তু তবু

রূপে সেই ভগ্ন কুটীর আলোকময়। ভুবন দেখিল, তিন বৎসর যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কারাগারে জীবিত ছিল, এ তাহার ছায়াময়ী প্রতিমা মাত্র। যে মাধবী কোকিলের কুজনে কণ্ঠ মিলাইয়া কানন কম্পিত করিত, ভ্রমর গুঞ্জনে গীত গাইয়া স্তবকে স্তবকে কুসুম তুলিত, সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিত, সে বন-ফুল-বিভূষণা মাধবী নাই। এ সংসারে দুঃখ এই—যা' কিছু সুন্দর তাই শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

বিকম্পিত স্বরে ভুবন ডাকিল—"মাধবী"। পাগলিনী নয়ন মেলিল—স্থিরদৃষ্টে ভুবনের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—বলিল "কি দেখিতে আসিয়াছ ভুবন? আমি এখন একলা থাকিতেই ভালবাসি।" মাধবী কিছু দিন পাগলের ন্যায় হইয়া ছিল, কিন্তু যে অবধি পীড়া হইয়াছে সে অবধি আর সে ভাব নাই; এখন আবার বেশ জ্ঞান হইয়াছে—সব বুঝিতে পারে। দেখিলে লোকে মুখ ফিরায়, এজন্য মাধবী আর কাহাকে দেখা দেয় না। আর কিছুই ভাল লাগে না, মাধবী একলা থাকিতেই ভাল বাসে। অনেক কথা হইল। ভুবন অনেকবার ক্রোধে কাঁপিয়াছে, দুঃখে গলিয়াছে। ভুবনের স্নেহে মাধবীও অনেকবার চক্ষুঃজল ফেলিয়াছে। পীড়া বৃদ্ধি-পাইতে লাগিল। "বাবার সঙ্গে একবার দেখা হইল না" বলিয়া মাধবী কাঁদে। আজ শেষ দিন। ভুবনের হস্ত ধরিয়া বলিল—"আমি চলিলাম।" মাধবী অনেকক্ষণ ভাবিল। শেষে ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এক অনুরোধ—কোন প্রতিশোধ লইও না। আমার যা' হইবার হইয়াছে।"

সেই দিন মধুসূদন উপস্থিত। মাধবীর নয়ন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। মধু, মাধবীর অবস্থা দেখিয়া বলিল—"মাধবী, কি হয়েছে মা?" মাধবীর নয়ন বাষ্পময় হইল, বলিল—"বা—বা! আ—মি যাই।"

পরিচারিকার দ্বারায় বলিয়া পাঠায়। “যাইব” বলিয়া বিপিন আর আসে না। দিন যায় থাকে না, মাধবীর সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে লাগিল। মাধবী মনে মনে ভাবে—“আমি তোমার কথার ভিখারী, তোমায় একবার পাই না কেন?”

ক্রমে বিপিনের বিপক্ষে মাধবীর কাণে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। একদিন বিপিন আসিলে মাধবী কাঁদিয়া তাহার পদ প্রান্তে পড়িয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। বিপিন বলিল—“তুমি যখন সবই শুনিয়াছ, তখন আর আমার গোপন করিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমায় কিছু কিছু মাসহারা দিব, তুমি আর আমার সমক্ষে আসিও না। উন্মাদিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিছুই বলিল না। সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ভুবন খালাস হইয়া মধুসূদনের বাটীতে আসিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চালে স্থানে স্থানে খড় উড়িয়া গিয়াছে, দরজায় উই ধরিয়াছে, মাধবীর সাধের ক্ষুদ্র ফুলের বাগানটী বন হইয়া গিয়াছে। ভুবন ব্যাকুল হইল। নিকটে যে দুই এক ঘর লোক ছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসা করাতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল “পাগলের মত হইয়া গিয়াছে।” ভুবন কি শুনিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় থাকে?” তাহারা বলিল ঠিক্ নাই, মাঝে মাঝে আসিয়া ঐ ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া থাকে।

ভুবন মাধবীর সম্বন্ধে সমস্তই শুনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না, হেথায় সেথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে সেই ভাঙ্গা ঘরে আসিয়া এক একবার দেখিয়া যায়।

একদিন দেখিল মাধবী শুইয়া আছে। নয়ন নিমীলিত। রুক্ষ কেশ বায়ুভরে দুলিতেছে। মলিন বাস। কান্তি মলিন—কিন্তু তবু

রূপে সেই ভগ্ন কুটীর আলোকময়। ভুবন দেখিল, তিন বৎসর যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কারাগারে জীবিত ছিল, এ তাহার ছায়াময়ী প্রতিমা মাত্র। যে মাধবী কোকিলের কুজনে কণ্ঠ মিলাইয়া কানন কম্পিত করিত, ভ্রমর গুঞ্জনে গীত গাইয়া স্তবকে স্তবকে কুসুম তুলিত, সলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিত, সে বন-ফুল-বিভূষণা মাধবী নাই। এ সংসারে দুঃখ এই—যা' কিছু সুন্দর তাই শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

বিকম্পিত স্বরে ভুবন ডাকিল—"মাধবী"। পাগলিনী নয়ন মেলিল—স্থিরদৃষ্টে ভুবনের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল—বলিল "কি দেখিতে আসিয়াছ ভুবন? আমি এখন একলা থাকিতেই ভালবাসি।" মাধবী কিছু দিন পাগলের ন্যায় হইয়া ছিল, কিন্তু যে অবধি পীড়া হইয়াছে সে অবধি আর সে ভাব নাই; এখন আবার বেশ জ্ঞান হইয়াছে—সব বুঝিতে পারে। দেখিলে লোকে মুখ ফিরায়, এজন্য মাধবী আর কাহাকে দেখা দেয় না। আর কিছুই ভাল লাগে না, মাধবী একলা থাকিতেই ভাল বাসে। অনেক কথা হইল। ভুবন অনেকবার ক্রোধে কাঁপিয়াছে, দুঃখে গলিয়াছে। ভুবনের স্নেহে মাধবীও অনেকবার চক্ষুঃজল ফেলিয়াছে। পীড়া বৃদ্ধি-পাইতে লাগিল। "বাবার সঙ্গে একবার দেখা হইল না" বলিয়া মাধবী কাঁদে। আজ শেষ দিন। ভুবনের হস্ত ধরিয়া বলিল—"আমি চলিলাম।" মাধবী অনেকক্ষণ ভাবিল। শেষে ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এক অনুরোধ—কোন প্রতিশোধ লইও না। আমার যা' হইবার হইয়াছে।"

সেই দিন মধুসূদন উপস্থিত। মাধবীর নয়ন ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। মধু, মাধবীর অবস্থা দেখিয়া বলিল—"মাধবী, কি হয়েছে মা?" মাধবীর নয়ন বাষ্পময় হইল, বলিল—"বা—বা! আ—মি যাই।"

মাধবী মরিল। মধুসূদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চেতনা হইলে মধুসূদন শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিল, শেষে ভুবনের মুখে সব শুনিলে তাহার আর সে রোদন রহিল না। ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। মাধবীর সৎকার করিয়া ভুবন চলিয়া গেল। মধু আর বাটী ফিরিল না।

গভীর রাত্রে মধু ডাকাইতের দল লইয়া বিপিনের বাটীতে উপস্থিত। বিপিনের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। রামমণি মরিলেন। বিপিন রাত্রে বাটী থাকিত না, তাহাকে পাওয়া গেল না। মধুসূদন চলিয়া গেল। ভুবনকে অনেক খুঁজিল, পাইল না। তাহাকে সে অবধি সে দেশে কেহ দেখিতে পায় নাই। ডাকাইতের দল অনেক অন্বেষণ করিয়াছে শুনিয়া, বিপিন কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু মাতার সৎকার করিয়া দেশান্তরী হইল। কিছুই সম্পত্তি নাই, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে। কোন দিন জোটে, কোন দিন জোটে না। সে শ্রী নাই। হৃদয়ে নরক যন্ত্রণা।

এইখানে আমরা উপসংহার করি, ভগ্ন হৃদয়ে ভুবনের সে মৃত্যু আর আমাদের দেখাইতে ইচ্ছা নাই।

——:——

ঈশ্বর তত্ত্ব।

পূর্ব্ববৎ এবং শেষবৎ তর্কের তারতম্য।

তর্ক দ্বিবিধ, পূর্ব্ববৎ এবং শেষবৎ। কতিপয় যাথার্থ্য স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ তর্ক দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে না কিন্তু তাহার বিপরীত মনুষ্য-বুদ্ধির অনুভূত নহে। স্বতঃসিদ্ধ যাথার্থ্য অবলম্বন করতঃ যে তর্ক দ্বারা কোন বিষয় স্থিরীকৃত হয় তাহা পূর্ব্ববৎ তর্কাখ্যেয়। শেষবৎ তর্কের মূলাধার ভূয়োদর্শন। ঘোটক জাতির চঞ্চু

নাই, মহিষ জাতির চক্ষু নাই, কুক্কুর জাতির চক্ষু নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি ; ইহারা সকলেই চতুষ্পদ ; অতএব চতুষ্পদ শ্রেণী মাত্রেরই চক্ষু নাই। এরূপ সিদ্ধান্তের বাস্তবিক অর্থ এই যে আমি যতদূর দেখিয়াছি কি শুনিয়াছি সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণীই চক্ষু বিহীন। অতএব শেষবৎ তর্কের দ্বারা কোন বিষয় নিশ্চয় রূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; তাহার সম্ভবাসম্ভব মাত্র প্রমিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, তর্কের প্রথম প্রস্তাব যতদূর সম্ভব, মীমাংসিত প্রস্তাব সেই পরিমাণে সম্ভব মাত্র। সুতরাং ভবিষ্যদনুসন্ধান দ্বারা অনেকানেক শেষবৎ-তর্ক-মীমাংসিত প্রস্তাবের যে অযাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উল্লিখিত মীমাংসাই তদ্বিষয়ের উদাহরণ স্থল। শতাব্দিক বৎসরের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির মনে উক্ত মীমাংসার যাথার্থ্য বিষয়ে স্বপ্নেও কোন সন্দেহ হয় নাই কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এক প্রকার চক্ষু যুক্ত চতুষ্পদ জন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই প্রকার তর্কই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে, গৌতম এবং পতঞ্জলি শেষবৎ তর্কা-বলম্বী দার্শনিকগণের গুরু স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতী-চীন দার্শনিকগণকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পেলী, চামর, বট্‌লর প্রভৃতি দার্শনিকেরা শেষবৎ তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং লক্, ক্লার্ক, বিশপ হামিল্টন্, গিনিপ্সী প্রভৃতি দার্শনিকগণ পূর্ব্ববৎ তর্কাবলম্বন পুরঃসর উক্ত দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শেষবৎ তর্কাবলম্বী দার্শনিকগণ এই অবনী মণ্ডল পর্য্যালোচনা দ্বারা সর্ব্বত্রই অভিসন্ধির চিহ্ন আবিষ্কার করতঃ এই তর্ক করেন যে, যে কোন কার্য্যে অভিসন্ধি দৃষ্ট হয় তাহার কর্ত্তা বুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই অবনী মণ্ডলের

স্রষ্টা আছেন এবং তিনি বুদ্ধি-সম্পন্ন। অবনী মণ্ডলের যেরূপ অভিসন্ধি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য, অতএব তাহার স্রষ্টার বুদ্ধি অসাধারণ এবং মনুষ্য-বুদ্ধির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠতম ; কিন্তু এতদ্দ্বারা ঈশ্বর যে অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী এবং অনন্য প্রমিত হইতেছে না। ফলতঃ শেষবৎ তর্ক-দ্বারা যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাকরণ হইতে পারে না তাহা নিম্নলিখিত পর্য্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। প্রথমতঃ, শেষবৎ তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত ব্যাপ্তি প্রমিত হইতে পারে না। বিশ্ব-মণ্ডলে আমরা যে কার্য্য সমূহ দৃষ্টি করি তাহার একটীও অনন্ত নহে। সকল কার্য্যই সীমাশীল সুতরাং সীমাশীল কার্য্য হইতে অনন্ত-ব্যাপী কারণ অনুমিত হইতে পারে না। যদি এরূপ তর্ক করা যায় যে তিনি অনন্ত-ব্যাপী না হইলেও তাঁহার উদ্যম সর্ব্বত্র বিদ্যমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে অতএব তিনি উদ্যম দ্বারা সর্ব্ব বিদ্যমান ; তাহাতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ, ঈশ্বর উদ্যম দ্বারা বিদ্যমান আছেন এরূপ বাক্য অর্থ হীন। অধিকন্তু ঈশ্বর যে উদ্যম দ্বারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন তদ্বিষয়ের প্রমাণাভাব। অতঃপর ঈশ্বর অনন্ত ব্যাপী সর্ব্ব বিদ্যমান না হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। যাঁহার ব্যাপ্তি এবং বিদ্যমানতা সীমাশীল, তিনি অনন্ত ব্যাপ্তি অধিকার করিতে পারেন না। এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থান অধিকার করিতে পারেন বটে, কিন্তু ইহাতে অনন্ত ব্যাপ্তি শেষ করিতে পারেন না ; সুতরাং তাহা আয়ত্তাধীন না হওয়া নিব-ন্ধন অনন্ত জ্ঞান অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান না হইলে সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। কারণ তিনি যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিতে অক্ষম হন, তাঁহার ক্ষমতা সীমাশীল, সুতরাং তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছামত কর্ম্ম

করাও সর্ব্বদা সম্ভব নহে। ফলতঃ ঈশ্বরের কোন গুণ সীমাশীল হইলে অন্যান্য সমস্ত গুণও যে সুতরাং সীমাশীল হইবে তাহা সামান্য বুদ্ধি দ্বারা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। শেষবৎ তর্ক দ্বারা ঈশ্বরের একটী মাত্র গুণও অসীম প্রমিত হইতে পারে না, সুতরাং এ প্রকার তর্ক ঈশ্বরতত্ত্বে বিশেষ ফলোদায়ক নহে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের অনন্যতা প্রমাণে শেষবৎ তর্ক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বিশ্বমণ্ডলে কার্য্যের অভিসন্ধি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান আছে এবং ঐ অভিসন্ধির ঐক্যও লক্ষ্য হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ঈশ্বর যে একমাত্র, দ্বিতীয় নাই, কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে? কতিপয় সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি এক-তান-লয়-মানে গান বাদ্য করিলে তাহাতে অভিসন্ধি ও ঐক্য দুই গুণেরই অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু শ্রোতা দিগের মধ্যে কেহই অনুমান করিতে পারেন না যে ঐ রূপ সঙ্গীতের কারণ এক ব্যক্তি মাত্র; অধিকন্তু আমরা সকল পদার্থেই অভিসন্ধি দৃষ্টি করি বটে কিন্তু যে মহাপুরুষ ঐ অভিসন্ধির স্রষ্টা তিনিই কি পদার্থ সমূহের স্রষ্টা? ইহার উত্তর শেষবৎ তর্কাবলম্বীরা কখনই সম্যক রূপে দিতে পারেন না।

আর্য্য জাতির কতিপয় ধর্ম্ম পুস্তকে উক্ত আছে যে স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিশ্ব-সৃষ্টির অভিলাষী হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে বিশ্ব-সৃষ্টির ভার, বিষ্ণুকে বিশ্ব-রক্ষার ভার, এবং মহেশ্বরকে সংহারভার প্রদান করিলে, ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দার্শনিক মাত্রেই উল্লিখিত কথা মানব-কপোল-কল্পিত বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষবৎ তর্কের দ্বারা তাহার অলীকত্ব প্রমিত হইতে পারে না। অতঃপর পদার্থ-সমূহের যে অভিসন্ধি দৃষ্ট হয় তাহার কর্ত্তা যদি সেই পদার্থ সমূহের স্রষ্টা না হন, তাহা হইলে যে ঈশ্বরের অনন্যত্ব এককালে ধ্বংস হইয়া যায়, বলা

বাহুল্য। পুনশ্চ যে পদার্থ সমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে অভিসন্ধি এবং ঐক্য দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু বিশ্বমণ্ডল মধ্যে তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প এবং সেই সকল পদার্থের স্রষ্টা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেও যে অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের স্রষ্টা সেই ঈশ্বর হইবেন তাহার প্রমাণ শেষবৎ তর্ক-লব্ধ নহে। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে আমরা যে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহ এবং সূর্য্য ইত্যাদি পদার্থ সমূহ দেখিতেছি তাহা অনন্তকাল হইতে আছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং তাহাদের স্রষ্টা যে অনাদি তাহারাও সিদ্ধান্ত শেষবৎ তর্ক দ্বারা হওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু সেই স্রষ্টা যে অদ্যাবধি বিরাজমান আছেন তাহার কোন যুক্তি শেষবৎ তর্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়না। কোন অরণ্যে অট্টালিকাদি দৃষ্ট হইলে তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারাযায় যে ঐ সব অট্টালিকাদি মানব জাতির দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণ কর্ত্তারা বর্ত্তমান আছেন এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা। সুতরাং ঈশ্বর যে অনন্ত, তাঁহার যে লয় নাই, এরূপ মীমাংসা করা শেষবৎ তর্কের ক্ষমতাতীত। ফলতঃ শেষবৎ তর্কদ্বারা এইমাত্র মীমাংসা হয় যে, আমরা যে পদার্থ সমূহ দৃষ্টি করিতেছি তাহাদের প্রারম্ভে এক কিম্বা কতিপয় চেতন পদার্থ ছিল এবং তাহাদের এরূপ বুদ্ধি, শক্তি ইত্যাদি গুণ ছিল যে তদ্দ্বারা ঐ পদার্থ সমূহ সৃষ্ট হইতে পারে। এক্ষণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে পূর্ব্ববৎ তর্ক যে সম্যক প্রকারে উপযোগী তাহা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। নাস্তিকেরা এবং শেষবৎ তর্কপ্রিয় দার্শনিকগণ যে যে আপত্তি করিয়া থাকেন তাহা পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত ও খণ্ডিত হইলেই উক্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। সূক্ষ্ম-বুদ্ধি পণ্ডিতবর হিউম পূর্ব্ববৎ তর্ক বিষয়ে যে আপত্তি করিয়াছেন তাহাই ভিন্নাবরবে অন্যান্য পণ্ডিতগণ এবং শেষবৎ-তর্ক-অনুমোদকগণ অধিকাংশ উত্থাপন করিয়া

থাকেন। অতএব হিউম মহোদয়ের আপত্তি প্রথমতঃ বিবেচ্য। তিনি বলেন অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ তর্ক প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি তাহার নাস্তিত্বও অনুভূত হইতে পারে। সম্মুখে অট্টালিকা দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে, কিন্তু তাহার নাস্তিত্বও অনুভব করা অনায়াস-সাধ্য। পূর্ব্ববৎ-তর্ক কেবল গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে: কারণ গণিতশাস্ত্রের কোন বিষয়ের বিপরীত অনুভব যোগ্য নহে। দুই আর দুই একত্র করিলে চার হয়, ত্রিভুজের অন্তরস্থ তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান ইত্যাদি বিষয়ের বিপরীত অনুভব করা যায় না; সুতরাং এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ববৎ তর্ক ব্যবহার্য্য কিন্তু যাহার বিপরীত অনুভূত হইতে পারে তাহা প্রমেয় (demonstrable) নহে। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব অনায়াসে অনুভূত, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ তর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সুবিজ্ঞ হিউমের যুক্তিতে এই ভ্রম লক্ষ্য হইতেছে যে তিনি ঈশ্বরের নাস্তিত্ব অনায়াস-অনুভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যে যাহারই অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি তাহারই নাস্তিত্বও অনুভব করিতে পারি। সুতরাং নাস্তিত্বও অনুভূত। কিন্তু বাস্তবিক সকল অস্তিত্বে নাস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি না: কারণ ব্যাপ্তির (space) এবং সময়ের (duration) অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু তাহার নাস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না। অনেকানেক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

লক্ বলেন যে ব্যাপ্তির কিয়দংশ স্থানান্তরিত করা কল্পনার অসাধ্য। কোন ব্যক্তিই চিন্তাদ্বারা ব্যাপ্তি এবং সময় সীমাবদ্ধ করিতে অথবা তাহার শেষভাগ অনুভব করিতে পারেনা (১)। প্রসিদ্ধ

(১) "I demand of any one to remove any part of pure

বটলার বলেন যে অসীম সময় ও অসীম ব্যাপ্তি আমাদের অবশ্য অনুভূত, কিন্তু ইহার নাস্তিত্ব কোন ক্রমেই অনুভব করিতে পারি না (২)। আইজাক্ ওয়াটস্ বলেন যে ব্যাপ্তির সৃষ্টি অনুভূত হয় না, কারণ তাহার নাস্তিত্ব অনুভূত নহে এবং ধ্বংসও আমাদের অনুভবের সীমাতিরিক্ত (৩)। রিড্ বলেন যে অন্যান্য পদার্থের ধ্বংস-অনুভব অনায়াসে করা যায়, কিন্তু যাহা অধিকার করিয়া ঐ পদার্থ বিদ্যমান ছিল তাহার ধ্বংস কল্পনা-সহকারেও মনে ধারণা করিতে পারা যায় না (৪)। ডিউগ্যালড্ ষ্টুয়ার্ট বলেন যে

---

space from another, with which it is contained even so much as in thoughts——I would fain meet with that thinking man, that can, in his thoughts, set any bounds to space more than he can to duration ; or, by thinking hope to arrive at the end of either. (Locke's Essay, B. ii. ch. xiii. paras 13, 21)

(২) We find within ourselves the idea of infinity, i. e. immensity and eternity, impossible even in imagination, to be removed out of being. We seem to discern intuitively, that there must and can not but be somewhat, external to ourselves, answering this idea or the achetype of it. " Butler's analogy, Part I. ch. 6.

(৩) " We can not conceive space possible to be created since we can not conceive it as non-existent and creatable, which way be conceived concerning every created being. Nor can we conceive it properly as annihilated or annihilable." Dr J. Watt's Philosophical Essays, essay I. sec 4.

(৪) " We see no absurdity in supposing a body to be annihilated ; but the space that contains it, remains ; and to

সকল মনুষ্যেরই দৃঢ় ধারণা যে ব্যাপ্তির অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ও অনন্ত এবং সমস্ত পদার্থের বিলোপ হইলেও তাহার ধ্বংস হইবে না (৫)।

এমতে পণ্ডিতবর হিউম যে প্রস্তাব যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন এবং যে প্রস্তাব হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে পূর্ব্ববৎ তর্কের অনুপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসার ও অমূলক। এতদ্ভিন্ন আপত্তি সমূহ পূর্ব্ববৎ তর্কের অন্য প্রকার অর্থ ধরিয়া হইয়াছে মাত্র। শেষবৎ তর্কাবলম্বীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কারণ ধরিয়া কার্য্য প্রতিপন্ন করা পূর্ব্ববৎ তর্কের প্রকৃত কার্য্য; এমত স্থলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পূর্ব্ববৎ তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। পূর্ব্ববৎ তর্কের সাধারণ অর্থ ঐ রূপ বটে কিন্তু পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে পূর্ব্ববৎ তর্ক ব্যবহার্য্য তাহার অর্থ ভিন্ন। বিশুদ্ধ গণিতবিদ্যায় যেরূপ তর্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই তর্ক সম্যক প্রকারে উপযোগী, এই মাত্র বক্তব্য। ইহাতে অনেকে আপত্তি করেন যে উক্ত রূপ

---

suppose that annihilated, seems to be absurd." Dr. Reid's Essays, essay ii. chap.

(5) " It is certain that when the notions of magnitude and figure have once been acquired, the mind is immediately led to consider them as attributes of space no less than of body : and (abstracting them entirely from other sensible qualities perceived in conjunction with them) becomes impressed with an irresistable conviction that their existence is necessary and eternal, and that it would remain unchanged if all the bodies in the universe were annihilated." Dugald Stewart's Elements, Vol ii. chap ii.

তর্ক যদি উপযোগী হইত তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত দূর সংশয় এবং অবিশ্বাস অদ্যাবধি মানবের মন অধিকার করিয়া থাকিত না। এরূপ আপত্তি নিতান্ত অসার। নিউটনের পূর্ব্বে অঙ্ক বিদ্যার বিবিধ গূঢ়তত্ত্ব আবিস্কার হয় নাই। সেই সময়ে ঐ সব তত্ত্ব-সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল কিন্তু তন্নিবন্ধন পূর্ব্ববৎ তর্ক যে গণিতবিদ্যায় অব্যবহার্য্য এরূপ আপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

উন্মত্ত যুবক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেলা দ্বিপ্রহর, দিননাথ আকাশের ঊর্দ্ধতমস্থলে আসীন হইয়া শত শত কর-বিস্তার পূর্ব্বক স্বাশ্রিত জগৎ দগ্ধীভূত করিতেছেন। মনুষ্যগণ প্রচণ্ড রৌদ্রের ভয়ে গৃহের বাহির হইতেছে না, ইতর প্রাণীরা কেহ বৃক্ষতলে, কেহ শাখায়, কেহ ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যকৃত পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার অস্তমন বেলার অপেক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ একান্ত উৎপীড়িত হইলে স্বতঃই উপকারী ব্যক্তির উপকার বিস্মৃত হইতে হয়। তখন তাহার অনিষ্টচিন্তা মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিরন্তর আধিপত্য করিতে থাকে। সূর্য্য জগতের একমাত্র প্রদীপ; সূর্য্যালোকে তারা ফুটে, চাঁদ হাসে, আপনি হাসে, জগৎ হাসায়, সূর্য্য আমাদের কত উপকারী। আহা প্রাতঃ সূর্য্যের কি কোমলতা! কি মনোহর কান্তি! যখন হাসিতে হাসিতে নভোরাজ্যে ভাসিয়া উঠেন; লাল চক্ষু ঘুরাইয়া দুরন্ত অন্ধকারকে তাড়াইয়া দেন; ছোট ছোট মেঘগুলি চারিধারে ঘেরিয়া দাঁড়ায়;

প্রভাত-সমীর আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে ঘরে ঘরে সূর্য্যের আগমন সংবাদ দিয়া বেড়ায়; বৃক্ষের পাতাগুলি জড়াজড়ি করিয়া খেলা করে; পক্ষিগণ মধুস্বরে গান করিতে করিতে উড্ডান হয়; গবাদি ইতর জন্তুগণ আহ্লাদে নাচিয়া বেড়ায়; মনুষ্যগণ নববলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; তখন এই দিবাপতির মহিমা কে না ঘোষণা করে? কোন মূঢ় সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে? কিন্তু এখন ইহার সে দয়ার্দ্র ভাব নাই, সে কোমলতা নাই, সে মধুরতা নাই। আপনার অভ্যুদয়ে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। দেবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসুরভাব ধারণ করিয়াছেন। উত্তপ্তা পৃথিবীর উষ্ণ নিশ্বাসে ছায়াশ্রিত প্রাণিগণেরও গাত্রদগ্ধ হইতেছে। জলাশয় সকল উষ্ণবাষ্প পরিত্যাগ করিতে করিতে দিন দিন ক্ষীণ-জীবন হইতেছে। কে বলে সূর্য্য নলিনী-নায়ক? সূর্য্য নলিনীর পরম শত্রু। কোন্ মূঢ় স্বকরে নিরপরাধা প্রণয়িনীর প্রাণ সংহার করে? ঐ দেখ প্রচণ্ড দিবাকর জলাশয়ের জীবনের সহ নলিনীর জীবন শোষণ করিতেছেন। আহা সরল-হৃদয়া পদ্মিনী দিবসের এই প্রকার বিপদ স্মরণ করিয়া নিশাকালে ম্লান-মুখী হইয়া শিশির পতনচ্ছলে কতই না অশ্রুবর্ষণ করেন। মূঢ় মানব বুঝেনা পিঞ্জরবদ্ধা সারিকার সকরুণ রোদনধ্বনিতে গীতভ্রমে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। চিরদুঃখিনী সারিকা রোদন ভিন্ন কখনই গান করে না। সূর্য্যোদয়ে নলিনী কাঁদে বৈ হাসে না। অলক্তকময় ভানু-কর জলাশয়ের জলে প্রতিফলিত হইল। নলিনীর জীবনে যেন অনল-স্পর্শ হইল। দুঃখিনী অশ্রু সংবরণ করিলেন, শত্রু গৃহাগত—কাঁদিবার সময় নাই, অশ্রু সংবরণ করিলেন। জীবন-বৈরী সূর্য্য জলাশয়ের জীবন নষ্ট করিবে। নিজের জীবন জীবনাধীন; কোমলদলগুলি বিস্তার-পূর্ব্বক সূর্য্য-কর অবরোধ করিলেন। লোকে বলে নলিনী হাসিল। দুঃখিনী কাঁদে বৈ হাসে না। দিনমণি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ

করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আতপতপ্ত বায়ুরাশি দেশ দেশান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়া শরীর শীতল করিতে লাগিল। ভয়ে জলাশয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কম্পান্বিতা নলিনী তরঙ্গাঘাতে ক্ষণে ক্ষণে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিলেন। "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি", বিপদ্ ছিদ্র পাইলে বহুল হয়। এদিকে দুরন্ত মধুকরগণ তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করিল। অবসর পাইয়া নলিনীর হৃদয়-ভাণ্ডারস্থ মধুভাণ্ড লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

হায় উন্নত পদ কি সর্ব্বনাশের মূল! যাহাতে দেবগণেরও চিত্তবৈলক্ষণ্য ঘটে। কিন্তু উদয়াস্ত বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধি, সূর্য্যের এ প্রতাপ চিরস্থায়ী নয়। অদূরে নিশা নিশাচরী করালবদন বিস্তার পূর্ব্বক প্রতীচ্য পথ অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে। বিধি প্রতিকূল, দিবাকর সহস্র-করে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। রাক্ষসীর করাল কবলে কবলিত হইবেন। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে; পৃথিবী শীতল হইবে; নৈশসমীরণ-স্পর্শে নলিনী শীতল হইবে।

নিদাঘ-পীড়িত পাঠক! দিবসে অমানিশা দেখিতে চাও, তবে চল সেই ভূগর্ভ-নিহিত উন্মত্ত যুবার নিকট গমন করি। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সহসা অভাবনীয় অবস্থায় পতিত হওয়াতে কি প্রকার তাঁহার চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু নবাগত বিপদের ন্যায় স্থায়িবিপদ তত ভয়ঙ্করী নহে। করালবদনা বিপদ যখন দূর হইতে কোন ব্যক্তির আক্রমণাভিলাসে হস্ত বিস্তার করে, তখন সে তাহার সেই সর্ব্বলোকসংহারিণী ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া যেন ভয়াভিভূত জীবনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই চারিদিকে দৌড়িতে থাকে। আবার বিপদ সহসা আক্রমণ করিলে, ক্ষণকালের জন্য প্রাণবায়ু যেন দেহ হইতে উড়িয়া যায়, মৃতবৎ

শরীর পৃথিবীতে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। কিন্তু এদশা অধিকক্ষণ থাকে না। অবিলম্বে জীবন-সহচরী আশা জীবনের সহ দেহ মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করে। মায়াবিনী নানাবিধ প্ররোচনা বাক্যে মানব-মন মোহিত করিয়া ফেলে। তাহার সঞ্জীবনী কম্পনা অব্যর্থ। নরদেহ নববলে বলীয়ান্, ধূলি-ধূসরিত শরীর সহসা ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া সিংহের বিক্রমে বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে। আশা দুর্ব্বলের বল, জীবন-প্রদীপের তৈল, নিরুপায়ের কুশলা মন্ত্রিণী। যুবা আশার আশ্বাসে বলিষ্ঠ হইয়া সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ভে ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক ভিত্তি প্রদেশে হস্তমার্জ্জন দ্বারা নির্গমনদ্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী দ্বার পাইলেন; কিন্তু সেটী প্রস্তরময় কবাটের দ্বারা এরূপে অবরুদ্ধ যে, অনেক কৌশল ও বল প্রকাশ করিয়াও তাহা উদ্ঘাটনে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল সেই খানেই দাড়াইয়া রহিলেন। একে একে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া আশার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি অগত্যা দ্বারদেশ হইতে অপসৃত হইয়া কিছু দূরে একটী সোপানোপরি উপবেশন করিয়া গভীর চিন্তা-সমুদ্রে অবগাহন করিলেন। "বৃদ্ধ কি এই ভূগর্ভে অবরুদ্ধ রাখিয়া অনাহারে আমার প্রাণ সংহার করিবে? আমিত তাহার কোন দোষ করি নাই। শুনিয়াছি বিনা দোষে সর্পও দংশন করে না। বৃদ্ধ কি সর্প হইতেও ক্রূর? ক্রূর সর্পের হৃদয়ে যেটুকু দয়া আছে, যেটুকু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, ইহার কি তাহাও নাই? এই নৃশংসের হৃদয় কি রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত নহে? না, না, এ কুচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে নাই, পবিত্র আত্মায় দোষারোপ করিতে নাই। বৃদ্ধের গভীর চিন্তাব্যঞ্জক প্রফুল্ল-মুখশ্রী সন্দর্শন করিলে, তাঁহার হৃদয়ে কোন দুরভিসন্ধি আছে, এ কথা কেহ অনুমান করিতেও সাহসী হয় না। বৃদ্ধ যেন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি যাবতীয়

সদ্‌গুণরাসির প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার সেই উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয় যেন অনন্ত জগতের অনন্ত ঘটনাবলি যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। সেই প্রশস্তচেতাঃ তপস্বীর নির্ম্মল নামে কলঙ্ক-স্পর্শার্থ কোন্ মূঢ় রসনা চালনা করিতে পারে? তবে সেই নির্ম্মল-চেতা মহাপুরুষ হইতে আমার এই অচিন্তনীয় অবস্থান্তর ঘটিল কেন? হায়! আমার দুরদৃষ্টক্রমে সুশীতলবর্ষী মেঘমালাও বিদ্যুৎ বর্ষণ করিল! বুঝিলাম পাত্র ভেদে বিষও অমৃত এবং অমৃতও বিষরূপে পরিণত হয়। অথবা কোন অরণ্যচারী নিশাচর আমার বিনাশার্থ এই কপটতাময় মায়াজাল বিস্তার করিল। আমি অজ্ঞতাবশতঃ অন্যথা সম্ভাবনা করিতেছি। নতুবা এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে রাজ-প্রাসাদ, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতির সম্ভাবনা কোথায়? অহো! আমার কি অবিবেচ্যকারিতা! অকস্মাৎ অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস করিলাম। আপনা হইতে ভুজঙ্গ-বিবরে ভুজার্পণ করিলাম। না না, বৃদ্ধকে একেবারে অপরিচিতও বলিতে পারি না। তাঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে। কিন্তু স্মারকতার অভাবে সম্পূর্ণ স্মরণ হইতেছে না। যাহা হউক, তিনি আমার অপরিচিত হইলেও আমি যে তাঁহার অপরিচিত নহি, তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। বুঝিলাম, এখন নিশ্চয় বুঝিলাম, বৃদ্ধ আমার জীবনাপহারী যম-দূত। সেই নির্ম্মম কৃতান্ত চন্দ্রশেখরের প্রেরিত দূত। নহিলে যে বনচারী সে আমার বিষয় কি করিয়া জানিবে? জীবনাপহারী ভিন্ন কেবল মাত্র জীবনের সংবাদ আর কে রাখিবে? ধিক্ চন্দ্র-শেখর, তোকে শত ধিক্! অদ্যাপি তোর মনোভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই? আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াও কি তোর উদরপূর্ত্তি হইল না? স্বর্গীয় পিতৃদেব হৃদয়ের শোণিত দিয়া সর্পশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ক্রূর সর্প পোষ মানে না, শেষে প্রত্যুপকার স্বরূপ

তাঁহারই জীবন সংহার করিল। বিশ্বাসঘাতক তাহাতেও সন্তুষ্ট নহে, উপকর্ত্তার জীবন সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াও সন্তুষ্ট নহে। অবশেষে তাঁহার কেবল মাত্র পিণ্ডাধিকারী, চীর মাত্র ভূষণ, বনবাসী বংশধরেরও জীবন বিনাশার্থ আপনার বহু-পাপ-পঙ্ক-কলুষিত হস্ত বিস্তার করিল। আর উদ্ধারের উপায় নাই, এই গাঢ় অন্ধকারে আমার জীবন-প্রদীপ চিরকালের জন্য মিসিয়া যাইবে, আর আমি আলোকময়ী পৃথিবীর মুখশ্রী দর্শন করিতে পারিব না। কে জানে কতদিনে আমার এই বহুযন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষুৎপীড়িত শরীর মৃত্যু গ্রাস করিবেন। আমি অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মরিব। ইহাতে সেই দুরাত্মার লাভ কি? শূন্য গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া তস্কারের লাভ কি? আমার যথাসর্ব্বস্বত তাহার হস্তগত হইয়াছে। বুঝিলাম সর্প রক্তপানের জন্য দংশন করে না, তাহার লাভ বৈরনির্য্যাতন। এ নরাধমের কি বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশ্য? তাহার বৈরী কে? যদি সরলহৃদয়, ধর্ম্মপরায়ণ শৈশবাবধি-প্রতিপালনকর্ত্তা পিতৃদেব তাহার শত্রু হইলেন, তবে তাহার মিত্রই বা কে? হায়! স্বর্গারোহণকালীন, পিতৃদেবের সেই করুণাক্ষরপূর্ণ বাক্য পরম্পরা যেন সংসারে ঔদাসীন্য জন্মাইবার জন্যই আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। স্বজনগণের হৃদয়াকর্ষণী মমতা, অতুল ঐশ্বর্য্য, সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি; কিন্তু তাঁহার সেই মর্ম্মভেদী কাতর বাক্যাবলি প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। “বৎস সুরেন্দ্রসিংহ! আমি পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি, বিশ্বাসঘাতক চন্দ্রশেখর রাজ্যলোভে বিষপ্রয়োগ দ্বারা আমার জীবন সংহার করিল। বাল্য কালাবধি যে তাহার উপকার করিলাম, অদ্য সে তাহা পরিশোধ করিল। হায়! বিষয় কি অনর্থের মূল! লোকে বিষয়লালসায় মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত

হয় না। আর আমার নিজের জীবনের জন্য শোক করিবার সময় নাই, এখন তোমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিব, এই চিন্তাই বলবতী হইয়াছে। একে আমি অশীতিপর বৃদ্ধ, জরার দুর্দ্দম্য শাসনে শরীরেন্দ্রিয় সমস্তই অচল, তাহাতে আর বিষের যন্ত্রণা কতক্ষণ সহ্য করিব। অচিরাৎ প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া যাইবে। তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, একমাত্র বংশধর; কে তোমার জীবনের আশ্রয় দাতা হইবে? প্রাণের ভাই বিজয়সিংহ বহুদিন হইল, সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছে। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোন সংবাদ পাই নাই। হৃদয়প্রতিম! তুমি যদি বিষয়ের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতে পার, বৃদ্ধ পিতার ধন্য বাদের পাত্র হইবে। বিষময় বিষয় কামনায় এ ভুজঙ্গ-বিবরে বাস করিলে বাঁচিবে না। যে কালভুজঙ্গ আমার পরমায়ু গ্রাস করিল, সে তোমার জীবনের প্রতি কখন উপেক্ষা করিবে না। প্রাণাধিক! আর তোমারে কারে দিয়া যাইব, সেই পরম দয়ালু পরমেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। হে প্রভো! দেখ যেন আমার বংশ-প্ররোহটী শত্রুর অত্যাচারে উন্মূলিত না হয়। আমার অন্তিম প্রার্থনা আর নাই।” হায়! পিতৃদেব এই হত-ভাগ্যের জন্য এই প্রকার সেই অনাথের নাথ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আপনার পরিণাম একবারও ভাবি-লেন না। আমিই তাঁহার ইহকাল ও পরকালের পরিপন্থী হইলাম। ক্রমে সর্ব্বগ্রাসী কাল তাঁহার অবশিষ্ট পরমায়ু গ্রাস করিল। তিনি সজলনেত্রে আমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন! আমি শূন্যহৃদয়ে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলাম। পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ সূর্য্যালোক নিভিয়া গেল। ক্ষণ কালের জন্য সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলাম। কি পাপে

জানি না, এই হতভাগ্য পুনর্ব্বার রোদনময়ী পৃথিবীর মুখাবলোকন করিল। হায়! কেন মরিলাম না, কেন বৃদ্ধ পিতার পথপ্রদর্শক হইলাম না!

যুবা এই প্রকারে বালকের ন্যায় সেই অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জনস্থানে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখময়ী স্মৃতি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অপহরণ করিল। তিনি অতীত ঘটনাবলি বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ অন্ধকারে অলক্ষিত থাকিয়া একজন বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁহাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। যুবা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আগন্তুকও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কি বলিল। উভয়ের কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইয়া দ্বিগুণতর প্রতিধ্বনি হইল। যুবা কিছুই শুনিতে পাইলেন না। মৃতবৎ তাঁহার শরীর ভূমে গড়াইয়া পড়িল। আগন্তুকের সঙ্গে অপর একজন কে আসিয়াছিল, উভয়ে সাবধানে যুবার দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

পদ্মিনী।

এই পদ্যটী মহিলা, সবিতা সুদর্শন, বর্ষবর্ত্তনাদি কাব্য প্রণেতা ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় প্রণীত "হামির" নাটকান্তর্গত। এই কবিতাটী দৃশ্যলীলা স্বরূপ ন্যাসনাল থিয়েটরে অভিনীত হইবে। অভিনয়ের জন্য অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের পাঠার্থ আমরা ইহা সমগ্র প্রকাশ করিলাম। গত বারে "সন্ধ্যার প্রদীপ" শীর্ষক যে কবিতাটী আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাও উক্ত কবি প্রণীত।

১

বিভাবরী অবসান, কোকিল করিছে গান,
দৃশ্যমান ভানু আরাবলী-গিরি'পরে ;
সাজিয়াছে রামাগণ, পরি নানা আভরণ,
না জানি উৎসব কিবা চিতোর নগরে।
তরুণী, মধ্যমা, বালা, বিচিত্র তারকা মালা,
পদ্মিনী রূপসী পৌর্ণমাসী-শশী তায় ;
কিম্বা নারী-শ্রেণী যেন, মণিময় হার হেন,
মধ্য-মণি পদ্মিনী এমনি শোভা পায়।
অসিত, লোহিত, পীত বাসে কায় আবরিত,
দৃশ্য রক্ত কর, পদ, বিমুগ্ধ বদন ;
হেন রমণীর মেলা, বিহরে প্রভাত বেলা,
প্রাসাদের পুরোভাগে প্রান্তরে কেমন ?—
মাধুরীর প্রাণময়ী প্রতিমা যেমন !
হেন উৎসবের কিবা না জানি কারণ।

২

নগর পাঠানগণ ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
ঘিরেছিল স্বর্ণলঙ্কা বানরে যেমন ;
গণ্য বীর ছিল যারা, সমরে পড়েছে তারা,
সামন্ত, অমাত্য, সেনা, রাজার স্বগণ।
তুহিনে নলিন যেন, নগর শ্রীহীন হেন,
রাজা রুদ্ধ পিঞ্জরের সিংহের সমান ;
ভূপ ভীম মহাশয়, কিছুতে কাতর নয়,
শুধু চিন্তা বাঁচাইতে বংশের সম্মান।
যবনের দাস হয়ে, কি সুখ ধরায় রয়ে,
তাহ'তে উচিত করা স্বর্গে আরোহণ।
রাজা প্রজা এক ভাবে, নগরে সবাই ভাবে,
রমণীগণের কেন সুসজ্জা এমন ?

কেন পরিয়াছে হেন বসন ভূষণ?
হেন উৎসবের ভাব কিসের কারণ?

৩

রমণী-মণ্ডলী যথা, প্রাসাদ হইতে তথা,
উতরিল ভূপ ভীম লইয়া স্বগণ—
সকলের এক বেশ, রক্ত আঁখি, মুক্ত কেশ,
বর্ত্তুল তিলক ভালে ভানু-বিগঞ্জন ;
জঘন অবধি কটি, বিজড়িত পীত ধটী,
দুই করে নভনিভ কৃপাণ ভীষণ,
তায় প্রসবিত ছবি, কত শত শিশু রবি,
পলকে ঝলকে পেয়ে ভানু-আলিঙ্গন ;
বর্ম্মহীন চারু কায়, অত্রচ দাড়িম্ব প্রায়,
কান্তিমা-নিকেত যেন কাঞ্চন গঠন ;
উর, উরু, বাহুমূল, বিশাল, বর্ত্তুল, স্থূল,
দেখিয়া এদের ভাব বুঝেছি এখন—
(নারীগণ যেহেতু পরেছে আভরণ)
জহর ব্রতের তরে হেন আয়োজন।

৪

যে জন বিদেশী হও, শুনিয়া বুঝিয়া লও,
রাজপুত-কুল-ব্রত জহর যেমন ;—
দৈব-কোপে যে সময় বিপক্ষ প্রবল হয়,
বিগ্রহে জয়ের আশা না থাকে যখন,
তায় শত্রু নীচ হয়, সন্ধি করিবার নয়,
সেই কালে হয় এই ব্রত আচরণ ;
অগ্নিকুণ্ডে নারীগণ করে কায় সমর্পণ,
এড়াইতে তীব্রতর পর-পরশন ;
মরণ সঙ্কল্প করি, চর্ম্ম বর্ম্ম পরিহরি,
পুরুষে প্রবেশে শত্রু-সেনায় তখন,

শয্যা রচি শত্রু-শবে, ক্রমে শায়ী হয় সবে,
জয়ী হয়ে পরাজিত বাসে অরিগণ,
পায় শূন্য পুরী, শুধু শব নিকেতন—
আজ সেই ব্রতের চিতোরে প্রয়োজন।

৫

ভীমরায় আগমনে, কুণ্ঠিতা কামিনীগণে,
একধারে অন্তরালে মিলিয়া দাঁড়ায়;
দাঁড়াইল বীরগণ, নিশ্চল নীরবানন,
অপাঙ্গে রমণীগণ প্রিয়জনে চায়।
নগরে জীবিত যারা, এক ঠাঁই এই তারা,
রণে সহগমনে বিগত যত আর;
গত পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, লুপ্ত সব বংশ-সূত্র,
কুলব্রত-গতি কুল মান রাখিবার।
পদ্মিনী রূপের ভরা, ঈষৎ হসিতাধরা,
বার বার অপাঙ্গে ভূপতি পানে চায়;
চখে চখে সম্ভাষণ, মনে মনে আলাপন,
দেয়া, নেয়া, জন্ম শোধ প্রেমের বিদায়।
সম্বোধিয়া সমাগতা সকল রামায়,
কহিল পদ্মিনী রাণী—"লও গো বিদায়।"

৬

নিবিড় নিঃশব্দ মাঝে, যেন বীণা-তান বাজে,
কহিল পদ্মিনী রাণী—"লও গো বিদায়;
কুলব্রত উদ্‌যাপনে, সবে ত্বরা কর মনে,
আর কেন দেখনা সময় বয়ে যায়।
অনল জ্বলিলে পরে, যে জন বিলম্ব করে,
আহুতি প্রদানে তার পাপ হয় তার;
অগ্নি-শিখা ব্রত-ঘরে চঞ্চল, বিলম্ব ডরে,
চঞ্চল, এ সকল বীরের তরবার;

অতএব ক্ষোভ ভুলে, প্রফুল্ল নয়ন তুলে,
প্রিয় সম্ভাষণ কর, চাও প্রিয়জনে;
তৃষ্ণা ভেঙ্গে দৃষ্টিকর, প্রিয়মুখ ধ্যান ধর,
যে ধ্যানে না অনলে বাসিবে পরশনে।"
শুনি প্রিয়জনে চেয়ে, প্রেমের নয়নে,
পিককণ্ঠে বিদায় চাহিল রামাগণে।

৭

"চলিলাম প্রিয়গণ, জন্মশোধ দরশন,
প্রসন্ন বদনে কর বিদায় প্রদান,
করিয়াছি নানামত, অপরাধ শত শত,
দেহ মন অবলার দোষের নিধান;
কখন আলস্য বসে, কভু প্রমোদের রসে,
কভু মাত্র বুঝিবার ত্রুটির কারণ,
আদেশ করিয়া হেলা, করিয়াছি মিছা খেলা,
সখী সঙ্গে অঙ্গরাগ বেশ বিরচন;
বলিয়াছ হিত বাণী, মনে বিপরীত মানি,
করিয়াছি অকারণ কোপ কতবার,
অশনে বসনে পানে, রেখেছিলে ভোগে মানে,
বলিয়াছি তবু কটু কথা তীব্রধার;
ক্ষম দোষ সে সব অবোধ অবলার;
পতি বিনা নারীর কি গতি আছে আর।"

৮

শুনি নারীবৃন্দ কথা, বীরবর্গ পায় ব্যথা,
অতি অবেদন সবে অতি বেদনায়;
কেহ স্থির নতানন, কেহ যেন অন্য মন,
অন্য দিকে দৃষ্টি অন্য বিষয় চিন্তায়।
কেহ অসি-ধার দেখিছেন বার বার,
কাক বা প্রেয়সী পানে ক্ষণিক ঈক্ষণ;

কেহ রবি পানে চায়, বিলম্বের ব্যগ্রতায়,
কারু বা পেষণ শুধু দশনে দশন।
কেহ বা লজ্জিত হেন, অল্প আর্দ্র আঁখি যেন,
কারু শুষ্ক নেত্রে মাত্র অস্থির ঘুর্ণন ;
হৃদয়ে থাকুক ব্যথা, চখে জল, মুখে কথা,
কিন্তু তবু কারুই না হলো নিঃসরণ:
অটল অচল হেন, স্থির বীরগণ :—
ভাবহীন প্রাণ যেন শূন্য নিকেতন।

৯

কহিলা পদ্মিনী রাণী, পুন বীণা-ধ্বনি-বাণী,—
" চল, বামাবৃন্দ, তবে বিলম্ব কি আর ?
ভেবে অগ্নি তাপময়, যদি কেহ বাস ভয়,
বলে দেই আমি শুন প্রতিকার তার,—
পাঠানের পরশন, বারেক করহ মন,
অনল শীতল অতি তার তুলনায় ;
ক্ষোভ যদি মৃত্যু তরে, বল দেখি কে না মরে,
বল দেখি চিরজীবী কে থাকে ধরায় ?
গর্ভে, জন্ম মাত্রে, কেহ যৌবনে বা ছাড়ে দেহ,
কেহ জীর্ণ হয়ে মরে প্রাচীন যখন ;
যেই গতি সকলের, সেই গতি আমাদের,
অধিক বিপদ বোধ তবে কি কারণ ?
বল, এবে ভয় যদি পাও কোনজন ? "
" কি ভয় ! না বাসি ভয় "—কয় রামাগণ।

১০

কহিলা পদ্মিনী সতী,— " আমাদের কুলপতি
দিনমণি দীপ্ত দেখ ভুবন-পাবন,
হয়ে এঁর কুলনারী, কলঙ্কী কি হতে পারি,
হের দেখ মূলদেব উজ্জ্বল কেমন !

অস্তু না হইতে ইনি, শুন সবে সীমন্তিনী,
দেখা হবে পুন এই প্রিয়গণ সনে ;
শোক, ক্ষোভ, তাপ, ভয়, যথা না উদয় হয়,
সদানন্দ ধাম সেই স্বর্গ নিকেতনে।
পুর্ব্বে তথা গেছে যারা, হর্ষে হেরিতেছে তারা,
আশা ক'রে তোমাদের আসন্ন মিলন,
পাইবে আত্মীয়গণে, পাবে পতি প্রাণধনে,
এ সম্পদে বিপদের ভ্রম কি কারণ?
ইথে যেবা বাসে ভয়, সে জন কেমন!"
"কি ভয়! না বাসি ভয়"—কয় রামাগণ।

১১

কহিলা পদ্মিনী পুন,— "মন দিয়া সবে শুন,
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত করে লালসায় যার,
তপস্বী যাহার তরে, কঠোর তপস্যা করে,
খুলে, সে স্বর্গের স্বর্ণ কপাটের দ্বার,
দাঁড়ায়ে অপ্সরীগণে, আছে অতি ব্যগ্র মনে,
নিয়ে যেতে তোমাদের ক'রে আবাহন।
যে সকল দেবতায়, পূজা কর প্রতিমায়,
জীবন্ত তাঁদের সনে হবে দরশন।
প্রাণপ্রিয় পতি সনে, কখন নন্দন বনে,
সুধাময় মন্দাকিনী-পুলিনে কখন,
বিহার করিবে রঙ্গে, পারিজাত প'রে অঙ্গে,
এ সুখ লভিতে লুব্ধ নয় কোন জন?
ইথে ভয় হয় যায়, সেজন কেমন!"
"কি ভয়! না বাসি ভয়"—কয় রামাগণ।

১২

হেন মতে গীত গায়, রামাগণ চলে যায়,
মাধুরীর নদী যেন ধীরে প্রবাহিত!

ভাবে ডুবাইয়া প্রাণ, কলকণ্ঠে করে গান,
তালে তালে চরণ-মঞ্জির ঝঙ্কারিত ;
হেরে মুগ্ধ হয় লোক, শোভায় ঢেকেছে শোক,
মরিতে যে যায় এরা হয় না স্মরণ ;
ক্রমে গেল দূরতর, ক্রমে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
ক্রমে শুধু স্বর শুনি, না বুঝি বচন ;
ব্রতাগারে উতরিল, তার পরে কি হইল,
কে বর্ণিবে, জানে কেবা তাহার সন্ধান ?
যেজন দেখিতে চাও, পাতালের ঘরে যাও,
দেখ দ্বারে আছে শুদ্ধ পাষাণ চাপান ;
ভিতরে যাইতে পারে, কার হেন প্রাণ !
অগম্য সে অন্তকের অন্তঃপুর স্থান।

১৩

রূপ গুণ পদ্মিনীর, কেবা জানে পৃথিবীর,
হেন দ্রব্য স্থায়ী কভু হয় না ধরায় ;—
নন্দন বনের শোভা, পারিজাত মনোলোভা,
কতক্ষণ থাকে বল আনিলে হেথায় ?
শুনি জননীর মুখে, নন্দিনী শিখিবে সুখে,
শিখাইবে সে পুনঃ আপন দুহিতায় ;
এইরূপে পরম্পরা, যাবত রহিবে ধরা,
পদ্মিনীর গাঁথা রবে কীর্ত্তি ঘোষণায়।
সৌন্দর্য্য সতীত্ব সনে, সরলতা সম্মিলনে,
অতি চারু বিরল রচনা বিধাতার ;
উৎসব উল্লাস যেন, রূপের উচ্ছ্বাস হেন,
দরশন বিনা, ভাব কি বুঝিবে তার ?
বাক্যে কে বুঝিতে পারে বস্তুর প্রকার ?
আস্বাদিয়া বুঝা যায় স্বাদ শর্কবার।

১৪

সঙ্গিনীগণের সনে, পদ্মিনী প্রফুল্ল মনে,
ধীরে ধীরে চলিল চরম নিকেতন ;
নির্নিমেষ আঁখি তুলি, ভূত, ভবিষ্যত ভুলি,
চাহিয়া রহিল নর-মূর্ত্তি বীরগণ।
নরাকার ধারী হয়ে, কেমনে রহিল স'য়ে,
ঝরিলনা চখে জল, বদনে বচন ;—
এরা আর নর নয়, বিসর্জ্জিয়া চিন্তা ভয়,
বিপদে দেবত্বপদ পেয়েছে এখন।
যতক্ষণ থাকে আশ, ততক্ষণ থাকে ত্রাস,
আশাপাশমুক্ত আত্মা অতি বলবান ;
সলিলের ফেন যেন, বিশ্বধাম হেরে হেন,
হেরে মৃত্যু সুখসুপ্তিশয্যার সমান,
ছোট বড়, হেয় উপাদেয়, লাজ মান,
মিটে যায় এসব কল্পিত ভেদ জ্ঞান।

১৫

রামাগণ যায় ধীরে, ফিরে ফিরে চায় ফিরে,
ক্রমে ক্ষীণ—সম্মিলিত মঞ্জির ঝঙ্কার ;
ক্রমে আঁখি অগোচর, ক্রমে লুপ্ত কণ্ঠস্বর,
বীরগণ স্থিরতায় প্রতিমা প্রকার।
ক্ষণেক সম্বিত পেয়ে, পারিষদ গণে চেয়ে,
ভূপ ভীম কহিল—" অপেক্ষা কিবা আর ? "
শ্রুত মাত্রে এই কথা, বায়ু ভরে বারি যথা,
বীরগণ নড়িতে ঝলকে তরবার ;
ভূপ ভীম আগে আগে, বীরবর্গ পিছু ভাগে,
গজগতি ভরে যেন মেদিনী চাপান,
জঘন অবধি কটি, বিজড়িত পীত ধটী,
অবনত করি চলে করের কৃপাণ।

উত্তরিল নগরের দ্বার সন্নিধান ;—
বিশাল প্রশস্ত উচ্চ তোরণ মহান।

১৬

"কপাট পাটন কর"— কহে ভীম নৃপবর,
তিন বীরে সরাইল অর্গল মহান ;
কট কট রবে ডাকে, ঘুরাইতে পাকে পাকে,
দ্বার-রোধ লৌহ যন্ত্র জন্তুর সমান।
ঘুচিল শৃঙ্খলভার, ক্রমশঃ খুলিল দ্বার,
সুবিশাল দুইখণ্ড অখণ্ড পাষাণ।
শিবির রচিয়া কাছে, পাঠান কটক আছে,
সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত, সতর্ক, সাবধান।
দৃষ্টিমাত্রে বীরগণ, হবিপ্রাপ্ত হুতাশন,
রক্তমুখ হয়ে সবে পরস্পর চায় ;
হর হর হর রবে, কৃপাণ তুলিয়া সবে,
ক্ষিপ্ত প্রায় পাঠান-কটক পানে ধায়,—
মেষপাল অভিমুখে অতি ব্যগ্রতায়
বুভুক্ষায় লেলিহান শার্দ্দূলের প্রায়।

১৭

অস্ত্রধারী অনুক্ষণ, প্রস্তুত পাঠানগণ,
বারিবারে যত্ন করে বারিতে কি পারে ?—
সমুদ্র ভাঙ্গিয়া ধায়, কার সাধ্য রোধে তায়,
মরিতে সঙ্কল্প যার কেবা তারে হারে !
আর্ত্তনাদ—সিংহনাদ, ফাটায় গগন-ছাদ,
উঠে পড়ে সহস্র সহস্র তরবার,—
বরষে করকা যেন, কাটামুণ্ড পড়ে হেন,
স্থানে স্থানে বক্ষ উচ্চ শব স্তূপাকার।
পাঠান পালায় রড়ে, শিবিরে বাধিয়ে পড়ে,
মহামত্ত বীরগণ, দ্রুতবেগে ধায়,—

কারে পদে পিষে মারে, কারে তরবার ধারে,
পড়ে পটবাস সব যেন ঝটিকায় ;—
জুস্তক সামন্তগণ উতরি ধরায়
মাতিয়াছে হের যেন সংহার লীলায় !

১৮

মুহা বিষধর ব্যালে, ঘিরে পিপীলিকা জালে,
ক্রমে ক্রমে বল অবসান করে তার ;—
কেটে বন উভরায়, কুঠার টুটিয়া যায়,
বীরগণ ক্লান্ত ক্রমে তেমনি প্রকার ;
হৃদিবেগে, রণশ্রমে, একে একে পড়ে ক্রমে,
এক এক শত্রু-শব স্তূপের উপর—
ভ্রুকুটি কুটিলানন, উর্দ্ধ দৃষ্টি দুনয়ন,
রক্ত আর্দ্র কুন্তল বিস্তৃত কলেবর।
কেহ বেঁচে নাই প্রাণে, তবুনা পাঠানে মানে,
চারিদিকে শঙ্কায় পলায় অগণন—
ধায় বেগে বেধে পড়ে, পুন উঠে ধায় রড়ে,
ভয়ে না ফিরাতে পারে পশ্চাতে নয়ন;
দেহ ছাড়ি স্বর্গ-ধামে গিয়া বীরগণ
হাস্যভরে করে হেন রঙ্গ দরশন।

১৯

ক্রমে হ'ল জ্ঞানোদয়, ভাঙ্গে অমূলক ভয়,
ক্রমে সুস্থ হ'ল ভয়-বিহ্বল যবন ;
দেখে কেহ নাহি আর, মুক্ত নগরের দ্বার,
ভয় বাসে আসে পাছে আরো বীরগণ।
ক্রমে যুক্তি করি সবে, নগরে পশিল তবে,
তবু ভয় ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় কম্পিত ;
হেরে শূন্য সর্ব্ব ঠাঁই, প্রাণীর সম্পর্ক নাই,
শূন্য নিকেতন—দ্বার বিকট ব্যাদিত।

শূন্য শয্যাসন—যান, শূন্য উপবন স্থান,
শূন্য পুর লক্ষ্য যেন রচনা মায়ার।
যেদিকে পাঠান চায়, কারে না দেখিতে পায়,
স্তম্ভিত বিস্মিত সবে বিমুগ্ধ আকার;
অরি হয়ে সাধুবাদ দেয় বার বার—
"রাজপুত, ধন্য বটে মহিমা তোমার!"

২০

পাঠানের মুখে রটে,— "রাজপুত ধন্য বটে!"
"ধন্য বটে"—কয় শূন্য অট্টালিকাচয়।
"ধন্যবটে! ধন্য বটে!"— ঘরে ঘরে রব রটে,
"ধন্য রাজপুত!"—শূন্যে সুরগণ কয়।
ধন্য স্বাধীনতা-ভক্তি, ধন্য মান-অনুরক্তি,
ধন্য শক্তি সৌর্য্য বীর্য্য অটল এমন!
ধরায় জনমে যারা, ম'রে থাকে সবে তারা,
হেন প্রার্থনীয় মৃত্যু পায় কোন জন!
ব্রত ধরে গেল যারা, নারীকুলে ধন্য তারা,
পরিহরে কলেবর গৌরব রক্ষায়!
অনল অধিক তাপ বাসে পরস্পর্শ-পাপ
হেন নারী কোথা কেবা দেখাবে ক্রিয়ায়?
যাবত হবেন ভানু উদিত ধরায়,
ভানুকুল গাঁথা রবে কীর্ত্তি ঘোষণায়!

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

পঞ্চম অধ্যায়।

আবুজানলিখিত অনুশাসনপত্র ও মহম্মদের দুর্গতির চরম সীমা—মক্কার মঙ্গলময় উৎসব———হাবিব রাজের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন—দুর্ঘটনা—মহম্মদের সহিত আয়েসা, সাদা ও হাঁসার বিবাহ।

এ দিকে যখন খোরিসিয়গণ দেখিল, তাহাদের প্রতিফুৎকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহম্মদের উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে ; তাঁহার দলবল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট, ধর্ম্ম-মত অনেক স্থানে সমাদৃত ও তিনি স্বয়ং পরিপূজিত হইতেছেন ; তখন তাহারা হতাশ্বাস হইয়া একবারে নিরস্ত হইতে, অথবা মহম্মদের সহিত মিলিত হইবার, সঙ্কল্প করিল। কিন্তু আবুসোফিয়ন ও আবুজান ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও যত্নে সত্বরই এক সভা আহুত হইল। সমিতি স্থানে, সমবেত খোরিসিয়মণ্ডলি মধ্যে, দণ্ডায়মান হইয়া আবুজান এই কয়েকটী প্রস্তাব করিলেন :—

"মহম্মদের সহিত কেহ ভোজন, উপবেশন বা বাক্যালাপ করিবে না।" "তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত কাহারও আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না, তাঁহাদিগের সহিত কেহ কোন নুতন সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইবে না।" "তাঁহাদিগকে কেহ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না। সর্ব্ব প্রকার আদান প্রদান নিষিদ্ধ।" একখণ্ড পরিস্কৃত চর্ম্মোপরি অতীব

যত্নসহকারে আবুজান স্বহস্তে এই অনুশাসনপত্র লিখিয়া কাবা মন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। মহম্মদের ক্লেশের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি আবুতালেবের দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ, শিষ্যগণ আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছে, যে দুই একটী শিষ্য মক্কায় অবস্থান করিতেছে প্রাণভয়ে গোপনীয় স্থানে তাহারাও লুক্কায়িত। পাছে কেহ গুপ্তভাবে মহম্মদের প্রাণ সংহার করে এই শঙ্কায় আবুতালেব প্রতিদিনই তাঁহার শয়ন গৃহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন, তথাপি নিয়মিত আহার ও নিদ্রাভাবে তাঁহার দেহমন অবসন্ন ও যন্ত্রণার একশেষ হইল। রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকেই যখন মহম্মদ নৈরাশ্যের বিকট আস্য দর্শন ও খলখল হাস্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন, তখন সহসা পট পরিবর্ত্তিত হইল। আরবগণের পুণ্যাহ মাস সমাগত। এই পবিত্র কালে শত্রু মিত্রে ভেদাভেদ থাকে না। অভিন্নহৃদয় একপ্রাণ হইয়া কিছুদিনের জন্য মক্কার মঙ্গলময় উৎসবে উন্মত্ত হইয়া দেবগণের পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। দুর্দ্দান্ত দস্যুও অস্ত্র শস্ত্র আর স্পর্শ করে না, শত্রু তাহার পরম বৈরীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। দেশদেশান্তর হইতে বিভিন্ন প্রকার জনমানবের সমাগম হয়। এখন সেই পবিত্র সুখময় সময় সমাগত হইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি উল্লাস অন্তরে অকৃত্রিম প্রেমভরে দেবসেবায় নিযুক্ত—লোকে লোকারণ্য—মক্কায় তিলটী রাখিবার আর স্থান নাই। এ হেন সুখময় সময়ে সুযোগ বুঝিয়া মহম্মদ সশিষ্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন, প্রকাশ্য রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনোরথ পূর্ণ হইল। রাজা, রাজপুত্র, ধনাঢ্য ভদ্রলোক, বণিক, কৃষক, দীনদরিদ্র প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দলে দলে আগমন করিয়া তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

এই সময় হাবিব ইবিন মালিক নামক এক বিজ্ঞ নীতিকুশল ক্ষমতাশালী নৃপতি সসৈন্যে মক্কার উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ঘোর পৌত্তলিক ; আবুসোফিয়ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মহম্মদ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিবৃত করিলেন। "প্রবঞ্চক মহম্মদ সনাতন ধর্ম্মকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল, তাহাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।" হাবিব কহিলেন "ভাল তাহাই হইবে। মহম্মদকে আমার শিবির মধ্যে একদিন ডাকিয়া আনা হউক, আমি অবশ্য তাহাকে কিছু শিক্ষা দিব।" পৌত্তলিকগণের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। "রাজা হাবিব বুদ্ধিমান, তাঁহার প্রতাপও কিছু কম নহে, নিশ্চয়ই এইবার দুষ্ট মহম্মদ শাসিত হইবে" এই বলিয়া তাহারা চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সংবাদ পৌঁছিল "হাবিব রাজা মহম্মদকে আহ্বান করিতেছেন।" মহম্মদের আত্মীয়গণ কিছু ভীত হইলেন। তাঁহার কন্যাগুলি সুকোমল ভুজদ্বারা পিতার গলদেশ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে কহিল "পিতা, যাইও না, হাবিব শুনিয়াছি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা, হয় ত তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।" "ভয় কি মা, আল্লা কি আমাদের দেখিতেছেন না ?" বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রিয়তম শিষ্য আবুবেকার সমভিব্যাহারে হাবিবের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেনবৎ শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত, শিরদেশ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষাচ্ছাদিত, কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশে স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত, চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিতে করিতে শিবির মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অগ্রে অগ্রে অবুবেকার গমন করিতেছেন। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে দেহখানি আবৃত, মস্তকে শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে। শিবিরের যাবতীয় লোক স্তম্ভিত। ইহাই কি ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ ? নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিজ্ঞ হাবিব বিনয়-

নম্রবচনে জিজ্ঞাসিলেন, "জনশ্রুতি—আপনি ঈশ্বর প্রেরিত মহা-পুরুষ। এ কথা কি সত্য?"

"হাঁ সম্পূর্ণ সত্য।"

তর্ক উপস্থিত। বাক্যের তরঙ্গ ভীমগর্জ্জনে একটীর পর আর একটী আসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভয়ঙ্কর তুফান। বিচক্ষণ হাবিব সহজে পরাস্ত হইবার ব্যক্তি নহেন। সুচতুর মহম্মদও হালি ছাড়িবার লোক নহেন। তর্কোর্ম্মিমালা সমগ্র শিবিরকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। এইবার হাবিব পরাস্ত হইলেন। মহম্মদ দুইটী হস্ত প্রসারণ করিয়া হাবিবকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! হাবিব মহম্মদের প্রিয় শিষ্য! *

তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কাবা মন্দিরে আবুজান লিখিত অনুশাসন পত্র এখনও সংলগ্ন রহিয়াছে, সহসা এক রজনীতে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। কে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিল কেহই বলিতে পারিল না। অনেকে অনুমান করেন, সোফিয়ন, হাবিবের শিবিরে লজ্জিত, অবমানিত ও দুঃখ ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া রজনীযোগে স্বহস্তেই তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলেন। মহম্মদ যন্ত্রণার হস্ত হইতে আপাততঃ অব্যাহতি পাইলেন।

* অনেকে বলেন বিজ্ঞ হাবিব মহম্মদের বাক্‌চাতুরিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি মহম্মদকে কতিপয় অলৌকিক ক্রিয়া (miracles) সম্পন্ন করিতে আদেশ করেন, মহম্মদ দক্ষতা সহকারে তৎসমুদয় সম্পাদন করেন। চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়া তবে হাবিব তাঁহার ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। একথা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারি না। সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক আবুলফিডার গ্রন্থ মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়ার নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। তিনি বলেন হাবিব, মহম্মদের কথাবার্ত্তা, বাগ্মীতা, কোরাণের মনোহারিণী রচনা ও সুগভীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া মোহিত হন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্ম আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করেন।

কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে এখনও সুখ নাই। একটী দুর্ঘটনা সমুপস্থিত। মহম্মদের প্রতিপালক মহাত্মা আবুতালেব মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। যে মহান মহীরুহতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভয়ঙ্কর বাত্যা, ভীম প্রভঞ্জন হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন, যাহার স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তাপিত হৃদয় জুড়াইলেন, কালের ভীষণ কুঠারাঘাতে তাহা উন্মূলিত হইতে চলিল, সেই সঙ্গে মহম্মদের হৃদয়ও যে সহস্রধা বিদীর্ণ হইবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মহম্মদ মৃতকল্প তাতের রুগ্নশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আপনি পুণ্যাত্মা, নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইবেন; এখনও ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন আর নিরয়ভয়ে আপনাকে কাতর হইতে হইবে না।" দেখিতে দেখিতে দেহ শীতল হইয়া আসিল, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কাঁপিল, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, চক্ষের তারা স্থির, প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। মৃত্যু সময়ে তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কি না, তাহার বিশেষ কিছু প্রমাণ নাই।

আবুতালেবের মৃত্যুর তিন দিবস পরে মহম্মদের প্রিয়তমা সহ-ধর্ম্মিণী খাদিজা চতুঃষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন। খাদিজার মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া কাতরহৃদয় মহম্মদ একটী সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। মহম্মদ ইহজীবনে খাদিজার অকৃ-ত্রিম অনুরাগ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

পত্নীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মহম্মদের পুনরায় দার পরিগ্রহ করি-বার বাসনা জন্মিল। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আবুবেকারের পরমা সুন্দরী সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা আয়েসাকে বিবাহ করিবেন, মানস করি-লেন। আয়েসা নিতান্ত বালিকা, তজ্জন্য মহম্মদ দুই বৎসর পরে তাহার পাণিগ্রহণ করেন! রূপবতী আয়েসা বৃদ্ধ মহম্মদের তরুণী

ভার্য্যা, কাজেই ভর্ত্তার উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি প্রাণাপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিতেন; তথাপি খাদিজাকে এখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেমপূর্ণ বদনখানি স্মৃতিপটে আগ্নেয় অক্ষরে এখনও অঙ্কিত রহিয়াছে। একদিন মহম্মদকে কিছু বিমর্ষ দেখিয়া তন্বঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রাণেশ্বর! তুমি আজ এত বিষণ্ণ কেন?"

"বিষণ্ণ কেন? তুমি তাহা কি বুঝিবে, আয়েসা! খাদিজাকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার কথা মনে পড়িলে আজও বড় দুঃখ হয়।" আয়েসা কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছি! তুমি খাদিজার জন্য আজও কাতর? তাঁহার অপেক্ষা আমি কি অধিক রূপসী নহি? তবে বুঝি তুমি আমাকে ভাল বাস না?"

"তুমি আজও বালিকা, তাই বালিকার ন্যায় কথা বলিলে। আয়েসা! প্রিয়তমে! রাগ করিও না, অভিমান করিও না, সত্য কথা বলিতে কি, তুমি খাদিজার কনিষ্ঠা অঙ্গুলিরও সমযোগ্যা নহ। তুমি সুন্দরী সত্য, কিন্তু খাদিজার ন্যায় কি গুণবতী হইতে পারিবে? আমি যখন দরিদ্র ছিলাম, খাদিজা ধনাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন; যখন অসহায় ছিলাম, খাদিজা আমার সঙ্গিনী, মন্ত্রিণী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন; যখন সকলেই আমাকে ঘৃণা করিত, খাদিজা প্রাণ ভরিয়া আমাকে ভাল বাসিয়াছেন; যখন সকলে আমাকে পদাঘাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, খাদিজা মহাপুরুষ বলিয়া তখনও আমার সমাদর করিয়াছেন; খাদিজা আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বল দেখি আয়েসা! আমি তাঁহাকে কি প্রকারে ভুলিতে পারি?"

কিছু দিন পরে মহম্মদ সাদা নাম্নী এক বিধবা ললনার পাণিগ্রহণ করেন। সাদা তাঁহার শিষ্য সোকরানের প্রিয়তমা পত্নী। সাদা

রজনী যোগে স্বপ্ন দেখেন যেন মহম্মদ ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাঁহার মুখ চুম্বন করিতেছেন। পর দিবস প্রত্যুষে স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্বামীসমীপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইলে ধর্ম্ম-পরায়ণ সোকরান্ কহিলেন, "তুমি শীঘ্রই মহম্মদের স্ত্রী হইবে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে।" ইহার কিছুদিন পরেই সোকরান্ পরলোক গমন করেন এবং সাদার সহিত মহম্মদের বিবাহ হয়। সাদা সত্য সত্যই উক্তরূপ স্বপ্ন দেখিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন অথবা মহম্মদের লাম্পট্য দোষ প্রক্ষালনার্থ উহা ধর্ম্ম-পরায়ণ মুসলমানগণের কপোল কল্পিত বর্ণনা, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। মহম্মদকে বিবাহ করিয়া সাদা এক দিবসের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। মহম্মদ তাঁহাকে কিছুমাত্র ভালবাসিতেন না। শিষ্য ওমারের কন্যা হাঁসার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি বিমোহিত হন এবং সাদাকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহম্মদের পত্নীর সংখ্যা এইরূপে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মনোবিকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যখন সুকুমার বয়সের উচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিয়া জীবন মরু-ভূমির ওয়েশিস্ দেখিতে আরম্ভ করিলাম, তখন মনে করিয়া ছিলাম পৃথিবীর স্তরে স্তরে যেমন অদ্ভুত বস্তু সকল পড়িয়া রহিয়াছে আমার জীবনের প্রতি সোপানেও বুঝি সেইরূপ। তখন কি জানিতাম— আশায় দগ্ধ কক্ষ চিরকালই এইরূপ জ্বলিবে? এই ক্ষুদ্র জীবনের

স্তরে স্তরে দগ্ধ করিবে? তখন কি জানিতাম—এই দুঃখ সমান থাকিবে? এদেহে বিন্দুমাত্র শোণিত বহমান থাকিতে দুঃখ—শোণিত পিপাসু দুঃখ, এক দিনের তরে আমার বিচ্ছেদে দগ্ধ হইবেনা? তার্কিক মন আজ একটা বড় সিদ্ধান্ত করিয়াছে—প্রাণ থাকিতে দুঃখ ছাড়িবেনা—দুঃখ আমার সহোদর—বন্ধু। দুঃখ!—এজীবনে তোমার সুখ নাই—এদেহে আর শোণিত নাই—এদেহে আর তোমার রাজ্য করিবার স্থান নাই—না না (১) জীবন পরিত্যাগ করিতে পারি, তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই স্থান আমার—তোমার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে পারিনা।

হরি হরি—আজ এই অল্পকালস্থায়ী জীবনের উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের দুর্ব্বিসহ কষ্টের সোপান, জ্বালা যন্ত্রণার সোপান, রোগ শোকের সোপান, পরিতাপের, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অহংকারের সোপান, প্রণয়ের সোপান অধিরোহণ করিলাম। আশৈশব যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, কষ্টের সহোদর হইয়াও, কুহুকিনী প্রকৃতির—মোহিনীর—ভীষণ কালের ছলনায় ভুলিলাম। নারীজাতির প্রলোভন কি ভয়ানক! যে কষ্টের জন্য, যে দুঃখের জন্য, যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, এই অসহ্য নরক পরিত্যাগ করিতে চাই, এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে চাই, মোহিনী কি জানি কোন্ মন্ত্রণাবলে আজ সেই মনকে—এই দুঃখপরিপূর্ণ মনকে, প্রলোভনে ভুলাইল। মনুষ্য বুঝি

(১) Misery my sweetst friend—oh! weep no more!
Thou wilt not be consoled—I wonder not!
For I have seen thee from thy dwelling's door
Watch the calm sunset with them, and this spot.

* * * * * * * * * *

Shelley's Select Poems.

এই জন্যই ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত, এই জন্যই বুঝি মানবজীবনে দুঃখের ভাগটাই অধিক ; এই জন্যই, এই প্রলোভনেই, বুঝি যতীন্দ্র দিগের আজীবন দুঃখসঞ্চিত ব্রত ভঙ্গ হয় (২)। এই জন্যই বুঝি, এই নারীজাতির কুহকে পড়িয়াই বুঝি, মুনিদিগের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। এই জন্যই বুঝি—দাক্ষায়ণী, পতিপ্রাণা সতী, স্বামীর—পিতা মাতা অপেক্ষা—সর্ব্বদেবতা অপেক্ষা—রমণীর মাননীয় গুরুর—এজগতে নারী জাতির প্রধান দেবতার (৩)—এ পৃথিবীতে রমণীর সুখ দুঃখ যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, মূর্ত্তিমান অহংকারের—আত্মম্ভরী দক্ষের—আলয়ে পতিপ্রাণা সতীর মহীয়সী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। আজ এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি—উন্মত্ত মন—প্রলোভনে—রাক্ষসীর ছলনায় ভুলিয়াছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। হরি হরি ! এ আবার কি ! বায়ু অপেক্ষা মন দ্রুতগামী ; মনের উত্তমোৎকর্ষ পক্ষে এইটুকু মাত্র বিশেষণ দিলাম—আর পারিলাম না। হতভাগ্য জাতির হতভাগ্য ভাষার পাঁজিখানি—ক্ষুদ্র অভিধানখানি খুলিয়া দেখিলাম, ভাষার কলেবর বড় ক্ষীণ, আভিধানিক শব্দ বড় অল্প, সুতরাং মনের জ্বলন্ত ছায়াছবিখানি তোমার চক্ষের উপর ধরিতে পারিলাম না—কিন্তু বল দেখি, তোমার মন অপেক্ষা লঘু কি ?

শৈশব কাল আমার চক্ষে ধূলা দিয়া, আমাকে মূর্খের ন্যায় বুঝাইয়া, ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে রঙ্গভূমি হইতে চলিয়া গেল—অমনি নাট্যশালার জীবন-নাটকের একটী অঙ্ক—মূর্ত্তিমান

(২ রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড। ভট্টি কাব্যম্ প্রথম সর্গ ১০ শ্লোক।

(৩) "গুরুরগ্নি দ্বিজাতিনাং
বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং
সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥" পুরাণ।

সরলতার অঙ্ক—স্বভাবের লীলাময় সুন্দর অঙ্কটী সমাপ্ত হইয়া গেল। আবার সেই হৃদয়-মন-অপহরণ-কারিণী আশা কি জানি কোথা হইতে আসিয়া যবনিকা—কুহেলিকাময়ী যবনিকা ফেলিয়া দিল, পরক্ষণেই জীবন-নাটকের আর একটী অঙ্ক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলাম (৪)। এ রঙ্গভূমিতে অন্যের অধিকার নাই; এ বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার রঙ্গভূমি, জীবন আমার নাটক, স্বভাব দৃশ্যপট। এ রঙ্গভূমির নায়ক নায়িকা আমি—সকলই আমার, কিন্তু মন আমার নহে কেন? আজ যাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াই আহ্লাদ সাগরে গলিয়া গিয়াছে, বুকের ক্ষীণা রক্ততন্ত্রী সকল রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই জন্য—সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন? প্রাণ এত শরবিদ্ধ কুরঙ্গের মত ছট্‌ফট করে কেন? তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চাহে কেন? ভাল মন যাহাকে চাহে তাহাকে পায় না কেন? যদি না পায় তবে চাহে কেন? গত কল্য প্রজ্জ্বলিত দাবানল মধ্যে হরিণশিশুকে দেখিয়া কাঁদিয়াছি, তাহার পরিত্রাণের কল্পনা করিয়াছি; সাহায্যের জন্য মত্ত হস্তির ন্যায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছি, এই উন্মত্ত কাল্পনিক মন হইতে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, কৃতকার্য্য হই নাই বলিয়া দারুণ চিন্তানলে দাবদগ্ধ হরিণ-শিশু-চিত্ত-দগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমারও এই ক্ষুদ্র চিত্ত খানি দগ্ধ করিয়াছি; কিন্তু আজ আবার সেই হরিণশিশুর জন্য মনখানা ছুটিয়া বেড়াইতেছে কেন?

তাই বলি সকলই আমার—এ পৃথিবীতে মন আমার নহে।

---

(৪) "I hold the world but as the world,—
A stage where every man must play a part."
Shakspere.

আর যদি আমারই হয়, তবে আমার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হয় না কেন? আমি যাহা করিতে চাহি নাই, তাহাই করে কেন?

এ সমাজ, পাপ মনুষ্য জাতির সমাজ, শুধু সমাজ কেন? বিশ্ব-সংসার—পরহিতসাধনের চেষ্টায় বিমুখ—মনুষ্য জাতির এই বিশ্ব-সংসারের মধ্যে—প্রাণী মাত্রেরই, হৃদয়ের প্রতি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, সকলই দেখিতে পাইবে—প্রেম, ব্রীড়া, অহংকার, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, মৌখিক-সৌজন্যতা, এ সকলই আছে—আর একটী বস্তু—পূর্ণাক্ষরে সেই বস্তুর নাম লিখিতে হস্ত স্পন্দিত হইতেছে, শরীর কণ্টকিত হইতেছে, সেই বস্তু পূর্ব্বে ছিল এখন তাহার কিছু মাত্রও নাই—পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই বোধ হয় আজিও অভিধানিক শব্দ মধ্যে "দয়া" দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই বুঝি আজিও, মনুষ্যের পাপ মুখে, এ পৃথিবীতে—নরকের কীট-দিগের মুখে "দয়ার" অবমাননা হয়। পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ—চক্ষে ধূলাদিয়া একজনের সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য আমি দণ্ডধারী হইলাম; আজি হইতে যতদিন পর্য্যন্ত আমার বাসনা পূর্ণ না হয় ততদিন অবধি—আমি গৈরিক বসন পরিধান করিব, নানা প্রকার নিষ্ঠাবলম্বন করিব—বাহ্যাবয়বে মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম বলিয়া লোকে আমাকে গ্রহণ করিবে—কিন্তু যে দিন যে মুহূর্ত্তে আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে, সেই দিন হইতেই এ পৃথিবী আমার।

এ পৃথিবী আমার—অন্যে ক্ষুৎপিপাসায় ছট্‌ফট করিয়া মরিয়া যাক্, সহস্র জ্বালা যন্ত্রণা চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাক্; দুঃখের সাগরে বিশ্ব সংসার লয় প্রাপ্ত হউক, অবলার কোমল কণ্ঠ বিনিঃসৃত আর্ত্তনাদে দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণার কঠোর চীৎকারে—পৃথিবী ভরিয়া সেই শব্দ আকাশ মার্গে সেই রোদনধ্বনি, সেই জ্বালা যন্ত্রণার শব্দ ভাসিয়া বেড়াক্, অন্যের কর্ণ বধির হইয়া যাক্—আমি

তাহাতে কর্ণপাত করিব না ; আমি তাহা চক্ষে দেখিব না, কারণ এ পৃথিবী আমার। আমি আপনার ইষ্ট সাধনের চেষ্টা দেখিব ; তাহাদের প্রতি অন্ধ থাকিব। আমি যাহা করিব তাহাই তোমাকে, আমার পদানত ব্যক্তির ন্যায়, আমার ক্রীত দাসের ন্যায়, সহ্য করিতে হইবে। আজি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আজি ধর্ম্মকে জ্বালা যন্ত্রণায় উৎপীড়িত করিয়া, অভিধান হইতে ধর্ম্ম শব্দ উঠাইয়া দিয়া,—পাপ! তোমায় আমার পৃথিবীর রাজ্য করিলাম। আমার এই রাজ্যের আইন—অত্যাচার, প্রণয়—লৌহশৃঙ্খল, নন্দন কানন—কারাগার, প্রণয়ের পাত্রী—যন্ত্রণা, দস্যুতা আমার পৃথিবীর রাজ্যেশ্বরী। ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্য, তোমার এত গর্ব্ব কেন? এ পৃথিবীর সহিত মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার সম্পর্ক, তাহার শরীরে এত গর্ব্ব এত অহংকার কেন?

হরি হরি! মৃত্যু আবার কি? এই ভ্রান্ত মনকে, এই বিকারগ্রস্ত মনকে, এ কথার উত্তর কে দিবে? অহংযু পণ্ডিতমণ্ডলীদিগের নিকট পূর্ব্বপক্ষ করিয়া দেখিব তাঁহারা কি বলেন। এক্ষণে তুমি বল দেখি জীবন কি?—আমি বলিতেছি জীবন ছায়াবাজী। যদি জীবন ছায়া-বাজী হয় তবে মৃত্যু যে কি তাহা জানিনা। এই দণ্ডে এই দুই-মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহার নিকট মনের গুপ্ত কক্ষগুলি উন্মোচন করিয়া হৃদয়-কষ্ট কিঞ্চিৎ উপশম করিয়াছি ; পরক্ষণেই মৃত্যুর বিকট আকৃতির ভীষণ প্রতিবিম্ব তাহার মুখে পড়িলেই বা কেন আর সে আমাকে চিনিতে পারে না? তাহার সে কমনীয় আকৃতি ভয়ানক হয় কেন? তখনই বা তাহার নয়নের সে জ্যোতিঃ থাকেনা কেন? তখন তাহার সর্ব্ব অবয়ব বিবর্ণ হয় কেন? শুনিয়াছি ছায়াবাজীও নাকি এইরূপ। পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকলই অস্থির ; আজ যাহাকে পথের ভিখারী দেখিয়াছি কাল সে রাজচক্রবর্ত্তী। তুমি বলিতে পার, মনুষ্য মরিয়া কি হয়? লোকে

বলে কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না, আমি বলি সেটা প্রবাদ মাত্র। যদি কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম না হয়, তবে এ ছায়াবাজীর কর্ত্তা কে? সেকি মনুষ্য? যদি মনুষ্য হয়, তবে সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পৃথিবীর কোন শাসনের মতে পরিচালিত? মনুষ্য বলিয়া আমি তাহাকে স্বীকার করিতে পারিনা; যাহার প্রাণ নাই, যদি প্রাণ থাকে তবে তাহার প্রাণ কি পরের হৃদয়চ্ছিন্নকারী আর্ত্তনাদে ব্যথিত হয় না? তাহার হৃদয়ের ত্বক কি এতই স্থূল যে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর আর্ত্তনাদে, বৃদ্ধমাতার রক্ত শোষণে, প্রেমপ্রতিমার হৃদিস্থ প্রেম গ্রন্থি ছিন্নকরণে, কি সেই পাষাণ প্রাণ, সেই স্থূল চর্ম্মীয় হৃদয়, এতটুকুও কি আনচান করে না? সে মনুষ্য কখনই নয়—সে দেবতাও নয়;—দেবতা বলিলেই মনের ভিতর কেমন একটা কি যেন বড় বড় বলিয়া বোধহয়; যেন মনখানা কেমন যেন একটা কল্পনাতীত ভাব ধারণ করে—সে দেবতাও নয়। সেই বাজীকর তবে কি? সে যদি দেবতা—তবে রাক্ষস কে, তবে দস্যু কে? পরের সম্পত্তি হরণ করিলে আইন আছে, শাসন আছে; প্রাণ হরণ করিলে কি তাহার কিছুই নাই? যাহার শরীরে দয়া নাই আমি তাহাকে দেবতা বলিনা—আমি তাহাকে দস্যু বলি।

কিরণময়ী।

১

চৈত্রমাস। দিবা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস স্বকার্য্য-সাধন করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। জীবকুল

স্ব স্ব কার্য্য সমাধানান্তে নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। এমন সময় দুইটী বালিকা রূপগ্রাম নগর সম্মুখস্থ যমুনাতটে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছিল। একটীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বর্ষ, অপরটী দশ বৎসরের। দুইটীই অবিবাহিতা। প্রথমটী যদিও কিছু বয়স্থা বটে, সহায় সম্পত্তি অভাবে আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। দ্বিতীয়টী বালিকা মাত্র। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া প্রথমটী বলিল "কিরণ, বেলা গেল, এই বেলা ভাই কাপড় কেচে ঘরে যাই, নইলে মা রাগ করিবেন।" এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয়টীর মুখ বিমর্ষ হইল, বলিল "কাদম, আমার কাছে থাকিলে তোমার মা কি ভাই রাগ করিবেন? একলা থাকি, মন কেমন করে, তাই তোমায় ধ'রে রেখে দিই। বোধহয় আজিও আমাকে একলা থাকিতে হইবে।"

প্রথমটীর নাম কাদম্বিনী, দ্বিতীয়টীর নাম কিরণময়ী। উভয়ের প্রতি উভয়ের ঐকান্তিক ভালবাসা। কাদম্বিনী আশৈশব পিতৃহীনা, আর কেহই নাই, মুখ চাহিতে কেবল একমাত্র অভাগিনী জননী। কিরণময়ীর পিতা আছেন, তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, কিন্তু সকল দিন বাটী থাকেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কিরণময়ী সখী সঙ্গে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা প্রায় জলপথে যাতয়াত করিতেন, সেই জন্যই তিনি নদীতীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যত বেলা যাইতে লাগিল, কোন নৌকাই ঘাটে লাগিল না; ক্রমে কিরণময়ী নিরাশ হইতে লাগিলেন, তাই বলিলেন "বোধহয় আজিও আমাকে একলা থাকিতে হইবে।"

"ভয় কি ভাই? কেন তোমার দাইমা ত তোমার কাছে থাকেন?—তবে কিসের ভাবনা?" এই বলিয়া কাদম্বিনী অঙ্ক

মার্জ্জনার্থ জলে নামিল, কিরণময়ী উপকূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উভয়েরই মুখ ম্লান ; বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাবসানে জলে কমলিনী বিষাদিনী এবং স্থলে সূর্য্যমুখী ম্লানমুখী।

ক্ষণপরে উভয়েই দূরে একখানি নৌকা দেখিতে পাইল, উভয়েরই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে নৌকা নিকটবর্ত্তী, যত কাছে আসিতে লাগিল তত তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। উভয়েরই আশা বাড়িল। ক্রমে—ক্রমে—ক্রমে নৌকাখানি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। নৌকার ঝিল্‌মিলি সকল খোলা। উভয়েই দেখিল—নৌকা-মধ্যে পরম সুন্দর এক যুবা পুরুষ সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া আছেন ; মুখে কথা-বলি-বলি ভাব, কিন্তু লজ্জা ও বিনয়ের অনুরোধে যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আছেন। কাদম্বিনী চিনিতে পারিল—বুঝিতে পারিল ; কিন্তু বালিকা কিরণময়ী কিছুই বুঝিলেন না, নিরাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

নৌকাখানি চলিয়া গেলে কাদম্বিনী বলিল “ কিরণ, নৌকামধ্যে যে লোকটী বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিলে ?”

কি। দেখিলাম।—উনি কে ভাই ?

কা। উনি ভাই মালতীপুরের জমীদার।

কি। তুমি উহাঁকে কেমন করিয়া জানিলে ভাই ?

কা। ভাই সে দিনে আমি ঐ খানে দাঁড়িয়ে আছি—বোধ করি উনি তোমায় পূর্ব্বে কখন দেখেছিলেন—ঠিক ঐ নৌকাখানি ক'রে এসে, একখানি পত্র ল'য়ে, আমাকে বলিলেন যে ‘ কিরণময়ীকে এই পত্রখানি দিতে পার ?’

কি। তার পর ?

কা। তা আমি ভাই সে পত্রখানি ফিরিয়ে দিয়েছিলেম।—কাজ কি ভাই, তোমার বাবা তোমাকে কারুর সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে

যখন বারণ ক'রে দিয়েছেন, তখন কি একজন অপরিচিত পুরুষের পত্র ল'য়ে তোমায় দিতে পারি ?

কি। ভাই বেশ্ ক'রেছ ! ওঁর পত্র লিখিবার আমাকে আবশ্যক কি ?—বাবা একথা শুনিলে তোমার উপর কত খুসী হবেন।

কা। তোমার বাবা আমায় যে রকম ভালবাসেন, তাতে আমি তাঁকে আপনার পিতার মতন দেখি।—হাঁ ভাই, সে দিনে সেই যে স্ত্রীলোকটী এসেছিল, তার অভিপ্রায় কি কিছু বুঝিতে পেরেছ ?

কি। ভাই আমি তার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বাবা কিন্তু তাকে দেখে বড় রাগ করেছিলেন ; তাকে বাড়ী হ'তে বাহির ক'রে দিয়ে আমাকে বারণ ক'রে দিলেন, যে তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি আর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পাইব না।

কা। ভালই করেছেন—কার মনে কি আছে কে জানে ভাই!—আচ্ছা ভাই তোমার বাবা সব দিন এখানে থাকেন না কেন ? মধ্যে মধ্যে এসে তোমায় দেখে যান মাত্র ; এ সব কি ভাব, কিছুই বুঝা যায় না।

কি। কি জানি ভাই !

কাদম্বিনীর অঙ্গ প্রক্ষালন সমাধা হইল ; কূলে উঠিয়া কিরণময়ীর নিকট বিদায় লইয়া নিজ গৃহে প্রস্থান করিল। কিরণময়ী, পিতা আসিলেন না দেখিয়া, আপন কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

২

ইন্দুভূষণ মালতীপুরের জমীদার। বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বৎসর। দেখিতে সুন্দর, ললাট প্রশস্ত, চক্ষে ও মুখশ্রীতে বুদ্ধিজ্যোতি বিরাজমান। সদাই হাস্যবদন, দেখিলে যেন সে হাসিতে কিছু মোহিনী শক্তি আছে বলিয়া বোধহয়। প্রকৃতি মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, চরিত্র বিশুদ্ধ, স্বভাব উদার, এবং মন উন্নত। কিরণময়ীকে দেখিবার

পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয় কখন কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই।

রূপগ্রাম মালতীপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। গ্রীষ্মাতিশয্য-প্রযুক্ত অপরাহ্নে ইন্দুভূষণ বায়ু সেবনার্থ নৌকারোহণে রূপগ্রামের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে কিরণময়ীর অপরূপ রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি প্রায়ই নৌকা করিয়া—তখন আর বায়ু সেবনার্থ নহে, কেবল কিরণময়ীর রূপরাশি দর্শন লালসায়—রূপগ্রামাভিমুখে যাইতেন। কোন দিন মনোরথ সফল হইত, কোন দিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। কিরণময়ী কোন দিন একাকিনী, কোন দিন কাদম্বিনী সমভিব্যাহারে, নদীর ধারে ব্যগ্র মনে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন।

রূপগ্রামের সন্নিকটে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, সেই গ্রামে মতিয়া নামে একজন স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। যে পরিমাণে বয়স হইয়াছে সে পরিমাণে বলের হ্রাস হয় নাই। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, যৌবনের সৌন্দর্য্য-চিহ্ন এখনও মুখে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বয়স ছিল তখন কলঙ্কিনী রূপের ব্যবসা করিত, এবং বিষপ্রয়োগ দ্বারা আপন স্বামীর জীবন নষ্ট করিয়া এ ব্যবসার পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিল। এরূপ চরিত্রের লোক শেষাবস্থায় যাহা হয়, এ হতভাগিনী এখন তাই।

ইন্দুভূষণ যে প্রায়ই রূপগ্রামের দিকে আইসেন, মতিয়া তাহা কোন রূপে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং যে রূপের জন্য তাঁহার রূপগ্রামে আসা সে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিল। মতিয়ার স্বার্থ অর্থলাভ। ভাবিল—ইন্দুভূষণ বড়লোক, যদি এ ঘটনা ঘটাইতে পারি তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভ আছে। এই লোভে পাপীয়সী সুযোগ বুঝিয়া একদিন কিরণময়ীর বাসভবনে দারিদ্র্য ব্যপদেশে

প্রবেশ করিয়া, মায়া কান্নায় দয়াময়ী কিরণময়ীর হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল; কিন্তু সে দিন সম্পূর্ণ রূপে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অসময়ে কিরণময়ীর পিতা আসিয়া পড়ায় তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সংসাধিত হয় নাই।

৩

গোবিন্দলাল ধনাঢ্য ব্যক্তি বটে; কিন্তু সামান্য লোকের মতন থাকেন। বয়স প্রায় ৩০।৩২ বৎসর। কিরণময়ী তাঁহার একমাত্র সন্তান। ইঁহার আদি নিবাস মাধবপুর। রূপগ্রাম হইতে মাধবপুর প্রায় ৪০।৫০ ক্রোশ দূর। আজ প্রায় আট বৎসর হইল রূপগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বাসস্থান অতি নির্জন, ঠিক্ যমুনার উপরে। কুটীরের চতুর্দ্দিক উদ্যানে পরিবেষ্টিত।

গোবিনলাল সকল দিন রূপগ্রামে থাকেন না, কোথায় থাকেন তাহা কেহ বলিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া কন্যাটীকে দেখিয়া যান মাত্র। কন্যাটীর তত্ত্বাবধারণের জন্য তাঁহার সম্পর্কীয় একটী ভগ্নী থাকেন, কিরণময়ীকে বাল্যাবধি প্রতিপালন করেন বলিয়া কিরণ তাঁহাকে ছেলে বেলা হইতে " দাই মা " বলিয়া ডাকেন।

গোবিনলাল যখন রূপগ্রামে আইসেন, তখন প্রায় সন্ধ্যার সময়েই আসিয়া থাকেন। যে দিন মতিয়া তৎকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা ও বহিষ্কৃতা হইয়াছিল সে দিন অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপর দিবসে আহারাদি সমাপন করিয়া কিরণময়ীকে একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং বলিলেন " কিরণ, একবার আমার মথুরায় যাইবার আবশ্যক হইয়াছে, বোধ করি দুই সপ্তাহের জন্য তোমায় দেখিতে আসিতে পারিব না, দেখিও কোন অপরিচিতের সহিত কথা কহিও না। "

কি। বাবা, লোকের সঙ্গে কথা কহিলে কি দোষ হয়?

গো। তুমি ছেলে মানুষ, কিছু বুঝনা, কত লোক কত মন্দ করিতে পারে।

কি। বাবা, শুধু শুধু কেউ কি কারু মন্দ ক'রে থাকে? আমিত কারু কখন মন্দ করি নাই, তবে কেন কেউ আমার মন্দ করিবে?

গো। তুমি সরলা, চতুরের চাতুরী কেমন ক'রে বুঝিতে পারিবে? আমি যা বলি তা শুন।

কি। বাবা, আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ! আমায় ক্ষমা কর, আর কখন এমন কাজ করিব না।

গো। মা, তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তুমি আমার জীবনের এক মাত্র আশা, আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি! যা ব'লে যাচ্চি, স্মরণ রেখো।

"বাবা, আবার কত দিনে ফিরে আসিবে?" বলিয়া কিরণময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। গোবিনলাল নানামতে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার ভগ্নীকে ডাকিতে আদেশ করিলেন, আসিলে বলিলেন "দেখো, আমার কিরণকে অতি সাবধানে রেখো, কখন বাটীর সীমার বাহির হইতে দিওনা। আমি কিছুদিনের জন্য মথুরায় যাইতেছি, ভয় নাই, যাইয়াই পত্র লিখিব।"

সত্যবতী গোবিনলালের সম্পর্কীয় ভগ্নী। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "দাদা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে, আপন নাম পর্য্যন্ত গোপন করে, এত কষ্ট কেন সহ্য করিতেছ? চল, আমরা বাড়ী ফিরিয়া যাই। সেখানে গিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

গোবিনলালের মুখশ্রী গম্ভীরভাব ধারণ করিল। চক্ষে জল আসিল, কিন্তু কিরণময়ী পাছে জানিতে পারে এই ভাবিয়া চক্ষের জল চক্ষেই লুকাইলেন, এবং অনেক কষ্টে বলিলেন "সত্য, এ

জীবনে একাকী আর বাটী ফিরিয়া যাইব না, বাটীর নাম মনে হ'লেই আমার সকল কথা মনে হয়" পরে সত্যবতীর কাণে কাণে বলিলেন "দেখো কিরণকে কোন কথা ভেঙ্গনা।"

বালিকা কিরণ কাছে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ এ সকল কথা বার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, উৎসুক হইয়া বলিল "বাবা, তোমার যাইয়া কাজ নাই, তুমি এই খানেই থাক, তোমাকে দেখিলে আমার মন অনেক শান্ত থাকে।"

"মা, আমি বলিয়া যাইতেছি, আবার শীঘ্রই আসিব, ইহার মধ্যে যদি কিছু ঘটে আমায় পত্র লিখিও, আমার অনুমতি পত্র ব্যতীত এখানে কাহাকেও আসিতে দিওনা।" এই বলিয়া গোবিন লাল রূপগ্রামের নির্জন কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন।

৪

একদিন প্রাতঃকালে ইন্দুভূষণ আপন প্রকোষ্ঠে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছেন, ভাব দেখিয়া বোধহয় রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই, কিরণময়ীর প্রেমময়ী প্রতিমা চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় পরিচারক আসিয়া সম্বাদ দিল " একজন স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। "

ই। কে সে ?

প। আমায় পরিচয় দিলনা, কেবল বলিল 'বিশেষ প্রয়োজন, সাক্ষাৎ করিব।'

ই। আচ্ছা আসিতে বল।

পরিচারক " যে আজ্ঞা " বলিয়া প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে একজন স্ত্রীলোক ইন্দুভূষণের প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবা মাত্র ইন্দুভূষণ দেখিলেন স্ত্রীলোকটী ভদ্রবংশোদ্ভবা—বিধবা বলিয়া বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি কে ? " স্ত্রীলোক উত্তর করিল " আমার নিবাস রূপগ্রাম।"

ই। রূপগ্রাম!—এখানে কি মনে ক'রে?

স্ত্রী। বিধবার কন্যাদায়, আপনি বড় লোক, কিছু সাহায্য।

ইন্দুভূষণ স্বভাবতঃই দয়ালু, কিন্তু রূপগ্রামের নাম করায় স্ত্রীলোক-টীকে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিতে হইল না। বাস্তবিক তাহার কন্যা-দায় কি না কে জানে? কিন্তু আপাততঃ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ইন্দুভূষণ যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া বলিলেন "তোমার নিবাস রূপগ্রাম, তুমি রূপগ্রামের একটা সম্বাদ দিতে পার?"

স্ত্রী। কি সম্বাদ, আজ্ঞা করুন।

ই। যমুনার ঠিক্ উপরেই অতি নির্জনস্থানে একখানি বাগান আছে জান?

স্ত্রী। জানি।

ই। সে বাগান কার বল দেখি?

স্ত্রী। গোবিনলালের।

ই। গোবিনলালের কি সন্তান সন্ততি কিছু আছে?

স্ত্রীলোকটী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কিরণময়ী নামে তার একটী কন্যা আছে।"

ই। তার কি বিবাহ হ'য়েছে?

স্ত্রীলোকটী আবার ঈষৎ হাসিল, বলিল "না।"

ই। গোবিনলাল কি করেন?

স্ত্রী। তা বিশেষ জানিনা। এই পর্য্যন্ত জানি তিনি রূপগ্রামে প্রায় থাকেন না, মধ্যে মধ্যে এসে মেয়েটীকে দেখে যান।

ইন্দুভূষণ অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিলেন, কত কি ভাবিলেন তাহা জানি না। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "অসম্ভব! অমন কন্যাকে একাকিনী রেখে পিতা কি কখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাহিরে থাকিতে পারেন!"

স্ত্রীলোকটী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল " বাবু, আপনার বিবাহ হইয়াছে ? "

ই। না।

স্ত্রী। আপনি কেন মেয়েটীকে বিবাহ করুন না ?

ই। গোবিনলাল আমার সঙ্গে বিবাহ দিবেন কেন ?

স্ত্রী। আপনার সহিত বিবাহ ত প্রার্থনীয়।—আপনি এক কাজ করুন, একখানি পত্র লিখে আমার হাতে দিন, আমি কিরণময়ীকে গোপনে দিয়া যাইব।

ই। পত্র লিখিতে আর আমার সাহস হয় না।

স্ত্রী। কেন ?

ই। একবার পত্র লিখিয়াছিলাম, যাহার হাতে দিয়াছিলাম সে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

স্ত্রী। আচ্ছা এবার আমার হাতে দিবেন, আমি দিব।

ই। পত্র দিয়াই বা কি করিব ? আমার মন যেমন কিরণময়ীর প্রতি, তার মন আমার প্রতি যদি তেমন না হয়, তবে পত্রে কি প্রয়োজন ? আমি শুনিয়াছি সে বালা অতি সরলা, চরিত্রে সতী-দিগের আদর্শস্থল ; যাতে তার অমর্য্যাদা হবে, এমন কর্ম্ম আমি করিতে ইচ্ছুক নহি।

স্ত্রী। মহাশয় ! একখানি পত্র লিখিলে আর অমর্য্যাদা কি হবে ?

ই। যদি সে অপছন্দ করে ! যদি তার মনে কষ্ট হয় !

স্ত্রী। সে ভাবনা আপনি ভাবিবেন না, যাতে সে পছন্দ করে আমি তাই করিব।

ই। তোমার স্বার্থ কি ?

স্ত্রী। আপনার প্রত্যুপকার করা।

ই। ও ! তুমি পারিবে ?—দেখো যেন কোন ছলনা ব্যবহার

ক'রোনা। অমল সতীত্ব-কমল যেন কিছুতে কলঙ্কিত না হয়।

স্ত্রী। আপনার সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই।

ই। তোমার নাম কি?

স্ত্রী। আজ্ঞা আমার নাম মতিয়া।

ই। আচ্ছা তবে তুমি কাল একবার আসিও, বিবেচনা করিয়া পত্র লিখিয়া রাখিব।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া আনন্দিত মনে মতিয়া চলিয়া গেল।

পাঠক! মতিয়ার ব্যবহার দেখিলে? কন্যাদায় ছল মাত্র। পাপীয়সী মনোরথ সফল করিয়া চলিয়া গেল।

৫

প্রাতঃকাল গেল। দুই প্রহর সময়। ইন্দুভূষণ স্নানাহার সমাধা করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। কিসের ভাবনা? ভাবিতেছেন "একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের নিকট মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলাম! কি আশ্চর্য্য! প্রাণ যখন প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয় তখন লজ্জা শরম কি কিছুই মানেনা!" আবার ভাবিতেছেন "হায়! যে প্রতিমা মানসপটে অঙ্কিত ক'রে দিবানিশি ধ্যান করিতেছি, জীবন্ত কি তাকে পাবনা? যদি না পাই, ত এ জীবনে আর দার পরিগ্রহ করিব না, চিরদিন সেইরূপ ধ্যান করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিব! অর্দ্ধবিকশিত কমলসদৃশ সেই বদনখানি কি কখন বিস্মৃত হব! জগৎ ভুলিব, আপনাকে ভুলিব, কিন্তু সেই প্রেমময়ী কিরণময়ীকে কখনই ভুলিতে পারিব না।—হায়! কেন এ ফাঁদে পড়িলাম!—এ স্ত্রীলোক কে? অর্থ পাইল বলিয়া মনো-রঞ্জনের জন্য ত আশ্বাসবাক্যে আমায় ভুলাইল না?—যাই হউগ্, পত্র লিখি; আসে, লইয়া যাইবে; না আসে, পত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। হৃদয়ের আবেগ আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কি লিখিবেন, কিরূপ লিখিলে কিরণময়ীর অবমাননা না হয়, এই ভাবিয়া আবার অস্থির হইলেন। প্রথমে একখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, সেখানি মনোজ্ঞ হইল না, অমনি বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আবার একখানি লিখিলেন, সেখানিও মনে ধরিল না, সুতরাং সেখানিও ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এইরূপে অনেকগুলি কাগজ নষ্ট হইয়া গেল, পত্র লেখা হইল না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপে পত্রখানি লিখিলেন :—

ভদ্রে।

অপরিচিতের অপরাধ ক্ষমা করিও। তোমাকে এ পত্র লিখায় দোষী হইলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু ঈশ্বর সমীপে স্বীকার করিতেছি, আমার হৃদয়ের ভাব বিশুদ্ধ, ইহাতে পাপের স্পর্শমাত্র নাই। যদি অপরাধী হইয়া থাকি বিবেচনা কর, তবে প্রার্থনা, দয়া করিয়া অপরাধ মার্জনা করতঃ পত্রখানি একবার পাঠ করিয়া কৃতার্থ করিবে।

যে অবধি তোমার অকলঙ্ক মুখশশী নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই অবধি হৃদয় বিমোহিত হইয়াছে, অপরাধ মার্জনা করিও, প্রাণ তোমার পাণিগ্রহণাভিলাষে ব্যাকুল হইয়াছে। এ কথা গোপন রাখিবার আবশ্যক নাই, যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে তোমার পিতাকে জানাইতে প্রস্তুত আছি।

আমি দরিদ্র নহি। কিন্তু প্রণয় সম্বন্ধে দরিদ্র আর ধনবান কি? যদি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হয়, আর যদি পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও তোমাকে পাই, তাহা হইলেও অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিব, তাহা হইলেও আপনি পরম সুখে সুখী হইব।

যদি তোমার পিতা আমা অপেক্ষা কোন ভাগ্যবানের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবার মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে লিখিও, আমি কখন তোমায় আর বিরক্ত করিব না, কখন তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিব না, বরং তোমার সুখের নিমিত্ত সর্ব্বসুখ-দাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করিব।

তোমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়া রহিলাম। আমার সুখ দুঃখ তোমার উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে।

তোমারই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,

ইন্দুভূষণ।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে ইন্দুভূষণ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার হৃদয় কিছু পরিমাণে শান্ত হইল। অবশেষে পত্রখানির উপর শিরোনামা ও ঠিকানা লিখিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

ইন্দুভূষণের একটী বিশেষ গুণ ছিল, তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ছিলেন। মনকে বিষয়ান্তরে লওয়াইবার জন্য সময়ে সময়ে চিত্রপট অঙ্কিত করিতেন। এখন পত্র লেখা শেষ হইয়াছে, মন সম্পূর্ণ সুস্থির হয় নাই, সুতরাং অন্যমনস্ক হইবার জন্য কতকগুলি স্বহস্তলিখিত পট লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং সেই সকল পটের মধ্যে একখানি চিত্র তাঁহার হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিল, তিনি সেইখানিই একমনে দেখিতে লাগিলেন। সে কাহার চিত্র?— তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিরণময়ীর।

কিরণময়ীকে দেখিয়া অবধি যে প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া-ছিলেন, এ চিত্রখানি তাহার অবিকল নকল। চিত্রখানি সম্মুখে রাখিয়া কখন হাসিতেছেন, কখন তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, আবার কখন মনোনিবেশ পূর্ব্বক সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে

দ্বারবান আসিয়া সম্বাদ দিল "ধর্ম্ম অবতার! উদাসিনী আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" ইন্দুভূষণ উদাসিনীর নাম শুনিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে আনয়ন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং আপনি শশব্যস্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদাসিনী ইন্দুভূষণের গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইলে ইন্দুভূষণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। উদাসিনী উপবেশন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "জননি! আপনার শুভাগমনে চরিতার্থ হইলাম, কিন্তু এখানে আসিবার অভিপ্রায় অবগত হইবার প্রার্থনা করি।"

উ। ইন্দুভূষণ! আবার তোমার কাছে আসিলাম।

ই। যে আজ্ঞা। আপনার শুভাগমনে আমার বাটী পবিত্র হয়, আপনার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আমি আপনাকেও পবিত্র জ্ঞান করি।

উ। তুমি যেরূপ সদ্‌গুণবিশিষ্ট, এ কথা তোমার যোগ্য বটে। সম্প্রতি তোমার প্রজাদের মধ্যে একজনের বড় বিপদ।

ই। বিপদ! কি বিপদ, ভগবতি?

উ। একজন সপরিবারে রোগে ও পথ্যাভাবে মারা যায়। আমি তাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি, তুমি দয়া করিলে তাহারা এ যাত্রায় রক্ষা পাইতে পারে।

ই। ভগবতি! আপনি তাদের পরিচর্য্যা——

উ। ইন্দুভূষণ! তুমি ত জান—আমার কাজই এই। পরের উপকার করাই আমার পরম ধর্ম্ম—তাহাতেই আমার পরম সুখ।

ই। ভগবতি! আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ইহার প্রতিবিধানের আদেশ প্রদান করিতেছি।

ইন্দুভূষণ গৃহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। উদাসিনী গৃহমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ইন্দুভূষণ প্রত্যা-

গমন করিয়া বলিলেন "জননি! আমি স্বয়ং তাহার দুঃখ মোচনার্থ যাইতেছি, আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন।"

উদাসিনী হর্ষোৎফুল্লনয়নে ইন্দুভূষণকে সঙ্গে লইয়া রোগ-গ্রস্ত-দরিদ্র-কুটীরে প্রস্থান করিলেন।

৬

ইন্দুভূষণ বাটীতে প্রত্যাগমন করণানন্তর স্বীয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—অনেক যত্নে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন সে পত্রখানি যথাস্থানে নাই। মনে করিলেন ত্বরাপ্রযুক্ত বোধহয় অন্য কোথাও ফেলিযাছেন। সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন কোথাও সে পত্র পাইলেন না। বাটীর সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই "জানি না" বলিয়া তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিল। ভাবিলেন "উদাসিনী কি পত্রখানি লইয়া গেলেন?—অসম্ভব!—জীবন—যৌবন-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের উপকারার্থ যে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সে কি পত্রখানি গোপনে লইয়া যাইবে? যদি একান্তই লইতেন তাহা হইলে আমার প্রত্যাগমনের পুর্ব্বেই কি প্রস্থান করিতেন না? আর উদাসিনীর সে পত্রেতেই বা স্বার্থ কি?—অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব! এরূপ কুচিন্তাকে মনে স্থান দিলেও পাপ হয়।—যদি কোন মন্দ লোক গৃহে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে এত বহুমুল্য দ্রব্য থাকিতে সে কি পত্রখানিই অপহরণ করিল? গৃহের অন্যান্য সকল দ্রব্যইত যথাস্থানে রহিয়াছে, আর কেবল পত্রখানিই নাই?" অনেকে ভাবিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অদৃশ্য পত্রের পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া আবার একখানি পত্র লিখিলেন এবং সাবধানে নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিয়া দিলেন।

দিনমান অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রিতে শয়ন করিবার পুর্ব্বে

নিজ গৃহে যাইয়া ইন্দুভূষণ দ্বারকদ্ধ করিলেন এবং চিত্রগুলির মধ্য হইতে কিরণময়ীর চিত্রখানি পুনরায় বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায়! প্রথম দর্শনেই কেন চমকিয়া উঠিলেন? কি দেখিলেন? চিত্রখানি উজ্জ্বল আলোকের নিকট ধারণ করিয়া উত্তমরূপে দেখিলেন, যেন সুন্দরীর চারু বসনের উপর একটী বারি-বিন্দু—বোধহয় একবিন্দু অশ্রুজল পতিত হইয়াছে!

ইহার অর্থ কি? এ ঘটনা কিরূপে ঘটিল?

তিনি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন;—যতই দেখিতে লাগি-লেন ততই বারিবিন্দুচিহ্ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

উদাসিনীর আসিবার পূর্ব্বে তিনি সেই চিত্র বারম্বার দেখিয়াছেন, কই তখনত এ চিহ্ন দেখিতে পান নাই? তবে এখন ইহা কোথা হইতে আসিল!

তবে কি উদাসিনী এ চিত্রখানি দেখিয়াছিলেন? হাঁ—স্বভাব-তঃই এইরূপ মনে লয় বটে। কারণ তিনি ক্ষণকাল সেই গৃহে একাকিনী ছিলেন, সম্ভবতঃ চিত্রখানি দেখিলেও দেখিতে পারেন। কিন্তু বারিবিন্দু কেন? একি তাঁহার অশ্রুজল? তাঁহার হৃদয়ে কি কিছু বেদনা আছে? তিনিকি মনোদুঃখে উদাসিনীব্রত অবলম্বন করিয়াছেন? "যাহাই হউগ্, বারিবিন্দু যে কিরণময়ীর প্রফুল্ল মুখ কমলের উপর পতিত হয় নাই, এই আমার পরম ভাগ্য।" এই বলিয়া চিত্রখানি আবার কতক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—দর্শন-পিপাসা যেন কোন মতেই তৃপ্ত হইতেছে না।—পরে আলস্যবশে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। রাত্রি ক্রমে ক্রমে গভীর হইতে লাগিল, কিন্তু চক্ষে নিদ্রা নাই। "কে পত্র লইল?—চিত্র-মধ্যে বারিবিন্দু কোথা হইতে আসিল?—কিরণময়ীকে কি পাইব?" ইত্যাদি ভাবনাসকলই তাঁহার নিদ্রার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

রাত্রি দুইটার পর চক্ষু মুদিলেন, কিছু তন্দ্রা আসিল। যতক্ষণ তন্দ্রা-বেশে ছিলেন, ততক্ষণ কিরণময়ীকেই স্বপ্নে দেখিতেছিলেন—যেন কিরণময়ী তাঁহারই কাছে রহিয়াছেন, যেন কিরণময়ী তাঁহারই হইয়াছেন, যেন কিরণময়ীর রূপের কিরণে তাঁহার আঁধার প্রেমাগার আলোকিত হইয়াছে।

ক্রমে নিশা অবসান হইল। বালরবিচ্ছবিছটা পূর্ব্বগগনপটে দেখা দিল। মন্দ মন্দ প্রাতঃ সমীরণ কুসুমকানন হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া জাগ্রত জীব-নিচয়কে উপহার প্রদান করিতে লাগিল। জীবকুল নববলে বলীয়ান হইয়া নবানুরাগের সহিত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতঃ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দুভূষণ শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি একজন পরিচারক আসিয়া সম্বাদ দিল "রূপগ্রাম হইতে একজন স্ত্রীলোক কি পত্রের জন্য দাঁড়াইয়া আছে।"

ইন্দুভূষণ শশব্যস্তে পত্রখানি বাহির করিয়া—ভয় পাছে প্রথম খানির মত এখানিও হারায়—পরিচারকের হস্তে দিলেন, বলিলেন "যাও, অতি সাবধানে লইয়া যাইতে বলিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া পরিচারক পত্র লইয়া মতিয়ার হস্তে আনিয়া দিল। মতিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে পত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

৭

পরদিবস প্রাতঃকালে কিরণময়ী কুটীর সংলগ্ন উদ্যানে একাকিনী সঞ্চরণ করিতেছেন, অনতিদূরে লতাগুল্মসমাচ্ছাদিত স্থানের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন লোক তাঁহাকে দেখিতেছিল। কে সে? ইন্দুভূষণ?—না। সে পাপিষ্ঠা মতিয়া। মতিয়ার মুখ হাসি হাসি কেন?—কিরণময়ী বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারই দিকে আসিতেছিলেন বলিয়া। ক্রমে ক্রমে কিরণময়ী মতিয়ার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। মতিয়া অন্তরাল হইতে ডাকিল—"কিরণময়ী!"

কিরণময়ী চমকিয়া উঠিলেন।

ম। কিরণময়ী! নিকটে এস, ভয় নাই, আমি তোমার শত্রু নহি।

কিরণময়ী স্বর চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মতিয়া আবার বলিল "কিরণময়ী! আমি তোমার শত্রু নহি। যাইও না—আমার মাতা খাও—একটী কথা শুন—আমি কখনই তোমার অনিষ্ট করিব না।"

কি। আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তাঁর অনুমতি ভিন্ন কোন অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিব না।—আরও আমার সন্দেহ হ'চ্চে তোমার অভিপ্রায় ভাল নয়।

ম। হায় কিরণময়ী! তুমিও কি তাই মনে কর? তোমার অনিষ্ট ক'রে আমার লাভ কি? আর কেমন ক'রেই বা আমি তোমার অনিষ্ট করিব?

কি। তা জানিনা—কিন্তু—

ম। কিন্তু কি?—তোমার বাবা সে দিনে অকারণে আমায় কত তিরস্কার করিলেন, অথচ আমি কোন দোষেই দোষী নহি। সেই সব কথা বলিবার জন্যই তোমার কাছে এসেছি। হায়! তুমিও আমার উপর সন্দেহ করিলে! আমার কি দুরাদৃষ্ট!

মতিয়া এইখানে একটু মায়াকান্না কাঁদিল। কিরণময়ীর হৃদয় ভিজিল—বলিলেন "বাবা তোমায় তিরস্কার ক'রেছেন, তিনি আসিলে তাঁহার কাছে বলিও, আমার কাছে সে কথা কেন?"

মতিয়া সকরুণস্বরে পুনরায় বলিল "আমার হ'য়ে দু'কথা যদি বুঝিয়ে তোমার বাবাকে বল, সেই জন্য তোমার কাছে এসেছি।—তোমার বাবা কোথায়?"

কি। তিনি কিছুদিনের জন্য মথুরায় গিয়াছেন।—

মতিয়ার মন এ সম্বাদে আনন্দিত হইল—ভাবিল "বেশ সুযোগ হইয়াছে।"

কি। আর এখানে থাকিতে পারি না।—তোমায় কটু কথা বলিয়াছি, আমায় ক্ষমা করিও। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—আর এখানে থাকিতে পারি না।

কিরণময়ী গমনোদ্যতা। মতিয়া আবার ছলনা করিয়া বলিল "কিরণময়ী! হতভাগিনী বলিয়া হতাদর করিও না, দরিদ্রা বলিয়া তাচ্ছল্য করিও না। একটু দাঁড়াও, আমার বিশেষ একটী কথা আছে।"

কিরণময়ী দাঁড়াইল। বালিকা কিছুই জানে না, মায়াবিনীর মায়াকান্নায় ভুলিল।

মতিয়া পত্রিকাখানি বাহির করিয়া বলিল "আমার প্রার্থনা এই খানি একবার তুমি পাঠ কর। ইহাতে কোন নিন্দাবাদ নাই, মন্দ কথা নাই, তোমারই জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে—বোধকরি এখানি পাঠ করিলে তোমার হৃদয়ে আনন্দ ধরিবে না।" বলিয়া পত্রিকাখানি কিরণময়ীর হস্তে ফেলিয়া দিল।

কিরণময়ী পত্রিকাখানি লইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মতিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল, আবার অনুরোধ করিল "পড়, প'ড়ে দেখ—কত আনন্দের কথা লেখা আছে!"

এইরূপে অনুরুদ্ধা হইয়া সরলা বালা কিরণময়ী পত্রিকাখানি খুলিয়া ফেলিলেন এবং অকপটহৃদয়ে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ করা শেষ হইলে প্রথমে ভাবিলেন "কেন পড়িলাম?—বাবা শুনিলে কি বলিবেন?" আবার ভাবিলেন "লেখকের 'মনের ভাব বিশুদ্ধ,

পাপের স্পর্শমাত্র নাই'—এ কথা সত্য বোধহয়, নতুবা লেখক এ সকল কথা গোপনে রাখিতে অস্বীকার করিতেন না। তিনি যখন স্বয়ং বলিতেছেন 'অনুমতি হ'লে তোমার পিতাকে জানাইতে প্রস্তুত আছি' তখন তাঁর হৃদয়ে কপটভাব কিছুই নাই।—অনুমতি?—কি নম্র প্রকৃতি!—লোকের সহিত কথা কহিলে বা লোককে পত্র লিখিলে কি অপরাধী হয়? তিনি কি অপরাধ ক'রেছেন যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছেন?—আমি কি সুন্দরী, যে তিনি আমার সৌন্দর্য্য বিমোহিত হ'য়েছেন? যদি তাই হয়, তবে কি তাঁর এ তৃষ্ণা রূপের জন্য? পবিত্র প্রণয়ের জন্য নয়?—তাই বা কেমন ক'রে বলিব?——

'যদি তোমার পিতা আমা অপেক্ষা কোন ভাগ্যবানের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিবার মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে লিখিও, আমি কখন তোমায় আর বিরক্ত করিব না, কখন তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিব না, বরং তোমার সুখের নিমিত্ত সর্ব্বসুখদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করিব।'—এটুকু পাঠ করিলে কি আর সে সন্দেহ থাকে?"

এইরূপ নানারূপ চিন্তা করিতেছেন। মতিয়া আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। চতুরা ভাব দেখিয়া বুঝিল "কপোতী পাশ-বদ্ধা হইয়াছে।" অবশেষে বলিল "পত্রখানি পাঠ করিলে কি মা?"

কিরণময়ী ব্যাকুলিতচিত্তে উত্তর দিলেন "হাঁ।"

ম। মালতীপুরের জমীদার ইন্দুভূষণ বাবুর উপর তোমার রাগ হয় নাইত?

কি। মালতীপুরের জমীদার!

ম। আশ্চর্য্য হইলে কেন? জমীদার হইলে কি কুটীরবাসিনী সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে নাই?

কিরণময়ী লজ্জায় ঈষৎ অবনতমুখী হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ম। সে সন্দেহ করিও না। ইন্দুভূষণ প্রকৃত ভদ্রবংশোদ্ভব, তাঁর হৃদয়ে ছলনার লেশমাত্র নাই।—এখন বল দেখি তুমি কি ইন্দুভূষণ বাবুর উপর রাগ করিলে?

কি। কেন আমি তাঁর উপর রাগ করিব? তিনি আমার কি করিয়াছেন?—আমি এ পত্রখানি বাবার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমি যে তাঁর কাছে কিছুই গোপন করি না, এই পত্রখানি পাইলেই তিনি জানিতে পারিবেন আর কত সন্তুষ্ট হবেন!

ম। কিরণময়ী! তুমি বালিকা, কিছুই বুঝনা। এ সকল বিষয় তোমার বাবাকে এখন জানাইবার আবশ্যক কি? ইন্দুভূষণের আর তোমার এই প্রণয়ের কথা কেবল আমিই জানিব, আর কারও এখন——

কি। ও!—বুঝেছি।—কিন্তু দেখ এ সম্বন্ধে বাবার হৃদয় যদি ব্যথিত হয়—বাবার স্নেহ হ'তে যদি বিযুক্তা হই, তবে ইহাতে আমার আবশ্যক নাই। তুমি যাঁর পত্র তাঁকে ফিরাইয়া দিও, বলিও— কিরণময়ীকে আর যেন তিনি মনে না করেন।

এই বলিয়া কিরণময়ী পত্রখানি মতিয়ার হস্তে নিক্ষেপ করিলেন এবং কুটীরাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিয়া গেলেন।

মতিয়া, সকল পরিশ্রম, সকল প্রবঞ্চনা, বিফল হইল দেখিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল "এ সম্বাদ ইন্দুভূষণকে দিই" আবার ভাবিল "এখন কাজ নাই—আর কিছুদিন যা'গ।" পরে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ও সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গিরি।

—:—

দিবানিশি জাগরণে, ভূষা তরুদল,
এ প্রান্তরে একেশ্বর, ঊর্দ্ধশিরে নিরন্তর,
কার তরে শৃঙ্গধর হ'য়েছ অচল ?
সম সহ তাপ, হিম, বজ্র, বাত্যা, জল।

কি অসুখে মনোদুখে হ'য়েছ পাথর ?
সুধি তোমা হে পাষাণ, পাষাণ কি তব প্রাণ,
কিশোরে ছিলনা কি হে কোমল অন্তর ?
উন্মত্ত কি তন্ত্রে যাও ভেদিয়া অম্বর ?

একার্ণবে পূর্ণ যবে এ বিপুল স্থান,
তখন ছিলনা ভূমি, কোথায় আছিলে তুমি,
ঢল ঢল জল কিসে হইল পাষাণ ?
তরল তরঙ্গমালা শিলার সোপান।

ক্ষিপ্তপ্রায় জ্বাল শিরে দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলন্ত নিদাঘ রবি, তব সদানন্দ ছবি,
রজনীতে ভয়বাসি ভীষণ দর্শন,—
বিশাল শ্মশান ভূমে ভৈরব যেমন!

অটল অশনিপাতে, নিবাস গহন,
তোমায় সুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি,
অবিরল আঁখিজল—নির্ঝর পতন,—
তোমারো কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন ?

তোমার হৃদয়ে কারু জাগে কি অধর ?
মধুর শিশুর বোল,　　　　নূপুর কিঙ্কিণী রোল,
কখন কি শুনিয়াছ নারী-কণ্ঠস্বর ?
তাই কি পাথর তব অন্তর কাতর ?

সুরঙ্গ কুরঙ্গ, হেম-অঙ্গ পাখিগণে,
ঋক্ষ ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর,　　　　জীবঘাতী বনচর,
শরণ লইয়া আছে তব আলিঙ্গনে ;—
আশ্রয় কি দাও গিরি ভাগ্যহীন জনে ?

সহানুভূতি।

প্রকৃত কবিরা যে সকল জগত-বিমোহন মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নিকট উপহার প্রদান করেন, সহৃদয় পাঠক তাহার বর্ণ-চাতুরী হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝেন এবং প্রতি তুলিকাখেলার রেখাপাতে এক অপরূপ মাধুরী ফুটাইয়া লয়েন। কবির কল্পিতচিত্রে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যায় ; তিনি আপনার মনঃ প্রাণ সকলই চিত্রের মনোহারিত্বে বিসর্জ্জন দিয়া পুলকে পূরিত হন। স্বার্থ, আত্ম-সুখ সকলই জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয়ের যাহা কিছু কোমল বস্তু আছে তাহাতে সেই চিত্র সম্বলিত করেন ; তখন তাঁহার হৃদয় এক স্বর্গীয় শোভায় শোভিত হয় ; তাঁহাতে আর তিনি থাকেন না ; তাঁহার বাসনা সেই চিত্রে, তাঁহার আনন্দ সেই চিত্রে, তাঁহার সেই চিত্র-খানি বুকের সামগ্রী হইয়া উঠে। কবি এইরূপে স্বকীয় চিত্র দেখা-ইয়া যে যাদুবলে পাঠকের মন কাড়িয়া লয়েন, তাহা হৃদয়ের একটী বৃত্তি ধরিয়া—সেই বৃত্তিটী সহানুভূতি।

কবির নায়ক নায়িকার দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাঁহাদিগের সুখে হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়। অজ্ঞাতে কবিরা তোমার হৃদয়ের তারে আঘাত করেন, এবং তোমার হৃদয়ও কবির অভিমত স্বর তুলে, এরূপ সহানুভূতি আর কোথা মিলে? ইহাতে পাষাণও গলিয়া যায়—হিমাদ্রিও বিচলিত হয়।

এই সহানুভূতি উদ্রেক করা কবিদিগের একটী মহাধর্ম্ম। তোমার যাজকগণ কি উপদেশ দেন জানি না, কিন্তু ঐ উপদেশের নিকট শত শত নীতিজ্ঞের উপদেশ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম-শাস্ত্র, তোমার ক্রিয়াকলাপ ন্যায়দণ্ডে মাপিয়া, তোমায় তাহার শাসনে আনিতে চাহিবে; তোমার মন তাহাতে পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে; তুমি সুযোগ পাইলেই তাহার শাসন-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়া আইস। "প্রাণ দিয়া পরের উপকার কর, কদাচ পরের অপকার করিও না"—এইরূপ উপদেশ আবহমান চলিয়া আসিতেছে, ইহার কার্য্যকারিতা তোমার হৃদয়ে স্থানও পায় না; কিন্তু যখন কবির কাব্য-লিখিত মহাপুরুষের প্রতিকার্য্য উহার সার্থকতায় পরিপূরিত দেখিলে অমনি সেই মহাপুরুষের প্রতি তোমার মমতা জম্মে, হৃদয় তাঁহার খ্যাতিকীর্ত্তনে নাচিয়া উঠে।

তাই বলি পাঠকের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া দেওয়া কবিদিগের একটী মহাধর্ম্ম।

তাঁহারা যে চরিত্র তোমার সমক্ষে উপস্থিত করাইবেন তাহা তুমি আপনার বলিয়া হৃদয়ে পুষিবে, হৃদয় তাহার অশান্তিতে অধীর হইয়া উঠিবে—শান্তিতে সুখময় হইবে। প্রকৃত কাব্য সহানুভূতির আলেখ্য, এবং সহানুভূতিই মানবজীবনের কাব্য। যদি সকল মানবহৃদয় এই কাব্যসুধায় পূর্ণ হইত, তাহা হইলে জগতের এত শোক, এত দুঃখ কখন থাকিত না। যাঁহারা এই সুধায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া

ছিলেন, তাঁহারা জগতের দুঃখে অশ্রু বরিষণ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখীজন দেখিয়া তাহাকে পঞ্চক্রোশ অন্তরে না রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়াছেন, তাহার দুঃখ-নিবারণের জন্য আপনার হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে সান্ত্বনারত্ন অজস্র দান করিয়াছেন। রোগ-জীর্ণ-বিশুষ্ক-মুখ-জনের সকল শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছেন, সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সমধিক যত্ন ও স্নেহের সহিত তাহার যন্ত্রণা মোচনের উপায় অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে কয়জন এই মহাধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? অন্ধধর্ম্মের বিশ্বাসে পিতামাতার ক্রোড় হইতে বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন—একমাত্র সহায়—সন্তানটীকে বাহ্য ধর্ম্মের কারায় পূরিয়া, তাহার হৃদয় পাষাণে রচিয়া মনের প্রীতিতে পূর্ণ হইতেছেন। এই সকল ধর্ম্মগৌরব বর্দ্ধন করিতে কত ভীষণ অত্যাচারে, কত শোণিত বর্ষণে, কত হৃদয়োন্মূলনে জগত কলঙ্কিত না হইয়াছে?

যাহার মূর্ত্তি শয়নে স্বপনে হৃদয়মাঝারে জাগরূক থাকে, যাহার মুখলাস্য হৃদয়ে শতেক চন্দ্রমার শোভায় শোভিত করে ; যাহার নয়নাশ্রু অন্তর ঘোর বাত্যাবৃষ্টির অজস্র ধারায় প্লাবিত করে, যে তাহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, যে তাহার দেহ, সে যাহার ছায়া, সেই অমূল্য সম্পত্তির বিনাশ করিয়া আলু-লায়িতকেশা, ধূলাবিলুণ্ঠিতা, অশ্রুপরিপ্লুতা কামিনীগণের হৃদয় শোকাগ্নিতে যে ধর্ম্মের রক্তাহুতি—ভগবন্! কেন সে ধর্ম্ম আজিও জগতের কলঙ্ক বাড়াইতেছে? কোথায় দুঃখিনীর অশ্রুমোচন—কোথায় অক্ষত হৃদয়ের শোণিত ক্ষালন! কোথায় রুগ্ন অনাথ ভ্রাতৃগণের দুঃখবারণ—কোথায় সুখ ক্রোড়পালিত জনকে দুঃখ-বর্ম্মে সংস্থাপন! যাহা মনুষ্যত্বকে দূরে ক্ষেপণ করিয়া চিরকাল অমানুষিকী রাক্ষসী লালসার পরিতোষ বর্দ্ধন করিয়াছে, যাহা সত্যের

পবিত্র জ্যোতিঃ ছলনা-কুয়াসায় আবরিয়া রাখিয়া প্রবঞ্চিত জনকে লোভপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে, কেন সেই সকল পৈশাচী-ক্রিয়া ধর্ম্মের পূতনামসংলগ্না রহিয়াছে? হায়! মানবজীবন কাব্যে অমৃতময়ী কবিতার পরিবর্ত্তে কে এই গরল পরিপূরিতা অপভাষার যোজনা করিল? যাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব কাব্য-সুধার পিপাসায় পিপাসিত, তিনি কখনই এই বজ্রগর্ভ দানবীর মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন না।

এ জগতে যতই হৃদয়শীল জনের আবির্ভাব হইবে ততই পবিত্র আর্য্য ধর্ম্মের কীর্ত্তি দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইবে। যিনি ধীরমনে, সংযতহৃদয়ে হিন্দুশাস্ত্র নিচয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি ততই মানবজীবনের অমৃতময় কাব্যের স্বর্গীয় রসাস্বাদনে চিত্ত চরিতার্থ করিবেন। যখন সাগরমন্থন করিতে করিতে অমৃত উত্থিত হইল তখন দেবদানবে মহাদ্বন্দ্ব বাধিল। কিন্তু সেই অমৃতের পর যখন গরলোৎপত্তি হইল—তখন কে তাহা পান করিল?—নীলকণ্ঠ!

এই সাংসার-সাগর মন্থন করিতে করিতে যখন সুখ উঠে তাহার প্রাপ্তিবাসনা সকলেরই হয়, কিন্তু দুঃখ উঠিলে কে তাহা কণ্ঠে ধারণ করে?—কোথায় এই শোকভারনিপীড়িতা ধরার মহামহিমাময় অনল-রজতবপুঃ স্থিরচেতাঃ নীলকণ্ঠ? হায়! কোথায় তিনি? ভক্তি-চন্দনে প্রীতিকুসুমে তাঁহার চরণ পূজা করি আইস ভাই!! জগতের এই অসীম যন্ত্রণা—এই দুর্ব্বিসহ জ্বালা—কে ঘুচাইবে? আইস তাঁহার স্নেহবিল্বসেবিত চরণামৃত পান করি। সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া যাউক। অন্যমনে কি ভাবিছ?—বার বার বলিতেছি আইস ভাই! এই চিত্র হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে অঙ্কিত রাখিয়া জগতের কল্যাণে অগ্রসর হও, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ইষ্টলাভ করিবে—

এই সংসারে নীলকণ্ঠের ন্যায় তুমিও মৃত্যুঞ্জয় হইবে। যশস্বি ! তোমার যশঃ কোন কালে লুপ্ত হইবে না।

যে ভারতবাসী, এক কালে এই সহানুভূতিকে জগত জীবনের মঙ্গলকারিণী এবং সংরক্ষয়িত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আজি সেই ভারতবাসী জাতীয় জীবনে তাহার উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে ! কিন্তু আজি এই চিরনৈরাশ্যদগ্ধ ভারিতে কে ইহার প্রতি অধিবাসীর কর্ণে এই উপাসনার বীজমন্ত্র প্রদান করিবে ?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

০ঃ০

নুরজাহান কাব্য। শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থকারের পদ্যরচনার প্রবৃত্তির এ নূতন পরিচয় নহে, আরও কয়েকখানি পুস্তক ইনি পদ্যে রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যখানির প্রসঙ্গটী ভাল, তবে গ্রন্থকার রচনায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। কাব্যখানির অনেক স্থান এমন আছে যে পাঠ করিতে করিতে পদ্য পড়িতেছি কি গদ্য পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে, স্থানের স্থানের ভাষাও এমন জটিল যে সকল জায়গার প্রকৃত ভাবসংগ্রহ হইয়া উঠে না। গ্রন্থকার যদি জগৎ-সংসার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থী হন তাহা হইলে আমরা গোপনে তাঁহাকে বলি—এরূপ রচনায় কামনা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কনক কানন। (গীতি-নাট্য)—শ্রীবিনোদ বিহারি দত্ত কর্ত্তৃক ন্যাশন্যাল্ থিয়েটরে অভিনয়ার্থ প্রণীত ও প্রকাশিত। কনক কাননের অপ্সররাজপুত্র সুরনাথের সহিত কনকপুরীর অপ্সররাজকন্যা

শৈলসুন্দরার প্রণয় উপলক্ষ করিয়া এ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। সমুদ্রে সখীসঙ্গে জলখেলা করিতে গিয়া একখানি তরি দর্শনে শৈলসুন্দরী ব্যগ্র হইয়া উঠেন, পরে তরিমধ্যে পুরুষ সুন্দর সুরনাথকে দেখিয়া বিমোহিত হন, এবং বিস্তর মায়াজাল বিস্তার ও কাটান ছিড়েনের পর সৌভাগ্য ক্রমে উভয়ের মিলন হয়। সঙ্গীতগুলি বাবু আর্ টী সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত। সুরলয় কাগজে ছাপা পড়িলে আমরা বিশেষ বুঝিতে পারি না, শ্রবণগোচর হইলেই কিছু বুঝা যায়। ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল, প্রায় নূতন নূতন ব্যাপার এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে, এখানি ইহার কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোনাত হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ রহিল।

ফুলবালা। (গীতি কাব্য)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত—ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই কাব্য খানিতে অনেকগুলি দেশীয় পুষ্পের প্রতি গীত রচনা করা হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু এই কাব্য খানির মধ্যে চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন বটে, এবং ইহাতে স্থানে স্থানে সুরুচিও দৃষ্ট হয় কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কবিমধ্যে পরিগণিত করিতে ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি নূতন কবি, কিরূপে ভাব ও কল্পনাশক্তির বেগ প্রকাশ করিলে পাঠকবর্গের মনোরম্য হয়, সেই সন্ধান বোধ হয় তিনি এখনও পান নাই। আমরা ভরসা করি দেবেন্দ্র বাবু সেই গূঢ় সন্ধান অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থকার পুস্তক খানিতে বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্দের অবতারণা করিয়াছেন, বোধ হয় সকল গুলিতে সমানরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কাব্য খানি পাঠোপযোগী বলিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কিরণময়ী।

৮

কিরণময়ী কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। মন চঞ্চল—অস্থির। হৃদয়ে নবীন ভাবের আবির্ভাব। প্রাণ নূতন চিন্তায় ব্যাকুল। কুটীরের জনশূন্যতা ঘোর কষ্টকর হইয়া উঠিল এবং তদবস্থায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেন যে এ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রাতঃকাল গেল। আহারের সময় উপস্থিত। সত্যবতী আহারের জন্য কিরণময়ীকে আহ্বান করিলেন। কিরণ, ক্ষুধার অনুরোধে নয়, সত্যবতীর অনুরোধে আহার করিতে গেলেন। আহারাদি সমাপন হইলে স্বীয় প্রকোষ্ঠে পুনরায় প্রবেশ করিলেন, পুনরায় তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে চিন্তার উত্তাল তরঙ্গমালা আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। "কেন আজ আমি এত বিষাদিনী?—সেই কুটীর—সেই উদ্যান—সেই আমি—কিন্তু আমার মন এমন হইল কেন?—কাদমের কিছু হ'লে, কাদম মায়ের কাছে গিয়া জানায়, আমি হতভাগিনী কার কাছে জানাব!—মা! তুমি কি এখন আমায় স্মরণ করিতেছ? তাই কি আমার মন এত চঞ্চল হ'য়েছে? হায়! এ অগ্নি কোথায় গেলে নির্ব্বাণ হবে!"

কুটীরে আর থাকিতে পারিলেন না, বহির্গত হইয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিক ওদিক কত বেড়াইলেন। বেড়াইলে কি জ্বালা জুড়ায়? মন কিছুতেই শান্ত হইল না। প্রাতঃকালে যে স্থানে দাঁড়াইয়া মতিয়ার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সে স্থানে

দাঁড়াইলেন কেন?—মনে করিলেন কে যেন তাঁহার সুকোমল চরণ-যুগল ধারণ করিয়া—একটু দাঁড়াও, একবার দেখি—বলিয়া অনুনয় করিতেছে। সে স্থান হইতে আর নড়িতে পারিলেন না। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কত ভাবিলেন। "ইন্দুভূষণের পত্র ফিরাইয়া দিয়া কি ভাল করিয়াছি? না জানি তিনি এতক্ষণ আমায় কি মনে করিতেছেন!—মন্দই বা কি করিয়াছি? বাবার অসাক্ষাতে, তাঁর অনভিমতে, আমি কি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর হৃদয়ে বেদনা দিতে পারি?—আর সত্যই কি ইন্দুভূষণ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? বোধহয় মতিয়া আমায় প্রবঞ্চনা করিয়া গিয়াছে। ইন্দুভূষণ বড়লোক, কুটীরবাসিনী হতভাগিনীর প্রণয়াভিলাষী হইবেন কেন?"

অকপটহৃদয়া কিরণময়ীর বিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্রে প্রণয়োৎসের এই প্রথম উচ্ছ্বাস—এই জন্যই এই আবেগ—এই জন্যই এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

"আজ কাদম কেন এখনও আস্‌চেনা? কাদমের কি কিছু অসুখ হ'য়েছে? সে এখানে থাকুলে, তাকে এ সকল কথা ব'লে অনেক সুস্থ হ'তেম।—হায়! আমি কি হতভাগিনী! আজ আমার মা থাকিলে কি আমায় এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত!—মা!—মা!—তোমার অভাগিনী কিরণময়ীকে ভুলিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ! আর কি এ জীবনে তোমার দেখা পাইব না মা!—কি আশ্চর্য্য! বাবার কাছে পূর্ব্বে যখন মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তখন তিনি বিরক্ত হইতেন; কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁর চক্ষে জল আইসে কেন?" এইরূপ কতরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

বেলা অবসান প্রায়। অস্তগামী অংশুমালী বৃক্ষলতাদি ভেদ করতঃ কোমল কিরণজাল বিস্তার করিয়া কমলভ্রমে কিরণময়ীর ম্লান-মুখকমলে বিদায় চুম্বন গ্রহণ করিতেছেন। মৃদু মৃদু সান্ধ্য-সমীরণ বিষাদিনীর অলকাবলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। প্রখরার্কতাপবিদগ্ধা

পৃথ্বী ক্রমে ক্রমে শীতল হইতেছেন। প্রকৃতি প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে। এমন সময় কিরণময়ী অদূরে একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন, চমকিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন, বোধ হইল একখানি নৌকার শব্দ। নৌকাখানি ক্রমে ক্রমে আসিয়া যেন তাঁহাদের ঘাটে লাগিল। কিরণময়ী যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে স্থান হইতে দেখিলে ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন—একটী স্ত্রীলোক দ্রুতপদে তাঁহার উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভাবিলেন "এ স্ত্রীলোকটী কে?—এ ত মতিয়া নয়! তবে কি ইন্দুভূষণ আর কোন স্ত্রীলোককে মতিয়ার পদে নিযুক্ত ক'রেছেন?—না, বাবা এখানে নাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে এ সকল ঘটনা না ঘটে, সেই ভাল।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিরণময়ী কুটীরাভিমুখিনী হইতে উদ্যত হইতেছেন—শুনিলেন খেদব্যঞ্জক বামাস্বরে কে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। "কিরণময়ী! কিরণময়ী! একটু দাঁড়াও, যেওনা মা, একটু দাঁড়াও!" কি অদৃষ্টপূর্ব্ব অভাবনীয় ঘটনা! কিরণময়ীর হৃদয়ে সহসা স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, প্রাণ প্রিয় আলিঙ্গনের জন্য ব্যাকুল হইল, তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন;——দেখিলেন মলিনবসনা একটী কামিনী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারই দিকে উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। "দাঁড়া মা, যাস্‌নে মা" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। কিরণময়ী পূর্ব্বকার সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন, এবং "যাবনা যাবনা, তুমি এস, আমি এইখানেই আছি" বলিয়া বাগানের বেড়ার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? আমাকেই বা কেমন করিয়া জানিলে?"

"হায়! আমার কিরণ আমাকে বলিতেছে 'কে তুমি?' ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি কষ্ট আমার হইতে পারে!" নবাগতা রমণী কপোলে করাঘাৎ করিয়া বলিতে লাগিল: "কিরণ! তোমায় বলিবার অনেক কথা আছে, তোমায় জানাইবার অনেক দুঃখ আছে! মা! তুমি আমার কাছে একবার আসিবে না? না হয় আমাকেই তোমার কাছে যাইতে দাও?" বলিয়া সজল নয়নে কিরণময়ীর পানে নবাগতা কামিনী চাহিয়া রহিল।

কিরণময়ী কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। হর্ষ, ভয় ও আশা একবারে তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। আধ আধ স্বরে বলিলেন "তোমার কথায় আমার মন যে কি হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা!"

"কিরণ! কিরণ! রক্তের টানে তোমার মুখ হইতে একথা বাহির হইয়াছে! কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি আমার প্রতি কি সন্দেহ করিতেছ!—হায়! আমি বুঝিতে পারিয়াছি তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে! মা! তুইও কি আমার উপর সন্দেহ করিলি?" বলিয়া কামিনী অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

বাতাহত কদলীর ন্যায় কিরণময়ী কাঁপিতে লাগিলেন। দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। ভাবিলেন "বুঝি আমার অদৃষ্টের সহিত ইহার অদৃষ্টের কিছু সংযোগ আছে।" কিন্তু কিরূপ সংযোগ, জানিবার জন্য অধিক ভরসা হইল না। কি যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে এই শোকাতুরা কামিনীর সহিত তোমার বিশেষ কিছু সম্বন্ধ আছে এবং তিনি উহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য যেন উৎসুক হইতে লাগিলেন।

"কিরণ! কিরণ! কতক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া থাকিব? তুমি

কি আমার কাছে আসিবে না? না হয় কোথা দিয়া যাব আমাকেই ব'লে দাও?—দেখো, কেউ যেন আমায় দেখিতে পায় না!—তোমার পিতা কোথায়?

কি। তিনি কিছুদিনের জন্য মথুরায় গিয়াছেন।

রমণী। আঃ!—তোমার দাইমা কোথায়?

কি। দাইমা বাড়ীতে।

র। তবে আমি কেমন ক'রে তোমার কাছে যাব? তিনি যে দেখিতে পাইলেই আমায় তাড়াইয়া দিবেন!

কিরণময়ী এই সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, ভাবিলেন "এ ত আমাদের সকল সম্বাদই জানে!"

র। কিরণ! বল আমি কেমন ক'রে তোমার কাছে যাব? ও! কতক্ষণ এখানে এ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিব! ইচ্ছা হয় বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া তোমায় কোলে লই!—মা! আয় মা!

কিরণময়ীর হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইল। কেন এ রমণী পুনঃ পুনঃ "মা, মা" বলিয়া ডাকিতেছে, কেন কাঁদিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন—"আমার মন যে কত কথাই কহিতেছে তাহা বলিতে পারি না; কে তুমি আগে বল?"

র। 'কে আমি' জিজ্ঞাসা করিতেছ?—হায়! আগে আমার কোলে এসে এ তাপিত প্রাণ জুড়াও, তবে তোমায় সকল কথা বলিব।

কিরণময়ী কি জানি আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া গিয়া নবাগতা কামিনীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রমণীর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পতিত হইতে লাগিল, বলিল "মা! এতদিনে তোরে কোলে পেলেম! সেই তোরে গর্ভে ধারণ করেছিলেম, আর এই এতদিনে তোরে আবার কোলে পেলেম!"

কিরণময়ী হর্ষ ও বিষাদে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "কি!—কি!—তুমি কি আমার মা!"

র। কিরণ! জগদীশ্বর জানেন! আমিই তোর হতভাগিনী জননী!—নির্দ্দয় আমার ক্রোড় হইতে তোকে বাল্যকাল অবধি কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু এমন সময় নাই যখন আমি তোকে ভাবি নাই, এমন দিন নাই যে দিনে তোর জন্য না আমায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে!

কিরণময়ীর শরীর অবশ হইয়া আসিল, তিনি ক্রমে ক্রমে স্পন্দ-হীন হইয়া পড়িলেন। রমণী চিরাপহৃত ধন, জীবনের জীবন তনয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া নৌকায় যাইয়া উঠিল, এবং নাবিকদিগকে শীঘ্র নৌকা বাহিতে আদেশ দিল। নাবিকগণ আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে নৌকা খুলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে বাহিয়া চলিয়া গেল।

৯

নৌকা অনেকদূর যাইলে কিরণময়ীর সংজ্ঞা হইল। এতক্ষণ তিনি যেন নিদ্রাবেশে সুখস্বপ্ন উপভোগ করিতেছিলেন! সহসা সংজ্ঞালাভ হইলে তাঁহার ভয় হইল পাছে স্বপ্নবৎ সকলই মিথ্যা হয়। কিন্তু ক্ষীণ সূর্য্যালোকে যখন দেখিলেন, তাঁহার মাতা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে, বিষণ্ণ বদনে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন, তখন স্নেহে জননীর গ্রীবাধারণ করিয়া বলিলেন "মা! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? সত্য বল—তুমি কে?"

র। কিরণ! হা কিরণ! আমি কি তোর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি! আমিই তোমার মাতা, আমিই তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছি! তোমায় পাইবার জন্য নিরাহারে নিরাশ্রয়ে কত স্থান অন্বেষণ করিয়াছি! কিরণ! অনেক কষ্টে তোমায় পাইয়াছি, এখন আর তোমায় ছাড়িব না। তবে যদি দরিদ্রা ব'লে তুমি আমার

কাছে থাকিতে না ইচ্ছা কর, কিম্বা সেই নির্দ্দয়, জান্‌তে পেরে, আবার তোমাকে আমার ক্রোড় হ'তে কেড়ে ল'য়ে যায়, বলিতে পারি না!—কিরণ! আমার অনেক সাদৃশ্য তোমাতে আছে, তারা স্পষ্টাক্ষরে বলিবে—তুমি আমারই সন্তান।

কি। হা! আমারও মন তাই বলিতেছে—তুমিই আমার মা! মা! তুমি দরিদ্রা ব'লে আমি তোমার কাছে থাকিব না! এই কি তোমার মনে হয়?—মা! এ জীবন থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িব না, আমি চিরদিন তোমারই কাছে থাকিব।

রমণী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায়! আমার কি এমন কপাল হবে!—কিন্তু কিরণ, আমার কাছে থাকিলে তোমার পিতাকে ত আর দেখিতে পাইবে না।

কি। মা! অমন কথা ব'লনা! তুমি কি বাবার অমতে আমায় ল'য়ে যাচ্চ?—ও! আমি যে এসেছি, দাইমা ত জানে না—কেউ ত জানে না! আমি তোমার কথা শুনিব, না বাবার কথা শুনিব? বাবা যে আমায় কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে নিষেধ করে দিয়েছেন!—হায় একজনের কথা শুন্‌তে গিয়ে আর একজনের কাছে অপরাধিনী হচ্চি!

"কিরণ! স্থির হ'!—হায় আমারই কপাল মন্দ, তোর কিছুই দোষ নাই মা!" বলিয়া রমণী কিরণময়ীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন এবং ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কি। মা! তোমার কথা শুনিলে, তোমার দুঃখ দেখিলে, আমার হৃদয়ে তুমি ভিন্ন আর কিছুই স্থান পায় না।—মা! আর আমি অমন কথা বলিব না, তুমি কাঁদিও না, আমি তোমারই কথা শুনিব, তুমি কাঁদিও না!

র। আমি যে তোর জন্য কত দুঃখ সহ্য ক'রেছি তা আর তোরে কি ব'ল্‌ব! সে সব মনে হ'লে আমাতে আর আমি থাকি না!

কি। মা! আবার কেন কাঁদিতেছ?—তোমার কিসের দুঃখ আমায় বল মা।

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন "কিরণ, আমি সুখী হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমার মতন দুঃখিনী আর পৃথিবীতে নাই!—অনেক দিনের পর তোমাকে পেয়ে আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি, কিন্তু পাছে তোমায় আবার হারাই এই ভেবেই প্রাণ ব্যাকুল হ'চ্চে!"

কি। মা! কেন তুমি আবার আমায় হারাবে? আমি তোমা-রই কাছে থাকিব, আমি ত আর কোথাও যাবনা, তুমি কি আমার কাছে থাকিবে না মা?

র। কিরণ! আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় থাকিব!—কিন্তু যখন সেই নির্জ্জন কুটীর, সেই সুন্দর বাগান, আর সেই তোমার পিতাকে স্মরণ হবে, তখন ত তুমি কাঁদিবে না?

কি। হায়! সেই নির্জ্জন কুটীরের হৃদয়স্নিগ্ধকর ভাব, আর সেই সুন্দর উদ্যানের বিকশিত কুসুমরাশি, তোমার স্নেহের কাছে কোন্ ছার!—কিন্তু বাবার কথা মনে হ'লে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে! কত যত্ন করিতেন, কত ভাল বাসিতেন; ও!—মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়!

র। কিরণ! কিরণ! আমা অপেক্ষা তুমি তোমার বাবাকে অধিক ভালবাস! হায় বাসিতে পার!—আমায় ত বাল্যকাল হ'তে কখন দেখ নাই, কেন আমার প্রতি তোমার স্নেহ হবে! না না। কিরণ, তোমার স্নেহ আশা করাই আমার অন্যায় হ'য়েছে! চল, তোমায় আবার সেই কুটীরে রেখে আসি। এ জীবনে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবনা।

কি। মা! কেন এত নিরাশ হ'চ্চ? তোমার রোদন ও শোকপূর্ণ কথা শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে।—তুমি আমার মা, তুমি আমারই জন্য দুঃখিনী, আমি তোমা ছাড়া আর কার কাছে থাকিব?

কিরণময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার কোলে মুখ লুকাইলেন। রমণী স্নেহভরে মুখখানি উত্তোলন করিয়া শতসহস্র চুম্বন করিলেন, বলিলেন "কিরণ! এতক্ষণে আমার মনের তৃপ্তি হ'ল, এতক্ষণে জানিলাম তুই আমার কাছে থাকিবি।

কি। মা। তোমার কথা শুনিলে আমি সব ভুলে যাই। তোমার কাছে না থাকিলে আমি বাঁচিব না।—কিন্তু মা, আমি যে তোমার সঙ্গে এসেছি বাবা ত জানেন না, দাইমা ত জানে না, তাঁরা কত ভাবিবেন, তাঁদের সম্বাদ পাঠাইয়া দিও।

র। অবশ্যই দিব। আমার ধন আমি পেয়েছি, আমার লুকাইবার আবশ্যক কি?—আমি তোমায় ল'য়ে আবার সংসারী হব!

কি। তুমি কোথায় থাক?

র। আমি যেখানে থাকি, সেখানে তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাকে আজ আমি একজনদের বাটীতে রাখিয়া যাইব, কল্য অপরাহ্নে তোমাকে লইয়া একটী মনোজ্ঞ মন্দিরে প্রবেশ করিব।

কি। আজ আবার কার কাছে আমায় রেখে যাবে? তুমি ত আমার কাছে থাকিবে?

র। কিরণ! তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় থাকিব?—কিন্তু মা, অদ্য রাত্রেই তোমার জন্য আমায় একটী বাটী স্থির করিতে হইবে, কল্য হইতে আর তোমাকে একলা থাকিতে হইবে না।—আজও একলা থাকিতে হইবে না, যাঁহাদের কাছে তোমায় রাখিয়া যাইব, তাঁহারা আমার আপনার লোক, তোমাকে পাইলে কত সুখী হবেন, তোমায় কত যত্নে রাখিবেন।

বলিতে বলিতে নৌকাখানি গিয়া একটী ঘাটে লাগিল। রমণী কিরণময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া একটী বাটীতে উঠিলেন।

১০

বাটীখানি নদীর উপরেই। নিকটে একখানি পোড়োবাড়ী, আর সেখানে বাড়ী নাই। স্থানটী নির্জ্জন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া রমণী দুইটী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে প্রণাম করিল এবং কন্যাকেও প্রণাম করিতে বলিল। কিরণময়ী প্রণাম করিলে মহিলাদ্বয় তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং আনন্দে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "কিরণ! মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে ছিলে? তোমার কি মন কেমন করিত না মা?" কিরণময়ী হর্ষ ও লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। রমণী উত্তরে বলিল "ওত ছেলে বেলা অবধি আমাকে দেখে নাই; কেন ওর মন কেমন করিবে?" মহিলাদ্বয় বলিলেন "তা বটে, তা মিথ্যা নয়"।

রমণী কিরণময়ীর অসাক্ষাতে মহিলাদ্বয়কে কি বলিয়া কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কন্যার মন আবার ব্যাকুল হইল। মহিলাদ্বয় অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই তাঁহার মন বুঝিল না। রাত্রে অনেক যত্নে কিছু আহার করাইলেন এবং একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া আপনারা স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে গেলেন।

কিরণময়ীর নিদ্রা হইল না। নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। "পিতা কত স্নেহ করিতেন, কত যত্ন করিতেন, কেন তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম? আমি কুটীরে নাই শুনিলে তিনি কত ভাবিত হইবেন! কত কষ্ট পাইবেন! হায়! কেন এমন কর্ম্ম করিলাম! দাইমা, কাদম, না জানি এতক্ষণ কত ভাবিতেছে, কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে"! আবার ভাবিলেন "যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই

মা আমার জন্য নিরাহারে নিরাশ্রয়ে স্থানে স্থানে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে আমাকে পাইয়াছেন, এখন তিনি ছাড়িবেন কেন? হায়! আমি কি হতভাগিনী! অদৃষ্টে এখনও যে কত কষ্ট আছে বলিতে পারি না!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রমবশে নিদ্রাভিভূতা হইলেন, সে নিদ্রা সুখপ্রদা হইল না; চিন্তাবশে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন:—যেন তিনি উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় ইন্দুভূষণ আসিয়া বেড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। কোথা দিয়া প্রবেশ করিলেন কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না। মনে মনে করিলেন পলাইব, কিন্তু পলাইতে পারিলেন না, তাঁহার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকাতে সংলগ্ন হইয়া গেল। যেন ইন্দুভূষণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! তোমায় পত্র লিখিয়াছি বলিয়া তুমি কি রাগ করিয়াছ? আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া কি অসন্তুষ্ট হইলে? বল, তবে চলিয়া যাই। আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষাও যে অধিক ভাল বাসি, তা কি তুমি জান না? তোমায় না দেখিলে আমার যে কষ্ট হয় তা কি তুমি বুঝিতে পার না? কথা কহিতেছ না কেন? বল, যদি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এস্থান হইতে প্রস্থান করি, আর তোমায় বিরক্ত করিতে আসিব না।" তিনি এ কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইন্দুভূষণের হস্তেই কম্পিত হইতে লাগিল; মনে করিলেন কাড়িয়া লই, কিন্তু কি অচিন্তনীয় কারণে অক্ষম হইলেন। ইন্দুভূষণ আবার বলিলেন "কথা কহিলে না, তবে যাই?" এবার লজ্জা গেল, অকপট হৃদয়ে শূন্য নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! যেন ইন্দুভূষণের সুন্দর বদন বিকুঞ্চিত হইয়া গেল, ইন্দুতুল্য মুখশ্রী

বিকৃত ও ভীষণ ভাব ধারণ করিল, পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তিত হইল, দেখিলেন যেন ইন্দুভূষণের স্থানে মতিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে বিকট দৃষ্টিতে চাহিতেছে। ভয়াভিভূতা হইয়া চিৎকার করিতে গেলেন, পারিলেন না, স্বরভঙ্গ হইয়া গেল ; ত্রাসে ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

আবার দেখিলেন:—যেন তিনি কুটীর মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা নিকটে আসিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। "কেন তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ? আমার বিনা অনুমতিতে অপরিচিত লোককে কেন কুটীরে আসিতে দিলে ?" তাহার পর তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পিতা মতিয়ার সহিত বাদানুবাদ করিতেছেন। মতিয়া সেথায় কখন আসিল, কি লইয়া তাহার সহিত বিবাদ আরম্ভ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে মতিয়া পিশাচীর ন্যায় তীব্র দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান করিলে তাঁহার পিতা আবার তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পিতা কিছুতেই শুনিলেন না, বলিলেন "আমার কথা না শুনিয়া আপনার বিপদ আপনিই ঘটাইতেছ। আমি তোমায় এত যত্ন করি, এত স্নেহ করি, তুমি কিছুতেই কৃতজ্ঞ নহ, দেখিও শীঘ্রই তোমায় দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই হইবে।" তিনি পিতার পদতলে পতিত হইয়া "আর কখন করিব না" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় আর একটী লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেটী স্ত্রীলোক—তাঁহার মাতা।

এবার দেখিলেন যেন তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই উভয়ের কাছে থাকিবার জন্য দীন নয়নে তাঁহাকে অনুনয় করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, তিনি অতি বিপদাপন্ন ; কাহাকে ত্যাগ করিয়া কাহার কাছে যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদিকে তাঁহার চিরপরিচিত পিতা এবং অপরদিকে তাঁহার অদৃষ্ট-

পূর্ব্বা মাতা! এ দিকে পিতা পূর্ব্বকার তাবং ভালবাসা, তাবৎ যত্ন, ও তাবং স্নেহ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, অপরদিকে মাতা বলিতেছেন "মা! আমি বড় দুঃখিনী, আমার কাছে আয়, তুই না হ'লে আমি বাঁচিব না।" পিতার মুখে ঘোর সংশয়পূর্ণ হৃদয়ের হতাশ ছবি প্রকাশ পাইতেছে, মাতার মুখমুকুরে আশঙ্কাবিতাড়িত নিদারুণ যন্ত্রণা পরিপূর্ণ চিত্তের প্রতিবিম্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে! তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন—তিনি দুই হস্ত বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য অতি হীনাবস্থায় তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন, সেই দৃষ্টি সকাতরে বলিতেছে "যদি তোমাকে হারাই, তাহা হইলে এ জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইব!" এ নিদারুণ দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল! মাতার নিকট হইতে জন্মশোধ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন, দেখিলেন—তিনি জানু পাতিয়া, করযোড়ে, বিষাদ পরিপূর্ণমুখে, ধারা বিগলিত নয়নে, তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন, যেন সেই দৃষ্টি সহস্র জিহ্বায় বলিতেছে "মা! অভাগিনীর জীবন ও মরণ আজ তোর উপর নির্ভর করিতেছে!" আর থাকিতে পারিলেন না, ঝাঁপাইয়া মাতার ক্রোড়ে পড়িলেন। দুঃখের আর্ত্তনাদ পিতার মুখ হইতে বিনির্গত হইল। তিনি চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? না এ সকল সত্য ঘটনা?" এই চিন্তা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। ক্ষণপরে স্থির করিলেন যে সমস্তই স্বপ্ন। তাহার পর ভাবিলেন "আমি কোথায় রহিয়াছি? কেমন করিয়া এখানে আসিলাম?—বাবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি!—মা আমাকে এখানে একলা ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়া-

ছেন!—দাইমা, কাদম, কত ভাবিতেছে!—বাবা এ সম্বাদে কতই কাতর হইবেন!" এই সকল চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি পুনরায় কুটীরে প্রত্যাগমন কারবার সঙ্কল্প করিলেন, ভাবিলেন "দাইমা বাবাকে এ সম্বাদ পাঠাইতে না পাঠাইতে বাড়ী গিয়া পঁহুছিব।"

রাত্রি তখন একটা। কিরণময়ী শয্যাত্যাগ করিলেন। নীরবে নিঃশব্দে একাকিনী বাটী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। বাটীর সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে, সুতরাং তাঁহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। একবার তাঁহার মাতার কথা মনে পড়িল, ভাবিলেন "আবার অবশ্যই মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত বিবৃত করিব।" এখন পলায়ন করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সদরদ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে পাছে কেহ জাগিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় পশ্চাৎ দিকে গেলেন এবং ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র একটী গুপ্তদ্বার খুলিয়া পার্শ্বস্থ পোড়োবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মনে করিলেন এই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিব।

পোড়োবাড়ীর অবস্থা অতি ভয়ানক। জনমানবের তথায় সম্পর্ক নাই। দিবসেই আঁধার, তাতে আবার রাত্রি। সেই বাটীর মধ্যে, রাত্রি একটার সময়, দশ বৎসরের বালিকা একাকিনী প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইয়া একটী কুটীর পাইলেন, তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার হস্তস্পর্শমাত্রেই দ্বারটী খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন গৃহটী শূন্য। সে গৃহ অতিক্রম না করিলে বাহির হইবার আর উপায় নাই। অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে আর একটী দ্বার পাইলেন। সে দ্বারটী উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র সহসা একটী আলোক তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল, দেখিলেন এক বিকটাকার ভীষণমূর্ত্তি তাঁহার

পানে উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। কিরণময়ীকে দেখিবামাত্র "ভূত! ভূত!" বলিয়া চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। সম্মুখস্থ প্রদীপ পড়িয়া গিয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিরণময়ী ভয়ে চিৎকারধ্বনি করিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

কোকিল।

১

না জানি মোহিনী কিবা আছে তোর স্বরে,
গাও প্রাণ ভ'রে ;
কুহু কুহু কুহু তান, কেমন কেমন প্রাণ,
কি যেন হ'য়েছি হারা জনমের তরে ;
ধীরে ধীরে বয়ান বহিয়ে বারি ঝরে।

২

কামরূপী কালপাখী কি কুহকবলে,
এ পাষাণ গলে ;
এই ছিল এই নাই, ধরি ধরি নাহি পাই,
কি চাই সুধাই তাই কে যেন কি বলে,
সুধায় গলায় প্রাণ তবু কেন জ্বলে ?

৩

নাহিক সে দিন নাহি নাহি সেই প্রাণ,
শুনে তোর তান,
প্রমোদিত বিমোহিত, তন্দ্রিত সরল চিত,
ভাবে ভুলে প্রাণ খুলে করিয়াছি গান,
সেই আমি, সেই প্রাণ আজিরে শ্মশান !

৪

সুন্দর বসন্তে বসি সুন্দর কাননে,
সুন্দর গগণে—
সুন্দর চন্দ্রমা ভাসে, সুন্দর কুসুম হাসে,
সুন্দর সঙ্গীত দোলে সুন্দর পবনে ;
কি সুন্দর প্রেম তোর সুন্দরের সনে।

৫

নাহিক সে দিন হায় নাহিক সে দিন,
কালে দিন লীন,
সুন্দরের অনুরাগে, কিবা না করেছি আগে,
এখন হৃদয়াগার সুন্দর বিহীন ;
তোর স্বরে জাগে আজ পূর্ব্ব স্মৃতি ক্ষীণ !

৬

বসন্ত-বান্ধব, ফের বসন্ত যথায়,
বসন্ত সহায় ;
নিঃসহায় বরিষায়, কঠোর করকা ঘায়,
দামিনী খেলায় ছলে, আঁধার বাড়ায়,
প্রাণের সুসার তায় কার না শুকায় !

৭

মাতাও উধাও প্রাণ গাও মাতোয়ারা,
হই জ্ঞানহারা ;
কুহু কুহু কুহু কুহু, উহু উহু হুহু হুহু,
ঝরুক শ্মশান ভূমে অমৃতের ঝারা,
উজান বহিয়ে যাক সময়ের ধারা।

আমাদের নব চিকিৎসা।

প্যাটেণ্ট (Patent) ঔষধ সম্প্রতি যে ভাবে বিস্তীর্ণ হইতেছে, তাহা দেখিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি বিবেচনা করা যাইতে পারে। এ সময়ে আমাদের নব ঔষধটী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে সাধারণের উপকারে আসিতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ বোধ হইতেছে না। লাভ-লালসায় চিকিৎসকেরা ঔষধ প্রকাশে যেরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, রোগের প্রতিকার হউক এ দৃষ্টি তাঁহাদের কতদূর প্রবল, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। সকল বিষয়েরই মুখ্য এবং গৌণ রূপ দুইটী দুইটী উদ্দেশ্য থাকে। সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে একটী সাধু ও অপরটী অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে : যথা—কেহ জীবন ধারণের উদ্দেশে আহার করে, কেহ বা আহারের উদ্দেশে জীবন ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটী সাধু এবং দ্বিতীয়টী অসাধু বোধ হয়। সাধারণের মঙ্গল হউক এই ইচ্ছায় যিনি ঔষধ প্রকাশে যত্নবান্, তাঁহার ইচ্ছা সাধু এবং অর্থাগমের পিপাসায় সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলে নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় পিপাসার শান্তি করা সাধু ইচ্ছা কি না, তাহা সাধু ব্যক্তিদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর থাকিল। যদি গৌণ উদ্দেশ্যটী অসাধু বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে শরীরগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যেমন রোগী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে, সেই রূপ চিকিৎসককেও মানসিক রোগে পীড়িত মনে করা যাইতে পারে। চিকিৎসকের এই মাত্র উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সারেন ; কিন্তু চিকিৎসক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে তিনি রোগীকে সারেন, কি রোগকে সারেন? অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঔষধ

টিপে গর্ত্ত বুজান্, কিন্তু সাপের লেজ ধ'রে টেনে বাহির করা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছু কাল মধ্যে ক্রমে যখন সর্ব্বাঙ্গে গর্ত্ত হইয়া পড়ে তখন চিকিৎসক মহাশয় (উৎপাৎ ঢুকাইবার জন্য) জল বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিজাতীয় চিকিৎসায় আমাদের দেশীয় রোগ সকলের বিজাতীয় ভাব ঘটিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বাবু পুস্তকে দেখিয়া থাকেন যে ইউরোপে ব্রথ্ (**Broth**) ও বিফ্-টি (**Beef-tea**) পথ্য বলিয়া উপকারিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। বাবু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া বঙ্গ দেশীয় রোগীকে ঐ সকল ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু বিচার করিলে যে দেশে সুস্থাবস্থায় যে দ্রব্য নিত্য খাদ্য বলিয়া স্থির আছে, সেই দ্রব্য যে অবস্থায় লঘু হইতে পারে তাহাই রুগ্নাবস্থায় পথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশীয় লোকে সুস্থাবস্থায় ভাত খাইয়া থাকে, পীড়িতাবস্থায় খই। ইউরোপখণ্ডে প্রায় আম মাংস খাইয়া থাকে, তাহার লঘু পাক ব্রথ। যদি কোন স্থানে আস্ত পাথর নিত্য খাদ্য হয় তথায় পীড়িতাবস্থায় সুতরাং কাঁকর পথ্য হওয়াই উচিত!

নব চিকিৎসার প্রস্তাবে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে অর্থাগমের প্রত্যাশায় আমরা ইহার প্রকাশে যত্নবান হইলাম। কিন্তু ভাইরে! সত্যই আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ইহাতে আমাদের একটী পয়সারও প্রার্থনা নাই। এ চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে কোন আলোচনা হয় নাই এমতও নহে।

আমাদের প্রেস্ক্রিপ্শন্ (**Prescription**) প্রকাশের পূর্ব্বে ব্যবস্থার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মাহাত্ম্য—ত্রিবিধ। ১ম—রোগ মাত্রেরই সমূলে প্রতিকার। ২য়—ব্যবস্থা শ্রবণ মাত্রেই প্রতিকার বিষয়ে কোন সংশয় থাকিবে না।

৩য়—ইহা স্বপ্নাদ্য নহে, পূর্ণ জাগরণে প্রাপ্ত হইলেও ইহাতে একটী পয়সাও ব্যয় নাই।

এখন রোগ বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রোগ-বিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা যাইতেছে যে কতকগুলি রোগ আহূত অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ও কতকগুলি রবাহূত অর্থাৎ রেও। দৃষ্ট দোষ হইতে যে গুলি উপস্থিত হয়, সে গুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং কারণের নির্দ্দেশ করিতে না পারায় অদৃষ্ট হইতে যেগুলি উপস্থিত হয় সেগুলিকে রবাহূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হয় এটী যেমন প্রামাণিক কথা, দৃষ্ট দোষ হইতে যাহা সমাগত হয় সেটীও তদ্রূপ প্রামাণিক। যাহা হ'লে যাহা হয়, তাহা হ'লে তাহা হবে ইহার সন্দেহ কি? অদৃষ্ট দোষই হউক আর দৃষ্ট দোষই হউক, কার্য্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধের প্রতিবন্ধকতা নাই। এখন এইটী স্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে যে নিমন্ত্রিতই বা কয় আনা আর রবাহূতই বা কয় আনা। দু'য়ের সংযোগ হইয়া পাছে ষোল আনার অধিক দাঁড়ায় এই ভয়ে অতিশয় ভীত আছি। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে উপস্থিত রোগ সকলের মধ্যে এগার আনা নিমন্ত্রিত এবং পাঁচ আনা রকম রবাহূত। (নিক্তির বিভিন্নতার দরুণ যদি দুই এক পাই কম বেশ হয়, পাঠক! পূরণ বা ছাঁট করিবেন)। ব্যবস্থার প্রথম দর্শনেই বোধ হইতে পারে যে এ ব্যবস্থা বুঝি কেবল এগার আনার উপরেই খাটে, কিন্তু নিগূঢ় বিবেচনা করিলে প্রায় ষোল আনার উপরেই খাটে দেখা যায়।

রোগ বিভাগের ন্যায় চিকিৎসাও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমরূপ—বারক বা নিবারক (**Preventive**) দ্বিতীয় রূপ—আরোগ্যকর (**Curative**)। প্রথমটী আপন আয়ত্তাধীন, দ্বিতীয়টী ভাবিয়া দেখিলে প্রতিকারের কতক ভাগ আপন আয়ত্তাধীন এবং কতক যেন

চিকিৎসকের হাতে। এই দু'য়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, সেটী বুদ্ধিযোগে বিবেচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক। বারক বা নিবারকের পক্ষ আশ্রয় করিলে আহূত এগার আনা রকম পীড়াগুলি মূলে আসিতেই পারে না।——

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং"

পঙ্কে মগ্ন হইয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই ভাল। লোভাসক্ত হইয়া অদ্য পূর্ণমাত্রা অপেক্ষাও আহার করি, কল্য রেচক ঔষধ ব্যবহার করিয়া সে দোষ ক্ষালন করিব; অদ্য আমোদে মত্ত হইয়া মত্ততার সহকারী মদ্য পান করিয়া কল্য প্রাতে তাহার খোঁযারি ভাঙ্গিব; অদ্য যথেচ্ছা বিহার করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সেবা করি, কল্য কিছু সারবান বস্তু ভক্ষণ করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিব; অদ্য রাত্র জাগরণ করিয়া আমোদ প্রমোদ করি, কল্য দিবা নিদ্রায় তজ্জনিত ক্লেশ দূর করিব ইত্যাদি—এই রূপ আপন সুখের উদ্দেশে যত দুঃখ আহরণ করিতেছি, প্রকৃত দুঃখ আমাদের তত কি না সন্দেহ। মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মজার ভাগ লইয়া যদি সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে তাহাদের পীড়ায় অনেক অবসান হইত। এই সময়ে আমাদের একটা মজার কথা মনে পড়িল। কুক্কুরের কথা, বিড়ালের কথা উচ্চারণ করিলে যেমন কুক্কুর এবং বিড়াল সম্বন্ধীয় কথাই বোধগম্য হয়, "মজার কথা" এই শব্দেও "মজা" সম্বন্ধীয় কথা পাঠক বুঝিবেন, নচেৎ এ প্রস্তাবে মজা আছে এ অভিমানে বলিতে প্রবৃত্ত নহি। "মজা" সুখের নামান্তর মাত্র। অতএব আমরা এক্ষণে "সুখ" শব্দের পরিবর্ত্তে "মজা" শব্দটী ব্যবহার করিলাম। মজা অনন্ত নহে। এ জীবনে ইহার ভাগের পরিমাণ আছে। পরিমিত ভাগ যাহাই হউক তাহা সসীম। স্বাভাবিক নিস্তেজ অবস্থার মজার সীমা দেখা যাইতেছে; সে নিস্তেজভাব,

বার্দ্ধক্য প্রযুক্তই হউক, কি পীড়া প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের শীর্ণতা নিবন্ধনই হউক, উভয় কারণেই মজ্জা সসীম হইয়া পড়ে। সুস্থাবস্থায় আপন প্রাপ্য ভাগ যদি অমিত ব্যবহারে বিনষ্ট করা যায় তাহাকেই "মজ্জা মারা" বলে। যৌবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয় সমস্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলে সকলেরই মজ্জা মারিতে প্রবৃত্তি হয় এবং অনেক যুবার মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়—এখন আমি মজ্জা মারিতেছি। স্বয়ংই যখন কবুল দিতেছেন তখন এক তরফা বিচারে কোন হানি নাই। মনে কর আপন প্রাপ্য মজ্জার পরিমাণ এক সের। সেই একসের যদি সমস্ত জীবনে সংস্থান রাখিয়া বিহিত পরিমাণে মারা যায় তাহা হইলে এককালে মজ্জাশূন্য হইয়া পড়িতে হয় না: আরও এ কথাটী জানিতে হইবে যে মজ্জা আমাদের জীবনপোষক, তাহার অপ্রতুল হইলে এ জীবনে আস্থা থাকে না। আত্মহত্যাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে ঘৃণাপ্রযুক্ত হউক বা ভয়প্রযুক্ত হউক বা ক্রোধপ্রযুক্ত হউক, যে কোন আদি কারণ মূলে থাকুক না কেন, মজ্জার যে একান্ত অপ্রতুলের অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মজ্জার সংস্থান প্রাণপোষক এবং তাহার অভাব প্রাণনাশক। সুতরাং অমিতরূপে মজ্জা মারা= প্রাণ-মারা। অর্থ সম্পত্তিশালী যুবাদলে এই অমিতাচার অধিক দেখা যায়, তাহাতেই বোধহয় উপকরণের অভাব থাকিলে কিয়ৎপরিমাণে মজ্জার সংস্থান থাকিলেও থাকিতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতগণ পীড়াপ্রতিরোধক আহার বিহার বিষয়ে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যেরূপ মিতাচারের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তদনুবর্ত্তী হইলে আমাদের নব চিকিৎসার বহুল সহায়তা হইতে পারে। সুচতুর পাঠক! এক্ষণে ব্যবস্থার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আমরা যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়াছি তাহা ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করিয়া

দেখুন, উক্ত কীর্ত্তনে কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা অলীক বলি নাই, তাহার পুনরুক্তি বাহুল্য বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম।

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম-বিস্তার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহম্মদের টাইফনগরে পলায়ন ও তথাহইতে প্রত্যাগমন—স্বপ্ন, অথবা মহম্মদের সশরীরে দেবলোক পরিভ্রমণ—মদিনাবাসীগণের সহিত সন্ধিবন্ধন—ষড়যন্ত্র—হিজিরা।

আরবগণের পুণ্যাহ মাস পরিসমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এ দিকে মহম্মদের আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা মহাত্মা আবুতালিব লোকান্তরগত; দিব্য সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার দুর্দ্দান্ত শত্রু আবুসোফিয়ন পুনরায় তাঁহার প্রতি কঠোর নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। অনন্যোপায় হইয়া মহম্মদ মক্কার অদূরবর্ত্তী টাইফ্ নগরে পলায়ন করিলেন। স্বীয় অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়া টাইফবাসীগণের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, জনৈক ব্যক্তি উপহাসচ্ছলে মহম্মদকে কহিল "যদি সত্য সত্যই, মহম্মদ! তুমি ঈশ্বর-দূত হইবে তবে মানবের সাহায্যে তোমার কি প্রয়োজন? পক্ষান্তরে যদি তুমি প্রতারক হও, আমরা কেন তোমার সহায়তা করিব?" কায়ক্লেশে একটী মাস তথায় অতিবাহিত করিয়া মহম্মদ পুনরায় মক্কায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ অনুচর জিয়দ্‌সহ গুপ্তভাবে নগরী মধ্যে প্রবেশপুরঃসর অনুগত শিষ্য মুতেব ইবিন আদির ভবনে লুকায়িত হইয়া রহিলেন।

কিম্বদন্তী আছে—শুদ্ধ কিম্বদন্তী কেন, মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণেও উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়—যে মহম্মদ এই সময় এক রজনীতে—সশরীরে স্বর্গে গমন, সুবিশাল দেবলোক পরিভ্রমণ, তেজঃপুঞ্জ পরলোকগত মহাপুরুষ ও অমরবৃন্দের সহিত আলাপ ও কথোপকথন এবং পরাৎপর পরমেশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তি সন্দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে বহুবিধ উপদেশ গ্রহণ করণানন্তর—আল্-বোরাক নামক এক স্বর্গীয় পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই সুগভীর নিশীথেই পুনরায় ধরাতলে অবতরণ করেন। পরদিন প্রত্যুষে এই স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত শিষ্যগণ সমীপে বর্ণিত হইলে অনেকে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কেহ বা বিশ্বাসও করিল, বিরক্ত হইয়া কেহ কেহ তদীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগও করিল। আবুবেকার এই বৃত্তান্তে সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করিলেন। ইদানীং সুবিজ্ঞ মুসলমানগণ কহিয়া থাকেন, স্বর্গারোহণ বিবরণটী প্রকৃত ঘটনা নহে, চিন্তাশীল ধ্যাননিরত মহম্মদের নিশাযোগের স্বপ্নমাত্র। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণের মত এই যে মহাপুরুষের কলেবর ভূতলে ছিল কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ করে; "তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া ছিলেন," একথা সুস্পষ্টরূপে কোরাণে লিখিত নাই। প্রেতবাদীগণের বিশ্বাস যে পরলোকবাসী প্রেতগণ আসিয়া তাঁহার আত্মাকে স্বর্গধামে লইয়া যায়।

মক্কার ১৩৫ ক্রোশ অন্তরে মদিনা অবস্থিত *, তথাকার বহুসংখ্যক ধনাঢ্য আরব, য়িহুদি ও খৃষ্টান বণিকগণ, বাণিজ্যব্যপদেশে মক্কায় আগমন করিলে, একদা মহম্মদ স্বীয় দুর্গ হইতে নিক্রান্ত ও আল্-

* মক্কা হইতে মহম্মদের মদিনায় পলায়ন করিবার পূর্ব্বে এই নগরী যাত্রীব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হিজিরার পর হইতে উহা মদিনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আকাব নামক গিরিমুলে উপস্থিত হইয়া সমবেত মদিনাবাসীদিগের নিকট স্বীয় ধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুগভীর উপদেশে মুগ্ধ ও জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণে পুলকিত হইয়া ধর্ম্ম-ভীরু বণিকগণ মনে করিল, বুঝি ইনিইবা মুসা সদৃশ অলোকসামান্য গুণবিভুষিত কোন মহাপুরুষই হইবেন। পরে মহম্মদ যখন বলিয়া উঠিলেন "আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার ও মুসা-প্রচারিত ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি, তখন দোলায়মানচিত্ত মদিনাবাসীগণ আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল "নিশ্চয়ই ইনি ঈশ্বরের দূত, আমরা ইঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" এই সম্প্রাদায়ভুক্ত বণিকগণের ক্ষমতা মদিনায় অসীম। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে মদিনায় গমন করিবেন মহম্মদ এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন "আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমরা স্বদেশে প্রত্যাগমন পুর্ব্বক সমস্ত ঠিক করিয়া আপনাকে সত্বর সংবাদ দিব, আপনি নিরাপদে তথায় গমন করিবেন।" মহম্মদ অগত্যা সম্মত হইলেন। পাছে ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সুচতুর মহম্মদ তাঁহার সুবিজ্ঞ প্রচারক মুসাব ইবিল ওমিরকে তাঁহাদের সঙ্গে মদিনায় পাঠা-ইয়া দিলেন। মুসাব এক জন কৃতবিদ্য বিচক্ষণ প্রচারক। মদিনায় উপস্থিত হইয়াই পথে পথে তিনি ইস্লামধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পৌত্তলিকগণ প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যপুর্ণ তেজস্বী বাগ্মীতার কাছে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৌত্ত-লিকতা পরিহার পুর্ব্বক একে একে অধিকাংশ ব্যক্তিই মহম্মদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। বিতাড়িত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণও এক এক করিয়া মদিনায় পলাইয়া আসিতে লাগিলেন। মুসাব দেখি-লেন মদিনায় মহম্মদের দল দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে; বৃথা আর

কালব্যয় না করিয়া পরবর্ষে আরবগণের পুণ্যাহ মাস সমাগত হইলে, তিনি অন্যূন ৭০ জন স্বীয় মতাবলম্বী মদিনাবাসী সঙ্গে লইয়া মক্কানগরী মধ্যে দেখা দিলেন। সুগভীর প্রশান্ত নিশীথে আল্ আকাব গিরিমূলে এক সমিতি আহূত হইল। মদিনাবাসীদিগের সহিত মহম্মদ সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। তাঁহারাও পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময় মদিনায় বালিকা হত্যার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। তাঁহাদিগকে মহম্মদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে কেহ ইহজীবনে প্রাণান্তেও আর কখন স্ত্রীহত্যা, শিশু হত্যা, প্রতিমা পূজা, মদিরাপান, চুরি, মিথ্যা কথা প্রয়োগ ইত্যাদি কিছুই করিবে না, এবং তাঁহারা আমরণ মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। আনন্দে গদগদ হইয়া মহ-ম্মদ তাঁহাদিগের হস্তে স্বীয় হস্ত প্রদান করিয়া তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি আজ হইতে তোমাদের হইলাম; তোমাদের বিপদ আপদ আমার নিজের বিপদ আপদ বলিয়া জ্ঞান করিব; তোমাদের সুখে সুখী হইব, অধিক কি মহম্মদ আর মহম্ম-দের নহে, সম্পূর্ণ তোমাদের সত্ব, তোমাদের রক্তমাংস আমার ও আমার তোমাদের।"

"কিন্তু প্রভো! যদি আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমরা অকালে প্রাণ হারাই, আমাদের গতি কি হইবে?"

"সেই আনন্দ নিকেতনে গমন; অক্ষয় স্বর্গবাস!"

সন্ধি পত্র ত্বরায় স্বাক্ষরিত হইল। মহম্মদ দ্বাদশ শিষ্য মনোনীত করিয়া মদিনায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। এই সময় সন্নিহিত গিরিতুঙ্গ হইতে সহসা এক দৈববাণী সকলের কর্ণগোচর হইল। বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে কে যেন চিৎকার শব্দে বলিয়া উঠিল "দুর্ম্মতিগণ! মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া মদিনায় যাইবার

জন্য অগ্রসর হ' ; যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, আমার নিষেধ বাক্য শ্রবণ কর, মক্কা ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার জন্য একপদ অগ্রসর হইলে এই লগুড় প্রহারে তোদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব।" অসীমসাহসী পুরুষগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহম্মদ অমনি কহিলেন "ভ্রাতৃগণ! দৈববাণী শুনিয়া তোমরা কি ভীত হইলে? এ ত সয়তানাধম ইবলিসের বাক্য। নির্ব্বোধেরাই সয়তানের কথা শুনিয়া ভীত হয়, আমি শপথ করিয়া কহিতেছি সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর তোমাদের সহায়, শঙ্কার কিছুমাত্র কারণ নাই। তোমরা বীরের সন্তান; বীরদর্পে পৃথিবী কাঁপাইয়া অগ্রসর হও।" যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন করিয়া মহম্মদ একে একে সকলকেই বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং মদিনাবাসীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে স্বীয় দুর্গমধ্যে প্রবেশ পুরঃসর নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছু দিন পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গোপনীয় নিশীথ সভা ও মদিনাবাসীগণের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধনের তাবৎ বৃত্তান্তই সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। খোরিসগণ-প্রেরিত-চর সেই রাত্রে আল্ আকাব পর্ব্বতগুহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করে এবং তৎকর্ত্তৃকই উক্ত রজনীর সেই ভীষণ দৈববাণী সম্পাদিত হয়। কিন্তু চর স্বীয় অভীষ্ট সাধনে বিফলমনোরথ হইয়া পরদিবস প্রত্যূষে খোরিসগণ সমীপে সমস্তই প্রকাশ করিয়া দেয়।

আবুসোফিয়ন এখন মক্কার শাসনকর্ত্তৃপদে সমারূঢ়, মদিনাবাসীগণের সহিত মহম্মদের সন্ধিবন্ধনের বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে এক সভা আহূত হইল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন যে নগরী হইতে মহম্মদকে চিরজীবনের মত নির্ব্বাসিত করা হউক। কিন্তু এ প্রস্তাব সুর্ব্ববাদী সম্মত হইল না, "নগরীর

বহির্ভাগস্থ কোন নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি স্বেচ্ছামত নিরুপদ্রবে স্বীয় অভীষ্ট সংসাধন করিয়া লইতে পারিবেন,” এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইল। “ তবে প্রাচীরের সহিত তাঁহার শরীর গাঁথিয়া রাখা হউক, যতদিন মৃত্যু না হইবে প্রতিদিন জীবন-ধারণোপযোগী আহার প্রদান করা যাইবে ” এ প্রস্তাবও অনুমোদিত হইল না। পরিশেষে আবুজান কহিলেন “ মহম্মদকে হত্যা করিয়া নগরী নিষ্কণ্টক করিতে হইবে।” প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই এই প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করিল। সকল পরিবারের এক এক ব্যক্তি সমবেত হইয়া অস্ত্রাঘাতে মহম্মদের প্রাণসংহার করিবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে দিবাবসানে ষড়যন্ত্রকারীগণ অস্ত্র সস্ত্র লইয়া তাঁহার ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বাহ্নে গুপ্তদূত প্রমুখাৎ এই সমিতি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, মহম্মদ অগ্রেই সতর্ক হইয়াছিলেন। বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্বৃত্তগণ দেখিল দ্বার দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ। তাহারা দ্বারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প দেখিতে পাইল যে মহম্মদ হরিদ্বর্ণ একখণ্ড বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া একাকী খট্টোপরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া মহম্মদ-শোণিত-লোলুপ নররাক্ষসগণ বন্যার সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। নিদ্রিত ব্যক্তি দ্বার-ভঙ্গ-শব্দে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল নিদ্রোত্থিত মহম্মদ নহেন, তাঁহারই প্রিয় অনুচর আলি। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া দলপতি জিজ্ঞাসিল “ তুই কে? আর তোর মহম্মদই বা কোথায়? ”

“ জানি না ” তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়া আলি দ্রুতপাদবিক্ষেপে নিমেষমধ্যে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। সাহস করিয়া কেহ আর তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়

স্তম্ভিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। আর মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া মহম্মদ গুপ্তভাবে স্বীয় আবাসের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আবুবেকারের ভবনে উপস্থিত হইলেন। আবুবেকারের সহিত সেই রাত্রেই তথা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কার অনতিদূরবর্ত্তী তৌর-নামক গিরিগুহাভ্যন্তরে লুকায়িত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের অনু-সরণ করিতে করিতে ষড়যন্ত্রকারীগণও তৌরপর্ব্বতমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলাহল শ্রবণে ভীতচিত্ত হইয়া আবুবেকার মৃদু স্বরে বলিলেন, "হায়! এইবার বুঝি মরিলাম, আমরা সবে মাত্র দুইজন, কিন্তু শত্রুর সংখ্যা দেখিতেছি অনেক।"

"কে বলিল আমরা দুইজন? সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদের সহায়। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা তিনজন।" শত্রুগণ গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিল এক নবীন ঊর্ণনাভ গুহাপ্রেবেশপথে এক সুন্দর জাল নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা ভাবিল এ অতি নিভৃত প্রদেশ, মনুষ্য সমাগমের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছেনা; গুহামধ্যে মনুষ্য প্রবেশ করিলে অবশ্যই ঊর্ণনাভের এই নববিনির্ম্মিত জাল ছিন্ন হইয়া যাইত। এইরূপে প্রতারিত হইয়া তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মহম্মদ ইত্যগ্রে বলিয়াছেন "আমরা দুই নহি, সর্ব্বশুদ্ধ তিন জন।" তাঁহার বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য, অল্পবিশ্বাসী আবুবেকার এখন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন। এক ঈশ্বরের করুণার নিকট সমগ্র ভূমণ্ডল শুদ্ধ ব্যক্তির তাড়না, প্রকাণ্ড সমুদ্রজাত বুদবুদের ন্যায় যে ক্ষণস্থায়ী, আবুবেকার এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা তিন দিন সেই গহ্বর মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। রজনীযোগে বেকা-রের কনিষ্ঠা কন্যা আসেমা তাঁহাদের জন্য আহার আনয়ন করিত। চতুর্থ দিবসে এক উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মদিনাভিমুখে পলায়ন করেন। খোরিসিয়গণ তন্ন তন্ন করিয়া গিরি, উপত্যকা, বন, উপবন,

প্রান্তর প্রভৃতি অতি নিভৃত প্রদেশ সমূহ অন্বেষণ করণানন্তর হতাশ হইয়া আবুসোফিয়ন সমীপে প্রত্যাগমন করিল। সত্বর মক্কানগরী মধ্যে এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল যে, যে কেহ মহম্মদকে সজীব বা নির্জীব অবস্থায় আবুসোফিয়ন সমীপে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে, ধৃতকারী ব্যক্তি পুরস্কার স্বরূপ সেই মুহূর্ত্তে শতাধিক উষ্ট্র প্রাপ্ত হইবে। পারিতোষিক বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র সোরেকা ইবিন মালিক নামক জনৈক বলদৃপ্ত সৈনিক পুরুষ কতিপয় অশ্বসাদী সঙ্গে লইয়া মহম্মদের অন্বেষণে বাহির হইল। কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল যে মহম্মদ ও আবুবেকার দ্রুতগামী দুই উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লোহিত সাগরোপকূল অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে অশ্বপৃষ্ঠে কসাঘাত করিয়া তীর-বেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইল এবং এক লম্ফে যেমন মহম্মদের উষ্ট্রের গ্রীবাদেশ ধারণ করিতে যাইবে, অশ্ব উষ্ট্রের বিকটাকার শরীর দর্শনে ভীতচিত্ত হইয়া আরোহী সমেত ভূতলশায়ী হইল। সৈনিকেরসুদৃশ্য বপু ক্ষত বিক্ষত ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া গেল। কুসংস্কারপ্রণোদিত হইয়া সোরেকা ভাবিল "এ একটী কুলক্ষণ দেখিতেছি; না আমার পুরস্কারে কাজ নাই, মহম্মদকে ধরা হইবে না।" সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর মহম্মদ তাঁহার কুসংস্কারপূর্ণ অন্তরে এমনি ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিলেন যে পরিশেষে সোরেকা তাঁহার পাদ প্রান্তে পতিত হইয়া সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নিরুপদ্রবে কিছুদিন পর্য্যটনের পর তাঁহারা মদিনা সন্নিহিত কোবা নামক এক পরম রমণীয় পর্ব্বতমূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই প্রীতিপ্রদ পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ভগবৎ প্রেমে পুলকিত হইয়া তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিতে মানস করিলেন। মদিনা

হইতে ন্যূনাধিক একশত ব্যক্তি এস্থানে আগমন করিয়া মহম্মদের সহিত সম্মিলিত হইল। সল্‌মান নামক এক কৃতবিদ্য পারসীক এই সময় মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি ইস্‌পাহানে জন্ম পরিগ্রহ করেন, পৌত্তলিকতার প্রতি বীতরাগ হইলে পবিত্র ধর্ম্ম অন্বেষণার্থ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরে এক ভক্তিভাজন বৃদ্ধব্যক্তি প্রমুখাৎ অবগত হন যে আব্রাহাম প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্ম সংস্কার জন্য মক্কানগরীতে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই মহাপুরুষ এখন মদিনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারই অনুসন্ধানে বাহির হন, অনেক দিবস পর্য্যটনের পর এই গিরিমূলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। কোরাণ রচনা কালে তিনি মহম্মদকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া মহম্মদ নগরী মধ্যে সদনে প্রবেশ করিতে মানস করিলেন। দিনস্থির হইল। শুক্রবাসরের শুভলগ্নে মদিনায় প্রবেশ করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন, এবং অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সেই শুভদিনে শুভক্ষণে পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনা সাঙ্গ করিয়া " ইস্‌লাম ধর্ম্ম কি ? " অতি সহজে ও সংক্ষেপে সুমধুর স্বরে তাঁহার শিষ্যগণকে বুঝাইয়া দিলেন। আহা! তৎকালের সৌন্দর্য্য আর কি বর্ণনা করিব! কোবা পরম রমণীয় স্থান; যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ শ্রেণীবদ্ধ পাদপ সমূহ ফলভরে অবনত, পর্ব্বতসম্ভবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ঝিরঝির বারিপতন শব্দ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর কুলকুল ধ্বনি, যেন শ্রবণবিবরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল। প্রভাত হইয়াছে, পূর্ব্ব

ভাগের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। সুন্দর বিহঙ্গমগণ ঝাঁকে ঝাঁকে শাখা উপরি উপবিষ্ট হইয়া কূজন করিতেছে—প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি ভক্তি প্রেমে গদগদ হইয়া সারি গাঁথিয়া বসিয়া আছেন, থাকিয়া থাকিয়া নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে; নয়ন নিমীলিত, করদ্বয় যুক্ত, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এক স্থানে মিলিত, কিন্তু একটী শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। ইহলোকে থাকিয়া যদি কেহ স্বর্গের পবিত্রতা ও কমনীয় কীর্ত্তি পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষী হন্, তিনি স্বীয় কল্পনাপটে একবার কোবা পর্ব্বতের সেই শুভ দিনের উপাসনার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ দৃশ্যটী অঙ্কিত করুন। স্বর্গের প্রকৃত ছবি মহম্মদ কোবা গিরিমূলে তাঁহার শিষ্যগণকে একদিন দেখাইয়াছিলেন।

বোরেদ ইবিন্ আন্ হোসেব নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মস্তক হইতে স্বীয় উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা এক পতাকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং মহম্মদকে অন্যূন ৭০ জন অশ্বারোহী দ্বারা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পুরোভাগে পতাকাদ্বয় ধারণ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শত শত ব্যক্তি মহম্মদকে চাক্ষুস দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া নগরী মধ্যে লইয়াগেল। কে বলিবে মহম্মদ পলাতক? তাঁহার এই রূপ আশাতীত সম্মান ও সমাদর দেখিয়া কে আর বলিতে পারে তিনি মক্কা হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন? মহম্মদ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাট ও অমিততেজা যোদ্ধৃ পুরুষের ন্যায় জয়োল্লাসে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া মহাসমারোহ সহকারে স্বীয় পারিষদ ও দলবলে পরিবৃত হইয়া নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সকল শ্রেণীর ব্যক্তি

সকল সময় সুবিধামত যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে এই জন্য এক নিম্নতল গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে আলি, আয়েসা প্রভৃতি আবুবেকারের পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তি পথ পর্য্যটনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও শীর্ণকলেবর হইয়া মদিনায় উপনীত হইলেন। সশিষ্যে মক্কা হইতে মহম্মদের মদিনা পলায়ন দিবসাবধি মুসলমানেরা এক শাক গণনা করিয়া থাকে। ইহাই হিজিরা নামে প্রসিদ্ধ। ৬২২ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসের ২৪শে হইতে হিজিরার গণনা আরম্ভ হয়। এই সাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত। আজ ১২৮৭ বৎসর প্রায় অতীত হইতে চলিল মহম্মদ সহচর ও অনুচর বর্গ সহিত মদিনায় পলায়ন করিয়াছেন।

মেঘ।

সকল কালে সকল অবস্থার বায়ুতে বাষ্প থাকে এবং ঐ বাষ্প হইতেই শিশির মেঘ কোয়াসা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে শিশির শীর্ষক প্রস্তাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। উহাদের উৎপত্তি এক প্রকারেই হইয়া থাকে; বস্তুতঃ মেঘ কুজ্‌-ঝটিকাদি স্বাভাবিক জলের অবস্থা ভেদ মাত্র। যদিও শিশির ও মেঘ এক কারণেই উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাদের প্রণালী ভেদ আছে। পৃথিবী হইতে সায়াহ্নিক উত্তাপ বিকীরণে শিশির জন্মায়; আমরা এক্ষণে মেঘাদির সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করিব এবং শিশির হইতে যে বিভিন্ন নিয়মে উহা উৎপন্ন হয় তাহাও দেখাইবার চেষ্টা পাইব।

বিজ্ঞানালোকে দেখিতে গেলে মেঘ ও কুজ্ঝটিকা একই পদার্থ। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই এরূপ বিশ্বাস আছে যে উহারা স্বতন্ত্র অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোন সংস্রব নাই, সাধারণতঃ কোন সাদৃশ্যও লক্ষিত হয় না। এ প্রদেশে কোয়াসা শীতকালেই অধিক দৃষ্ট হয়, গ্রীষ্মকালে প্রায়ই হয় না। আবার গ্রীষ্মের শেষে যেরূপ প্রচুর মেঘ জন্মায় শীতকালে তদ্রূপ নহে। আমরা কোয়াসা স্পর্শদ্বারা অনুভব করিতে পারি। মেঘ সময়ে সময়ে ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বর্ণ ধারণ করে, কোয়াসা যতক্ষণ আমরা দেখিতে পাই ততক্ষণ সমভাবেই থাকে, সুতরাং এই দুই পদার্থ বিভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

অনেকে এ কথাও বলিতে পারেন যে যদি মেঘ ও কোয়াসাতে কোন বৈলক্ষণ্য নাই তবে কোয়াসা এত অল্পক্ষণস্থায়ী কেন? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে, যে কারণে সূর্য্যোদয় হইলে শিশির অদৃশ্য হয় কোয়াসাও সেই কারণে বিলীন হয়। কোয়াসা ও মেঘ এক পদার্থ বলিলে এই বুঝাইবে যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে উহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ও উহাদের উৎপত্তির কারণ সমান। যাঁহারা পার্ব্বতীয় প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, শিম্‌লার পাহাড়ে বা দারজিলিঙে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা স্পর্শদ্বারা মেঘ অনুভব করিয়া থাকিবেন। মেঘ ও কোয়াসায় প্রভেদ এই যে কোয়াসা পৃথিবীর অতি সন্নিকটেই উৎপন্ন হয় এবং শূন্যমার্গে কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে কোয়াসা জন্মায় তাহাকেই মেঘ বলিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উত্তাপের তারতম্যানুসারে বায়ুর জলকণাধারণশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এ নিয়ম আমরা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, যখন ফারণহাইট তাপমানের (যে তাপমান যন্ত্র সচরাচর লোকের বাটীতে

দেখিতে পাওয়া যায়) ৫০ ডিগ্রী উত্তাপ হয় অর্থাৎ যখন উত্তাপ প্রভাবে তাপমানস্থ পারদের অগ্রভাগ ৫০ অঙ্কিত দাগে দৃষ্ট হয়, তখন ১৬৮ গ্যালন শুষ্ক (অর্থাৎ বাষ্প শূন্য) বায়ু ১৫০ গ্রেণ বাষ্প ধারণ করিতে পারে। ৫০ ডিগ্রী উত্তাপ হইলেই যে ১৬৮ গ্যালন বায়ুতে ১৫০ গ্রেণ বাষ্প থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই, উহা অপেক্ষা ন্যূনও থাকিতে পারে, অধিক কখনই নহে। যখন কোন স্থানে বায়ু যথা-সাধ্য বাষ্প ধারণ করে তখন ঐ বায়ুকে বাষ্প "পূর্ণ" (Saturated) বলে। ইংরাজী (Saturated) শব্দ "পূর্ণ" বাচ্য। কিয়ৎ-পরিমাণে পরিষ্কার শর্করা লইয়া ক্রমে ক্রমে এক গেলাস জলে ফেলিলে যতক্ষণ না সেচুরেটেড্ হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলের অবস্থাভেদ হইবে না। আবার যদি উত্তাপ ৫০ ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ঐ ১৬৮ গ্যালন বায়ুতে ১৫০ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক বাষ্প থাকিতে পারে এবং উত্তাপ হ্রাস হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিবে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যদি কোন রূপে ১৬৮ গ্যালন বায়ু শুষ্ক করণানন্তর কোন আবৃত পাত্রে প্রবেশ করাইয়া ঐ পাত্রের উত্তাপ ৫০ ডিগ্রী রাখা যায় এবং অপর একটী পাত্রে জল গরম করিয়া প্রথ-মোক্ত পাত্রে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রে ১৫০ গ্রেণ বাষ্প প্রবেশ করিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উহা অপেক্ষা অধিক একবারে প্রবেশ করিতে পারে কি না? ইহার উত্তর এই যে ১৫০ গ্রেণ অপেক্ষা যত অধিক বাষ্প প্রবেশ করিবে ঐ বাষ্প বাষ্পরূপে থাকিতে পারিবে না, উহা প্রবিষ্ট হইয়াই জলবিন্দুরূপে পাত্রের গাত্রে পড়িবে। কিন্তু যদি ঐ পাত্রের উত্তাপ কমিয়া যায় তাহা হইলে ঐ ১৫০ গ্রেণ বাষ্পও থাকিতে পারিবে না। উত্তাপের হ্রাসানুসারে বাষ্পও কমিয়া যাইবে। মনে কর কমিয়া গিয়া যদি ১৩০ গ্রেণ হয় তাহা হইলে অবশিষ্ট

২০ গ্রেণ বাষ্পের অবস্থা কি হইবে? ঐ ২০ গ্রেণ বাষ্প পুনরায় জলকণারূপে পরিণত হইয়া পাত্রে দৃষ্ট হইবে। আবার যদি ৫০ ডিগ্রী উত্তাপ সমান রাখিয়া শুষ্ক বায়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ ১৬৮ গ্যালন অপেক্ষা অধিক বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে ১৫০ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক বাষ্প থাকিবে।

উপরি লিখিত পরীক্ষাগুলি বিশদ রূপে বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নে সচরাচর দৈনিক ঘটনা হইতে কয়েকটী ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইব। তৎপাঠে উহাদের সহিত মেঘোৎপত্তির কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

শীতকালে হাই তুলিলে মুখ হইতে ধূম নির্গত হয়, গ্রীষ্মকালে হয় না। ইহার কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। বলা বাহুল্য যে আমাদের শরীর হইতে ঘর্ম্মাদিরূপে জল অনবরত বহির্গত হইতেছে। আমরা যখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করি তখনও অন্যান্য পদার্থের (Carbonic Acid gas) সহিত ফুসফুস্ হইতে জল বাষ্পরূপে বহির্গত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদি কোন রূপে বাষ্পের উত্তাপ কমিয়া যায় তাহা হইলে ঐ বাষ্প আর বাষ্প রূপে থাকিতে পারে না। শীতকালে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তাপ অপেক্ষা বহির্ব্বায়ুর উত্তাপ অনেক কম এবং বাষ্প যতক্ষণ না মুখ হইতে নির্গত হয় ততক্ষণ উহার উত্তাপ বহিঃস্থ বায়ুর উত্তাপ অপেক্ষা অধিক থাকে, সুতরাং বহির্গত হইয়াই শীতল হইয়া অতি সূক্ষ্ম জলকণাসমূহরূপে দৃষ্ট হয়; যদিও দেখিতে ধূমের ন্যায় অতি তরল কিন্তু বস্তুতঃ উহা জলকণাসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্ষাকালে কখন কখন এত সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে যে হঠাৎ দেখিলে ধূম বলিয়া ভ্রম হয়; উহাকে কি বৃষ্টি বলিব না? না উহা জল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ? শীতকালেও ঠিক ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

অন্যান্য কালে বহির্বায়ুর ও আমাদের আভ্যন্তরিক উত্তাপে প্রভেদ অতি কম, সুতরাং অন্যান্য কালে সচরাচর হাই তুলিলে ধূম দৃষ্ট হয় না।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই কলের গাড়ি চড়িয়াছেন। যখন গাড়ি চলিতে আরম্ভ হয় তখন এন্‌জিন্‌ হইতে ধূমরাশি নির্গত হয় ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দেখিয়াছেন। উহা কি? অনেকেই বলিবেন কয়লার ধূম, কারণ যতক্ষণ গাড়ি চলে ততক্ষণ কয়লাখণ্ড গাত্রে উড়িয়া পড়ে; সত্য বটে কয়লা খণ্ডও নির্গত হয় কিন্তু উহার অধিকাংশই জলবাষ্প। বলা অনাবশ্যক যে কলের গাড়ির অপর নাম "বাষ্পীয় রথ" অর্থাৎ বাষ্প প্রভাবে কলের গাড়ি চলে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ কল হইতে আকাশে কৃত্রিম "মেঘ" নিক্ষিপ্ত হয়। "মেঘ" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নিম্নলিখিত ঘটনার সহিত মেঘোৎপত্তির এতদূর নিকট সম্পর্ক আছে যে মেঘ বলিলে অত্যুক্তি বা দোষজনক হইবে না। বিশেষ মনোযোগ করিলে দেখিতে পাইবেন যে চোঙের (Chimney) মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ প্রস্তুত হইতেছে ও যথায় মেঘ জন্মিতেছে চোঙের অগ্রভাগ হইতে তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান কখন কখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও ফাঁকা দেখা যায়। চোঙ হইতে যে দ্রব্য উত্থিত হইয়া মেঘ জন্মাইতেছে ঐ পদার্থকে অবশ্যই ফাঁকা স্থান দিয়া যাইতে হইতেছে। তবে এই পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে যাহা একক্ষণে অদৃশ্য ও স্বচ্ছ থাকে এবং পরক্ষণেই গভীর অস্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হইয়া দৃষ্ট হয়? কল হইতে যে বাষ্প নির্গত হয় তাহাই সেই পদার্থ। যতক্ষণ কলের ভিতর থাকে ততক্ষণ ঐ বাষ্প স্বচ্ছ ও অদৃশ্য থাকে, কিন্তু ঐ অবস্থায় থাকিতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপে জল বাষ্প হয় অন্ততঃ সেই উত্তাপ আবশ্যক, বহির্গত হইয়াই শীতল বায়ুর সংযোগে বাষ্পরূপ পরিত্যাগ

করিয়া ধূলার ন্যায় শূন্যমার্গে ভাসিতে থাকে, ইহাকেই মেঘ কহে। এবং ভূমণ্ডলে মেঘ এইরূপেই জন্মিয়া থাকে।

আবার ঐ কৃত্রিম মেঘের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে উহা তরল হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলীন হয় এবং কোন কোন দিন মেঘ জন্মিয়াই মিশিয়া যায়, কোন কোন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ থাকে। যে দিন বায়ুতে অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে (যথা বর্ষাকালের দিনে) সেদিন অধিকক্ষণ থাকে, এবং গ্রীষ্মকালের দিন শীঘ্রই অদৃশ্য হয়। এন্‌জিন্ হইতে যে বাষ্প বহির্গত হয় তাহার পরিমাণ, তৎসংলগ্ন বায়ুতে যতদূর বাষ্প অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক; সুতরাং প্রথমে বাষ্প বহির্গত হইয়াই গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু এই ভূমণ্ডলে বায়ু প্রায়ই বাষ্প "পূর্ণ" থাকে না, সুতরাং ঐ মেঘ শূন্যমার্গে যত বিচলিত হইতে থাকে ততই নানা দিগস্থ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অদৃশ্য হয়। গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হেতু বায়ুর বাষ্পধারণশক্তি বৃদ্ধি হয়, অথচ বাষ্পের ভাগ অল্প থাকে, সুতরাং এই দুই কারণ একত্রিত হওয়ায় এন্‌জিন্ হইতে মেঘ প্রস্তুত হইয়া শীঘ্রই মিলিয়া যায়। বর্ষাকালের কার্য্য ইহার বিপরীত। যাঁহারা ময়দার বা সুরকির কলের পার্শ্ব দিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহারা অত্যন্ত রৌদ্রের সময়েও কলের নিম্ন দিয়া যাইবার সময় বৃষ্টি অনুভব করিয়া থাকিবেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রস্তাব পাঠে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। মেঘ ও বৃষ্টি, আমরা আবার বলি, এইরূপেই হইয়া থাকে।

আমরা আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। শীতকালে যতক্ষণ গৃহের দ্বার সারসি জানালাদি বন্ধ থাকে, ততক্ষণ গৃহটী গরম ও তাহার ভিতরস্থ বায়ু পরিষ্কার থাকে। কিন্তু হঠাৎ দ্বার কিম্বা জানালা

খুলিলে দিলে গৃহ মধ্যস্থ বায়ু কলুষিত হয় অর্থাৎ গৃহের মধ্যে ধূমের ন্যায় পদার্থ লক্ষিত হয়। বহিঃস্থ শীতল বায়ু সংযোগে গৃহমধ্যবর্ত্তী বায়ুস্থিত বাষ্প বারিবিন্দুরূপে পরিণত হওয়ায় ঐরূপ অপরিষ্কার বোধহয়।

উপরি উক্ত কয়েকটী দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মেঘোৎপত্তির পক্ষে উত্তাপ আবশ্যক। উত্তাপের প্রভাবে জল গরম হইয়া বাষ্প হইবে এবং ঐ বাষ্প শীতল হইয়া বারিরূপে পরিণত হইবে। এই জগতে এমন কি উত্তাপকারণ আছে যাহাতে মেঘোৎপত্তি হয়?—তেজোময় দিবাকর।

ক্রমশঃ

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মায়া-তরু। (A Musical Melange) শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত—ন্যাশন্যাল থিয়েটরে প্রথম অভিনীত। কাব্য-কাননের এটী একটী অভিনব ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। ইহাতে আর কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, কেবল লিখিত বিষয়টী আরও কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভাল হইত। বিধাতার শোভাময়ী সৃষ্টিতে রমণীই পুরুষের প্রকৃত সুখাধার, পুরুষ স্বভাব-সৌন্দর্য্যে যতই বিমোহিত হউক না কেন, নারী অভাবে হৃদয়ে কি-যেন কি-যেন অভাব অনুভব করে, প্রাণের সে অভাব আর কিছুতেই পুরণ হয় না। কবি এ গুলি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানির কোন কোন স্থান এমন সুন্দর হইয়াছে যে পাঠকালীন বোধ হয় যেন কোন রমণীয় স্থানে নীত হইয়া বিনম্রা প্রকৃতির বিমোহিনী শোভা সন্দর্শন করিতেছি এবং কে যেন ললিততানে চিত্ত বিনোদন করিতেছে। ইহার সঙ্গীতগুলি এমন সুন্দর যে তাহার দুই একটী উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না:——

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি,
অমিত প্রাণ দেবনা, প্রাণ নেবনা, আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা বেড়াই সদাই অভিলাষী,
তারা তুলে প'রবো চুলে, ক'রবো চুরি চাঁদের হাসি॥

বেহাগ—খেম্‌টা।

প্রাণভ'রে প্রাণ শোভা হেরে, তবু কেন সাধ মিটেনা।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে, কি যেন প্রাণ আর পাবেনা।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে, কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারুসনে, সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া পথে, কে যেন কোথা হ'তে,—
মধুর হাসে, মধুর ভাবে, হাসে ভাবে আর ভাবেনা।

তিল-তর্পণ নাটক। শ্লেষ কাব্য। কাব্যখানি বিলক্ষণ হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে লেখকের প্রকৃত মর্ম্ম সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সুগম বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে তাঁহারা অনেকে সর্ব্বসাধারণের পরিচিত নহেন এবং তাঁহাদের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধেও অনেকে অনভিজ্ঞ। যদি সর্ব্বজনবিদিত ঘটনাবলি লইয়া এরূপ একখানি কাব্য লিখিত হইত তাহা হইলে সেখানি উৎকৃষ্ট শ্লেষ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। যাহা হউগ্, পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। পাঠ করিয়া বোধ হইল যে, গ্রন্থকারের হাস্যরসোদ্দীপনে বা ব্যঙ্গোক্তিকরণে বিশেষ পারদর্শিতা আছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন কালীন ইহার প্রতি কথায়, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি গীতে এবং নৃত্যের প্রতি অঙ্গ ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না।

সতীত্ব-রক্ষিণী কাব্য। শ্রীঅঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কোন পাপাশয় দুর্ম্মতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোন বিধবা যুবতী সতীত্ব রক্ষার্থ যমুনার জলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখক এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি বড় মন্দ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হইলাম লেখক অন্ধ; অন্ধ ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাই আনন্দের বিষয়।

উর্ম্মিলা কাব্য। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। এই কাব্য খানিতে উর্ম্মিলা দেবী বনবাসিনী সীতা দেবীর উদ্দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেক স্থলে স্বামীবিরহজনিত খেদোক্তির প্রকাশ থাকিলেও সেগুলি মনকে ততদূর আকৃষ্ট করে না। কুল-বালাদিগের উক্তিটী সুন্দর বটে কিন্তু উর্ম্মিলা কাব্যে ইহা সন্নিবেশিত কেন?

আড়বেলিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ। (১২৮৭ সাল) এই সভাব উদ্দেশ্য গুলি যে মহৎ তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার অনেকগুলি কার্য্যের ন্যায় এটীও "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" বোধ হইল। দেখা গেল এই সভার সাতটী উৎকৃষ্ট বিভাগ আছে; যথা ১ম দরিদ্র বালকগণের শিক্ষা, ২য় পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ দান, ৩য় স্ত্রীশিক্ষা, ৪র্থ দরিদ্র বিধবা ও শিশু সন্তানগণকে অর্থসাহায্য দান, ৫ম আড়বেলিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সাহিত্য শাখা, ৭ম সাধারণ পুস্তকালয়। কার্য্যের ফল প্রথম বিভাগে কেবল মাত্র ৭৲ টাকা ব্যয়; দ্বিতীয় অপর কোন ব্যক্তির উপর বরাৎ; তৃতীয় অদ্যাবধি স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু ২৩৫।/১০ আয়ের মধ্যে ১১৪।০ উদ্বৃত্ত; চতুর্থ বিভাগ সম্বন্ধেও সমান কথা; পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগে কিঞ্চিৎ কার্য্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু বক্তৃতা বহ্বারম্ভের প্রকৃত চিহ্ন। আমাদের দেশে বাক্যের অভাব নাই কার্য্যেরই অভাব, সুতরাং সাধারণ সমাজ মাত্রেরই কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক, বক্তৃতাদ্বারা কার্য্যের প্রত্যাশা অল্প।

মৃণাল মালিনী বা অবলা না প্রবলা—বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য।—শ্রীবিপিন বিহারি দে ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই, কিন্তু ইহার প্রকৃত সমালোচনা করিতে আমরা সাহসী নহি। কারণ প্রকাশকদ্বয় বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজের চক্ষে পুস্তকখানিকে নিশ্চয়ই গুণপূর্ণ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধহয়, বাস্তবিক তাই কি না, আমরা পাঠকবর্গের উপর সে বিচারের ভার দিলাম।

কিরণময়ী।

১১

১০। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বাটীতে বিশ্বেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মালতী নামে তাঁহার একটী কন্যা ছিল। মালতী জন্মদুঃখিনী, সে যখন ছয়মাসের তখন তাহার মাতার কাল হয়। একে প্রিয়তমা ভার্য্যার দুর্ব্বিসহ বিয়োগ বেদনা, তাতে আবার দুগ্ধপুষ্যা মালতীর লালনপালনের ভাবনা বিশ্বেশ্বরকে সাতিশয় কাতর করিয়া তুলিল। বিশ্বেশ্বরের সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

শশিকুমার বিশ্বেশ্বরের শ্বশুর ; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান কিছুরই অপ্রতুল দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় কেহই পায় নাই। কেহ কেহ বলে শশিকুমার বাবুর ন্যায় দয়ালু লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না, আবার কেহ কেহ বলে অমন নির্ম্মমব্যক্তি এ জগতে আর দুটী নাই। যাহা হউগ্, পরের কথায় আবশ্যক নাই, আমাদের মালতীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, দেখা যাউগ্।

কিছুদিন যায় ; বিশ্বেশ্বর মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী যাইয়া মালতীকে দেখিয়া আসেন। একদিন, দৈবের দুর্ব্বিপাক বশতঃই হউগ্, অথবা আপন দুরদৃষ্ট বশতঃই হউগ, কিম্বা দয়ালু বা নির্ম্মম শশিকুমারের অভুতপূর্ব্ব ব্যবহার প্রযুক্তই হউগ, মালতী মাতুলালয় হইতে দূরীকৃতা হইয়া পিতৃভবনে প্রেরিতা হইল। বিশ্বেশ্বর কিছুই জানেন

না, হঠাৎ মালতীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ শশিকুমারের ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া হতভাগিনী মালতীর মন্দভাগ্যের উপর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। যে লোক মালতীকে আনিয়াছিল, বিশ্বেশ্বর তাহাকে বালিকা মাতৃহীনা মালতীর প্রতি শশিকুমারের এতাদৃশ নৃশংসতাচরণের কারণ গোপনে জিজ্ঞাসা করিলে সে অনেক কথা বলিয়া শেষে বলিল "তোমার ছেলে তুমিত আবার পাইলে, সেই ভাল, আর অধিক কথায় আবশ্যক কি?" বিশ্বেশ্বরের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, শ্বশুরের প্রতি কোন দোষারোপ না করিয়া মালতীর অদৃষ্ট দোষেই ইহা ঘটিল, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন, এবং অবশেষে স্থির করিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, যত কষ্টই হউগ, মালতীর লালনপালনের ভার আমিই লইব।"

পাঠক! শশিকুমার যেরূপ প্রকৃতিরই লোক হউন না কেন, আমাদের মালতীর প্রতি তিনি যে সদ্ব্যবহার করিলেন না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমার কৌতূহল জন্মিতে পারে অমন বিজ্ঞ লোক কেন এমন কর্ম্ম করিলেন, অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। সত্য, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না বটে, কিন্তু যে কোন কারণই থাকুক না কেন, ছয়মাসের বালিকা চল্লিশবৎসরাতীত বিজ্ঞ লোকের নিকট কোন অপরাধেই অপরাধিনী হইতে পারে না; তবে যদি অন্য কাহার অপরাধের জন্য মালতীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বিজ্ঞতার পরিচয় পায় নাই। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড, কোন্ যুক্তি সঙ্গত?

বিশ্বেশ্বর এখন হইতে মালতীকে এরূপ যত্নের সহিত লালনপালন করিতে লাগিলেন যে, মালতী যে মাতৃহীনা তাহা সে একদিনের জন্যও জানিতে পারে নাই।

হতভাগিনী মালতী সুন্দরী ছিল, এবং পিতার প্রযত্নে দিন দিন

শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। যথাকালে বিশ্বেশ্বর মালতীর বিবাহ দিলেন, এবং ভাবিলেন "এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলাম।" বিধাতা যাহার কপালে দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহাকে কে সুখী করিতে পারে? মালতীর অদৃষ্ট দুঃখময়—চিরঅন্ধকারাবৃত! বিশ্বেশ্বর যখন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন জামাতা লেখাপড়া করিত, স্বভাব চরিত্রও ভাল ছিল, কিন্তু সময়ক্রমে সঙ্গদোষে তাহাতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মালতীর শেষ আশাও নির্ম্মূল হইয়া গেল।

দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বেশ্বরের সংসারের প্রতি ঘোর বৈরাগ্য জন্মিল, মনে করিয়াছিলেন জামাতার উপর ঘর সংসার সমর্পণ করিয়া জীবনের শেষভাগ কোন পবিত্র তীর্থস্থানে অবসান করিবেন, কিন্তু তাহা মনে করা মাত্রই হইল, দুঃখে দুঃখে ভগ্নহৃদয়ে অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

মালতী এখন বড় হইয়াছে, সকলই বুঝিতে পারে, সুতরাং পিতার অকালমৃত্যু তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। পিতার মরণে এতদিনের পর মায়ের মরণ পর্য্যন্ত এককালে তীব্ররূপে অনুভব করিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে দারুণ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, আবার স্বামীর কুব্যবহার ও অসচ্চরিত্র তাহার উপর উপর্য্যুপরি আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। হতভাগ্য স্বামী অধিক রাত্রে মাতাল হইয়া বাটীতে আসে, মালতীর সহিত বচসা করিবার সূত্র অন্বেষণ করে, অকারণে মালতীকে কত তিরস্কার করে, অবশেষে কোন কোন দিন নির্দ্দয়রূপে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু মালতী কোন কথায় বিরক্তিভাব প্রকাশ করে না, একদিনের জন্যও স্বামীর অমঙ্গল প্রার্থনা করে না, নিষ্ঠুর চলিয়া গেলে একাকিনী কুটীর মধ্যে কেবল অশ্রুবিসর্জন করে।

মালতী এতদিনে আপন অদৃষ্টের পরিচয় পাইয়াছে, তাহার ক্ষুদ্র মন বৃহৎ জগতের অনেক জানিতে পারিয়াছে; মালতীর আর সুখ নাই, আর আশা নাই, যৌবনোন্মুখ ঈষৎ পরিস্ফুট সুকুমার অঙ্গে আর যত্ন নাই, প্রণয়োৎসুক প্রেমাভিলাষী মাধুর্য্য পরিপূর্ণ প্রাণে আর স্ফূর্ত্তি নাই, মালতী সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই যেন কেমন কেমন। মালতীর দুই তিনটী মাতৃস্বসা ছিলেন, মালতী একবার ভাবিল তাঁহাদের কাহারও কাছে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পলাইয়া যাই, কিন্তু তাঁহারা মালতীর কোন তত্ত্ব লইতেন না বলিয়া সে অভিমান প্রযুক্ত তাঁহাদের নিকটেও যাইবার বাসনা পরিত্যাগ করিল। উপায় বিহীনা অসহায়া মালতীর এতদিনে প্রাণের প্রতি লক্ষ্য হইল, হতভাগিনী ভাবিল—"মরিলেই এ জ্বালা জুড়ায়! এতদিন যে প্রত্যাশায় রহিলাম, দুঃখমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে কৈ একটীও ত সুখতারা এ পর্য্যন্ত দেখা দিল না? মাতৃস্নেহে আশৈশব বিধি বঞ্চিত করিয়াছেন, পিতা দুঃখে দুঃখেই অকালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বার্থপর আত্মীয় স্বজন বাল্যকাল হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছে, স্ত্রীলোকের একমাত্র আশা স্বামী—তাহাও আমার ভাগ্যদোষে বিমুখ, তবে আর কার জন্য অপেক্ষা করি?—আত্মীয় স্বজন! আমার মা নাই, বাপ নাই, তোমাদের নিকট হইতে অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখিনী বলিয়া তোমরা উদ্দেশ পর্য্যন্ত লও নাই; এতদিন সে অভিমান করিয়াছিলাম, আজ তাহা পরিত্যাগ করিলাম। আর অভিমান কিসের? যে এখনই এ জগৎ পরিত্যাগ করিবে তার আর অভিমানের প্রয়োজন কি? তোমাদের হতভাগিনী মালতী আজ তোমাদের চরণে চিরবিদায় লইল।—স্বামিন্! প্রথম যখন বিবাহ হয় তখন কল্পনার চক্ষে কত চিত্তবিমোহন উজ্জ্বল চিত্রই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু হায় এ পোড়া অদৃষ্টক্রমে একে একে সে

সকল ছায়াবাজীর ন্যায় কোথায় লুকাইল! হায় আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, তোমার দোষ কি? যাহাই হউগ্, যদি কখন অপরাধিনী হইয়া থাকি তবে, নির্দ্দয়, ক্ষমা করিও, তোমার শ্রীচরণে আজ আমি জন্মশোধ বিদায় লইলাম। দাসীকে স্মরণ করিয়া যদি কখন পাষাণ-হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, তখন জানিও—দাসী অনেক দুঃখে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।—জগৎ! তোমার পরিচয় আমি পাইয়াছি, আজ নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে তাহা বলিয়া যাইব—আর তোমায় আমার ভয় কি? তুমি নির্ম্মম, তুমি পরদুঃখ-প্রিয়, তুমি অতি স্বার্থপর।"

অভাগিনী মালতী অধীর হইয়া পড়িল, তাহার প্রাণ বাহির হইবার জন্যই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করিতে পারিলনা. অসহ্য হৃদিবেদনায় হুতাশ প্রেমে হতাশ হৃদয়ে নিশীথে আপন কুটীরের মধ্যে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল! তাহার স্বামী অনেকক্ষণ পরে বাটী আসিয়া সেই ভীষণ কাণ্ড দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু কোথায় পলাইবে? কিছুদিন পরেই রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইল।

১২

মালতীর মৃত্যুর পর অবধি সে বাটী অমনি পড়িয়া থাকে, সুতরাং তাহাকে লোকে পোড়োবাড়ী বলে, এবং মালতীর অপঘাত মৃত্যুর কারণ সকলেই বলে পোড়োবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে। যে লোক আলোকের পশ্চাতে বসিয়াছিল সে একজন দস্যু। দস্যুর প্রাণে ভূতের ভয় নাই—পোড়োবাড়ী পাইয়া তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ভূত সে বাড়ীতে ছিল কি না জানি না, কিন্তু সেই দস্যুই সেই বাড়ী আশ্রয় করিয়া থাকিত। সহসা রাত্রে কিরণময়ীকে দেখিয়া তাহারও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সে নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল—যে মেয়েটী গলায় দড়ী দিয়া মরিয়াছে, এ সেই।

দস্যু কি তখন একাকী ছিল?—না। সেই গৃহে একজন স্ত্রীলোক ছিল। সে কে?—মতিয়া। মতিয়া এতরাত্রে সেখানে কেন?—পাঠক! দস্যু হইতে মতিয়াকে বড় কম মনে করিও না। দস্যু যে সকল কুকর্ম্ম না করিতে পারে, মতিয়া তাহাতে সক্ষম। দিনের বেলায় দারিদ্র্যব্যপদেশে গৃহস্থের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পথ ঘাট চিনিয়া আসে, আর রাত্রে দস্যুদের সন্ধান বলিয়া দেয়। কার্য্য সিদ্ধ হইলে দস্যুরা তাহাকে কিছু কিছু দেয়। মতিয়ার সহিত দস্যুদের এই সম্পর্ক। এই সকল বিষয়ের কুপরামর্শ তখন হইতেছিল।

কিরণময়ী যখন অচেতন হইয়া ভূতলে পতিতা হন, নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণালোকে মতিয়া তাহা কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছিল, সুতরাং "ভয় নাই! ভয় নাই!—আমি দেখিয়াছি, ও কখনই ভূত নহে।—আলো জ্বাল, আমি আবার একবার দেখিব" বলিয়া দস্যুকে সাহস দিতে লাগিল। দস্যু দীপ জ্বালিয়া মতিয়াকে দিল। মতিয়া আলোক লইয়া ভূপতিত অচেতন দেহের নিকট গিয়া দেখিল—চিনিল—বলিল—কিরণময়ী।

দস্যু। কিরণময়ী!—কে?—তুমি জান?—কি সুন্দর মুখখানি দেখেছ!—দেখো আস্তে আস্তে—ম'রে গেছে না কি?

ম। না না।—এই যে বুক ধুক্ ধুক্ কর্‌চে। ভালই হ'য়েছে, অনেক টাকার যোগাড় হ'য়েছে।

দ। টাকার যোগাড়!—কি রকম?

ম। মালতীপুরের জমীদারের বাড়ী নিয়ে যেতে পাল্লেই টাকা।

দ। নিশ্চয়?

ম। নিশ্চয়।—তুমি এইখানে থাক, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।

মতিয়া কিরণময়ীর স্পন্দহীন দেহটীকে স্কন্ধদেশে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। বাটী হইতে অধিকদূর যাইতে না যাইতে সৌভাগ্য-ক্রমে একখানি শকট সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, মতিয়া জিজ্ঞাসা করিল "শকট কোথায় যাইবে?" শকটচালক উত্তর করিল "যেখানে লইয়া যাইবে।" মতিয়ার অনেক ভরসা হইল, চালককে শকট থামাইতে আজ্ঞা দিল। চালক শকট থামাইলে কিরণময়ীকে তাহার মধ্যে শয়ন করাইয়া আপনি একপার্শ্বে উপবেশন করিল। চালক জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতে হইবে?" মতিয়া বলিল "মালতীপুরের জমীদারের বাটী।" চালক শকট চালাইতে আরম্ভ করিল, কিরণময়ীর তখনও সংজ্ঞা নাই। মতিয়া সংজ্ঞালাভ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বহুযত্নে কৃতকার্য্য হইল। সংজ্ঞা-লাভ হইলে কিরণময়ী নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে বসিয়া আছে এবং তাঁহারা উভয়েই একখানি শকট-বাহনে যাইতেছেন। প্রথমতঃ তাঁহার বোধ হইল তাঁহার মাতা তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই রজনীর ভীষণ কাণ্ড সকল স্মৃতিপথারূঢ় হইল, চমকিয়া উঠিয়া ব্যগ্রমনে জিজ্ঞাসা করি-লেন "কে তুমি? আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

ম। ভয় নাই; আমি তোমায় উত্তম স্থানে লইয়া যাইতেছি।

স্বর সংযোগে কিরণময়ী মতিয়াকে চিনিতে পারিলেন, এবং সেই অসহায় অবস্থায় পরিচিতা মতিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইল, বলিলেন "মতিয়া! এ কৃতজ্ঞতা কিরূপে স্বীকার করিব, তাহা জানিনা। নির্দ্দয়স্বভাব দস্যুদের হস্ত হইতে বোধহয় তুমি আমায় উদ্ধার করিয়াছ!—হাঁ—আমার স্মরণ হইতেছে—দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবা মাত্র সেই আলোক—আলোকের পশ্চাতে সেই বিকটমূর্ত্তি—"

ম। কিরণময়ী, বাস্তবিকই আমি তোমাকে দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি।

কি। কোন্ খানে বল দেখি?

ম। এত রাত্রে, এ পথে, তুমি কেমন ক'রে এলে, আগে বল?

কি। নিকটে একজনদের বাটীতে আমার মা আমায় এনেছিলেন। তিনি তাঁদের কাছে আমায় রেখে কোথায় চ'লে গিয়েছেন! আমার কেমন সন্দেহ হ'তে লাগ্ল, আর মন কেমন কর্‌তে লাগ্ল ব'লে——

ম। তোমার মা!—আমি জান্‌তেম তোমার মা নাই।

কি। হায়! না—না। অমন কথা ব'লনা! আমার মা আছেন, আমি তাঁকে এতদিনে পেয়েছি।

ম। তোমার মা এখন কোথায়?

কি। হায়! তা আমি জানি না!—মতিয়া! আমি কেন পালিয়ে এলেম! তুমি আমায় আবার রেখে আস্‌তে পার না?

ম। কোথায় রেখে আস্‌ব?

কি। যেখানে আমার মা আমায় রেখে গিয়েছিলেন।

ম। তা ত আমি জানি না।

কি। তবে তুমি আমায় এখন কোথায় ল'য়ে যাচ্চ?

ম। কিরণময়ী, আমি তোমায় মন্দ স্থানে ল'য়ে যাবনা। যখন আমার হাতে প'ড়েছ, আমি তোমায় নিরাপদ স্থানেই ল'য়ে যাব।

কি। নিরাপদ স্থান!—আমি কি তবে এখনও বিপদসঙ্কুল স্থানে আছি?

ম। মা! কেমন ক'রে জান্‌ব!—এ সকল স্থান ভাল নয়। যতক্ষণ মা তোমায় নিরাপদস্থানে ল'য়ে যাচ্চি, ততক্ষণ কি বল্‌ব বল—

কি। কি বল্‌বে!

ম। যে অবস্থায় তোমায় পেয়েছি, সে অবস্থা স্মরণ হ'লে হৃৎকম্প হয়!

কি। কিরূপ অবস্থায় আমায় পেয়েছ?

ম। সে ভয়ানক অবস্থা তোমার শুনে কাজ নাই।

কি। মতিয়া! বোধহয় তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কেউ ছিলে!—আমাকে যেমন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলে, মা যখন এ সকল কথা শুনিবেন, তিনিও তেমনি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হবেন!

ম। কিরণ! আমিত জানিতাম তোমার মা নাই, তাঁকে এত দিনের পর কেমন ক'রে পেলে?

কি। হায়! সে সকল কথা মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়।—এখনও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা!

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় শকটখানি সহসা থামিল। কিরণময়ী দেখিলেন—একটী সুদীর্ঘ সুন্দর অট্টালিকা। জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বাটী কার?

ম। এটী তোমার পক্ষে একটী নিরাপদ স্থান।

কি। এখানে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই?

ম। কিরণময়ী, তোমার যদি বিপদই অন্বেষণ করিব, তবে তোমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম কেন?

কি। মতিয়া! কিছু মনে ক'রনা। আমার প্রাণ বড় চঞ্চল হ'য়েছে, তাই সকল বিষয়েতেই কেমন সন্দেহ হয়।

মতিয়া আনন্দিত মনে শকট হইতে অগ্রে অবতরণ করিল, এবং কিরণময়ীকে বলিল "কিছু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।" মতিয়া সুরম্য অট্টালিকায় প্রবেশ করতঃ দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু বাটীতে আছেন?"

দ্বা। বাবু নিদ্রাগত।—তুমি এত রাত্রে কেন?

ম। বিশেষ প্রয়োজন। বাবুকে সম্বাদ দাও। আর দেখ, ব'লো আমরা নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

দ্বারবান সম্বাদ দিতে প্রস্থান করিলে মতিয়া কিরণময়ীকে লইয়া গেল এবং বাটীর একটী নিভৃত কক্ষে তাঁহাকে বসাইয়া বলিল "মা, কিছুক্ষণ এই স্থানে থাক, এখনই তোমার প্রিয়দর্শন হইবে।"

কি। এ কার বাড়ী?

ম। আবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?—এখনও কি আমার উপর তোমার কিছু সন্দেহ আছে? আমি তোমায় উত্তম স্থানেই রাখিতেছি।

যদিও মতিয়া কিরণময়ীকে কিছু পরিমাণে বাধ্য করিয়াছিল, তত্রাচ তাঁহার কি জানি কেমন একটা মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। আর কিছুই না বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এবং মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মতিয়া সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র দ্বারবান প্রত্যাগমন করিয়া সম্বাদ দিল—"বাবু ডাকিতেছেন।" পরে তাহাকে সমভি-ব্যাহারে করিয়া ইন্দুভূষণের নিকট পঁহুছিয়া দিল, এবং আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

১৩

রাত্রি প্রায় তিনটা।

ইন্দুভূষণ ব্যাকুলিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মতিয়া, কি সম্বাদ?—এত রাত্রে তুমি এখানে?—কাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?"

ম। মহাশয়, কিরণপুরের কিরণময়ী আসিয়াছে, অনুমতি হইলে এখানে আনয়ন করি।

ই। দ্বারবান নির্জ্জনের কথা বলিলে আমি সেই ভয়ই করিয়া-ছিলাম।—মতিয়া, কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলে?

ম। সর্ব্বনাশ।—মহাশয় সর্ব্বনাশ কি? কিরণময়ীর আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছিল, তাই তাকে আপনার কাছে আনিয়াছি।

ই। আশ্রয়।—কেন কিরণময়ী কি নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হ'য়েছিলেন?

ম। মহাশয়, শুধু নিরাশ্রয় নয়, বড় ভয়ানক অবস্থা।

ই। ভয়ানক অবস্থা!—কি বল?—আমায় প্রতারণা করিও না।

ম। সে ভয়ানক কথা আর আপনার শুনে কাজ নাই।

ই। বুঝেছি।—তোমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছি!—মতিয়া, তুমি কি মনে কর যে আমি সেই ঘৃণিত পাপে——না—আর তোমার সহিত কোন কথার আবশ্যক নাই, তোমায় চিনিয়াছি। পাপিষ্ঠা! সে দিন যখনই তুমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলে, সেই ক্ষণেই তোমার প্রতি আমার সন্দেহ হ'য়েছিল; শুদ্ধ কিরণময়ীর জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল, সেই জন্যই না বুঝিয়া তোমায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম।—হায়! কেমন ক'রে কিরণময়ীর কছে এ মুখ দেখাব!—মতিয়া, বল, কিরূপ ছল প্রয়োগ করিয়া তুমি সেই সরলা বালিকাকে এখানে আনিবার জন্য লওয়াইয়াছ?

ম। মহাশয়, আমাকে যা মনে ক'চ্চেন, তা আমি নই। কিরণময়ীর যে রকম ভয়ানক বিপদ ঘটেছিল, আমি না থাকিলে তিনি বাঁচিতেন কি না সন্দেহ।

ই। কি!—বিপদ!—কি বিপদ? শীঘ্র বল।

ম। আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল——

ই। তাতে কিরণময়ীর কি?

ম। মহাশয়, আগে শুনুন।—সেখান হ'তে আস্‌তে রাত্রি হ'য়ে গিয়েছিল——

ই। তা কি?

ম। পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম একজন দস্যু একটী মেয়েকে স্কন্ধে ল'য়ে পলায়ন করিতেছে। আমি ভাবিলাম বুঝি কোন মন্দ লোক মন্দ অভিসন্ধির জন্য মেয়েটীকে লইয়া যাইতেছে—

ই। তার পর?

ম। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলাম, সে শুনিলনা। অনেক ডাকিলাম। অনেক ক'রে বলায় সে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়েটীকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" বলিল "আমার কন্যা, অসুখ হইয়াছে, বাড়ী লইয়া যাইতেছি।" আমার বিশ্বাস হইল না। মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম—কিরণময়ী। কিরণময়ীর জ্ঞান নাই।

ই। তার পর।—তার পর।

ম। তার পর অনেক কষ্টে তার হাত হ'তে কিরণময়ীকে উদ্ধার ক'রে এনেছি।

ই। আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।—আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি অর্থের লোভে ছলনা ক'রে কিরণময়ীকে এখানে আনয়ন ক'রেছ।—আমিত তখনই তোমায় ব'লে দিয়েছিলেম যে দেখো, কোন ছলনা ব্যবহার করিওনা।'

ম। আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন, কিরণময়ীর মুখে শুনিলে ত বিশ্বাস করিবেন?

ই। কি শুনিব?

ম। আমরা জানিতাম কিরণময়ীর মা নাই, কিন্তু তাঁর মা কাল এসেছিলেন।

ই। তাঁর মা!—কে তিনি?—বল, না হয় তাঁরই কাছে কিরণময়ীকে রেখে আসি।

ম। আমি তাঁকে কেমন ক'রে জানিব? কখন তাঁকে দেখি নাই।

কোথায় তিনি থাকেন তা কিরণময়ীও জানেন না। তিনিই কিরণময়ীকে এই খানে কোথায় এক জনদের বাটীতে এনেছিলেন, সেখানে রেখে রাত্রে কোথায় গিয়েছেন। কিরণময়ীর মন কেমন করিতেছিল বলিয়া সেখান হ'তে পলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন দস্যুর হাতে পড়েন। আমিই সেই দস্যুর হাত হ'তে উদ্ধার ক'রে আনি।

ই। এখানে কেন ল'য়ে এলে? যাঁদের বাটীতে তাঁর মা তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন সেই খানেই কেন ফিরে ল'য়ে গেলেনা? কিম্বা তাঁর পিতার কুটীরে তাঁকে দিয়ে এলেনা কেন?—তুমি কি জগতের ভাব জান না?—লোকে কি বলিবে? কিরণময়ীর নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করিবে যে?—ভাল কাজ কর নাই।

ম। আপনারই জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, আপনিই এখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন?

ই। না—তুমি জাননা। এ রাত্রে আমার বাড়ীতে কিরণময়ীর থাকা হবে না। নারী চরিত্রে স্বভাবতঃই লোকে দোষারোপ করে, কোন সংশয়োদ্দীপক ঘটনা ঘটিলে আর কি রক্ষা থাকিবে। না—কখনই তা হবে না।—চল, কিরণময়ীকে অদ্য রাত্রে আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী, পরদুঃখকাতরা উদাসিনীর গৃহে রাখিয়া আসিব, কল্য প্রাতঃকালে কিরণপুরে পাঠাইয়া দিব।

ম। তবে আপনি যান, আমি আর যাবনা।

ই। কি! তুমি যাবে না?

মতিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল। সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ইন্দুভূষণ তাহার ভাব দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এবং যে গৃহে কিরণময়ী একাকিনী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন সেই গৃহে বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

ইন্দুভূষণের আসিবার পূর্ব্বে কিরণময়ী ভাবিতেছিলেন "এ বাড়ী

খানি কার?—কোন বড় লোকের বাড়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে কি আমার মা থাকেন? মতিয়া বোধ হয় তাই আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। হায় এ কি দুর্ঘটনা! কোথায় পলাইব মনে করিলাম, না অবার জালে পড়িলাম?—যাই হউগ, মতিয়া আমার মন্দ করিবে না, তাহার মন্দ অভিপ্রায় থাকিলে সে প্রথম হ'তেই আমার মন্দ করিত।—বোধ হয় আমার মা এই খানে থাকেন, মতিয়া জানে, তাই আমায় এখানে লইয়া আসিয়াছে।—কতক্ষণে মাকে দেখিব!"—এই রূপ ভাবিতেছেন এমন সময় ইন্দুভূষণ মতিয়াকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দুভূষণকে দেখিয়া কিরণময়ী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। মাতাকে দেখিবেন দেখিবেন মনে করিতেছিলেন, না দেখিয়া হতাশ হইলেন, এবং ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ কিরণময়ীর অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন কিরণময়ী, ভয় নাই, আমি তোমার শত্রু নহি, আমা হইতে তোমার কোন মন্দ সম্ভাবনা নাই।"

কি। অমার মা কোথায়?

ই। তোমার মা এখানে নাই। এই স্ত্রীলোক তোমাকে এখানে আনিয়াছে, আমি কিছুই জানিনা।

কিরণময়ীর শরীর শিহরিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মতিয়া। কেন তুমি আমায় এখানে লইয়া আসিলে? এই কি তোমার নিরাপদ স্থান?"

পাপিষ্ঠা মতিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দুভূষণ বলিলেন "কিরণময়ী, এখানে তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। মনে কর তোমার আপন বাটীতেই আছ। আমি তোমায় অধিকক্ষণ এখানে রাখিবনা। শীঘ্রই তোমাকে উত্তম স্থানে রাখিয়া আসিব। আমার পরিচিত একটী স্ত্রীলোক এই খানেই থাকেন, তিনি পরের

দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর, শীঘ্রই তোমাকে সেই খানে রাখিয়া আসিব।"

কিরণময়ী কাতরস্বরে করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহারই কাছে পাঠাইয়া দিন।"

ই। তোমার কিছু ভয় নাই। আমি স্বয়ং তোমাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া অসিব।

কি। যে আজ্ঞা, তবে আর বিলম্ব কেন?

ই। না—চল—এখনই রাখিয়া আসিব।

সকলেই সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। মতিয়া অপ্রতিভ ও হতাশ্বাস হইয়া প্রস্থান করিল। ইন্দুভূষণ কিরণময়ীকে লইয়া উদাসিনীর গৃহে চলিয়া গেলেন। দূর হইতে দেখিলেন উদাসিনীর গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি কি করিতেছেন। অবশেষে উদাসিনীর গৃহে পঁহুছিলেন। পঁহুছিবামাত্র উদাসিনী বালিকাকে দেখিয়া চমকিতা হইলেন, বালিকাও চিনিতে পারিয়া "মা! মা!" বলিয়া তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জলধি দর্শনে।

ঘোর ঊর্ম্মিসমাকুল সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
ফেনরাশি অট্টহাসি বর্ণে তব নর।
কিন্তু মোর মনকথা হায় কারে কই,
তোমারে হেরিলে আমি কেন হেন হই?
প্রশান্ত মুরতি তব তরঙ্গশোভিত,
হেরিতে হেরিতে চিত্ত হয় উন্মাদিত।
যে ভীম মুরতি, সিন্ধু, হেরিলে তোমার,

কত বীরহৃদে হয় ভয়ের সঞ্চার ;
ভীতিবিকম্পিত স্বতঃ অবলা হৃদয়,
সে মূরতি হেরি সিন্ধু কেন স্ফীত হয় ?
যত দেখি, যত ভাবি গাম্ভীর্য্য তোমার,
তত যেন হয় মোর হৃদির বিস্ময়।
সুবিশাল বক্ষে তব ভাসিছে যেমন
শোভাময়ী এ অবনী সুন্দর-দর্শন,
কোন্ দিনে কেবা জানে পাইবেক লয়,
স্বভাব আবার হবে অন্ধকারময় ;
মহাকাল মহার্ণবে মানব-জীবন
ভাসে ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় যা দেখি এখন,
হইবেক এক কালে হায় রে বিলীন,
যখন আসিবে সেই বিষম দুর্দিন !
তাই ভেবে সিন্ধু তব তরঙ্গ ভীষণ,
সুখশয্যা সম বোধ হয় সে কারণ।
যখনি তোমারে হেরি আত্মহারা হই,
নারি প্রকাশিতে কোন্ সুখে মগ্ন রই !
তাই ও তরঙ্গ হ'তে আরো উচ্চতর,
আনন্দে উথলে উঠে আমার অন্তর।
সুগভীর জলরাশি করিলে দর্শন,
তাই সাধ যায় তায় করিতে শয়ন।
তাই বোধ হয় অন্য সুখ নাহি চাই,
যদি ও সুনীল জলে শুইবারে পাই।

জনৈক হিন্দু মহিলা।
১, ওয়েলিংটন স্কয়ার।

মনোবিকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গ্রাম না নগর?

"Sing again, with your dear voice, revealing a tone
Of some world, far from ours,
Where music and moonlight and feeling are one."

যে স্থানে অল্প লোকের বাস ও যাহা রাজধানী নহে তাহাকে গ্রাম কহে। বহুজনসমাকীর্ণ রাজপ্রাসাদবিশিষ্ট স্থানের নাম নগর। আমি জগৎ সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, ভূগোল লেখক দিগের —পৃথিবীর ছবি লেখক দিগের—এ বিবরণ অসম্পূর্ণ। যদি তাঁহারা একথা হাস্যের দুরন্ত বীচিপূর্ণ নদী মধ্যে ফেলিয়া দেন, হাস্য তরঙ্গের কলেবর একটু বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে এই লীলাময়ী বিশ্বের একটী অদ্ভুত প্রাণী বলিয়া স্বীকার করি। তাঁহারা নিজে যেমন অসম্পূর্ণ, তাঁহাদের জ্ঞানও সেইরূপ। আমি বলি যেস্থানে বাহ্যাড়ম্বর নাই—চাকচিক্যশালী ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তকারী বস্তু নাই—অভ্রভেদী সৌধমালায় যে স্থানের কলেবর সুশোভিত করিয়া সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা মানব নয়ন হইতে পলায়ন করেন নাই—আর যে স্থানের মনুষ্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি নাই, যে স্থানে মনুষ্যের শারদ জ্যোৎস্নাময় মনে অহংকার নাই, দ্বেষ নাই, চিরশত্রুতার দুরপনেয় কলঙ্ক রাশিতে মন কলঙ্কিত হয় নাই, যে স্থানে মূর্ত্তিমতী সরলতা—প্রকৃতি, রমণী রূপে ভূতলে অবতীর্ণা

হইয়াছেন—পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যখন পৃথিবী প্লাবিত হইয়া যায়, তখন যাহা দিগকে নিদ্রিত দেখিলে মনে হয়—

* * * * * *

* * * * * *

এলায়ে পড়েছে কেশ,
যেন এলো খেলো বেশ,
নিদ্রিত ভ্রমর দুটী গড়ায় নয়নে.
দুইটী মৃণাল-বাহু নিদ্রায় মগনে—
আবদ্ধ কিরণমালা
যেন করে ফুলখেলা,
চন্দ্রমা হাসিছে অঙ্গে কাঞ্চন ছটায়,
বিহ্বলা ত্রিদিব বালা প্রীতি তপস্যায় !
কতরে অবশ অঙ্গে,
কতই তরঙ্গ ভঙ্গে,
ভঙ্গে কচি ওষ্ঠ দুটী কাঁপিছে নিদ্রায়,
ভাবের উচ্ছ্বাস মালা ক্ষণেকে মিশায়—
পড়িয়া অবশ অঙ্গে
লাবণ্য তরঙ্গ ভঙ্গে
চিত্রিত প্রতিমা খানি কুমুদ শয্যায়,
চপলা চকিত হাসি অধরে বেড়ায় !

যাহার হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয় তাহাকে আমি দেবতা বলি, তুমি তাহাকে কি বল ? হরি হরি—পরোপকার যে স্থানের চিরব্রত ধর্ম্ম, যে স্থানের এক মাত্র উপাস্য দেবতা ; যে স্থানে লোকের মনে চিন্তার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি—হৃদয়ের চর্ম্মাবরণী—এই অসার অস্থিরাশি ভেদ করিয়া হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে না; যে স্থানের

লোকের মন—কোমল হৃদয়—পরযন্ত্রণাদর্শনে কাতর হইয়া বেড়ায়—পরিত্রাণের—সেই কষ্টভোগীর পরিত্রাণের—উপায়োদ্ভাবনী তামসিক শক্তির যন্ত্রণা দর্শন মাত্রেই পরিচালনা করে; যে স্থানের লোক দস্যু নহে; ভবিষ্যতের নক্রচক্রসঙ্কুল কালের তমোময়-গর্ভ-নিহিত অবস্থা সকলকে যাহারা মানস-নয়নে দর্শন করে; অহিদষ্ট জীবনের প্রতি-কক্ষ প্রতিপৃষ্ঠা যাহারা নিষ্কলঙ্ক রাখে; পাপে যাহাদিগের ভয়, পরিত্রাণ যাহাদের ঐকান্তিক বাসনা, পরকালে যাহাদিগের বিশ্বাস, ধর্ম্মে যাহাদের মতি, দেবতায় যাহাদিগের ভক্তি (দেবতা?—মানসিক শক্তি ভিন্ন দেবতা নাই); যে স্থানের ক্ষুদ্র আভিধানিক শব্দে নিষ্ঠুরতা শব্দ প্রতিশব্দিত হয় না; মনোবিকার যে স্থানের লোকের মনে আধিপত্য করিতে পারে না; যে স্থানে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের লীলাময়ী মাধুর্য্যপরিপূর্ণ মূর্ত্তি জগৎলোচন পরিতৃপ্ত করে (১); যাহার নামমাত্রে কবিদিগের—স্বভাবের উপাসকদিগের—কল্প-

(1) "It is an isle under Ionia skies,
Beautiful as the wreck of Paradise,

*　*　*　*　*　*

*　*　*　*　*　*

The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and Jonguils peep,
And dart their arrowy odour through the brain
Till you might faint with that delicious pain.

SHELLEY.

নার পুত্র দিগের—মন আনন্দে ভরপূর হইয়া যায়, মনের ভিতর উজ্জ্বল ছায়াছবি কিঞ্জানি হৃদয়ের কোথা হইতে উৎপন্ন হয়; যথায় পক্ষিগণ নির্ভয়ে, মনের আনন্দে, বায়ুর সহিত গা ঢালিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়—সুখে বিচরণ করে—আকাশে উঠিয়া প্রাণ ভরিয়া সুর মিলাইয়া বায়ু-মধ্যে শ্রবণপরিতৃপ্তকর সঙ্গীত স্রোত ঢালিয়া দেয়; যে স্থানে লোকের মনে অমানিশা নাই—যে স্থানে কমলা ও বীণাপাণির সহাবস্থিতি চিরবিরোধিনী—এই প্রবাদ অমূলক বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস হইয়াছে; যে স্থানে পৈশাচিক বৃত্তি সকল ভগ্নমনোরথ হইয়া তোমার স্বার্থপর মনের ন্যায় অন্যের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না; মূল কথা এ পৃথিবীর যাহা নন্দন কানন তাহাকে গ্রাম বলে। পাঠক! এক্ষণে বলি যে স্থানের লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার নিয়ম সকল জানে না—এ আমার—সেই গ্রাম।

নগর।

"Let ambition rule the jarring world."

যেস্থানের একদিকে কোলাহল অপর দিকে আর্ত্তনাদ; একদিকে হাহাকার শব্দ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অপর দিকে ললিত পঞ্চমে মধুর নিক্বণে সঙ্গীত স্রোত সেই হৃদয় বিদারক হাহাকার শব্দকে গ্রাস করিয়া বায়ুর পরতে পরতে পৃথিবী ভরিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে; যেস্থানের এক দিকে যুদ্ধে নর-রক্তে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া নিকটস্থ নদী উদর বৃদ্ধি করিতেছে—যাহার অপর দিকে লীলাকুঞ্জে যুবক যুবতী নির্জ্জনে হৃদয়ের প্রেমকক্ষগুলি উন্মোচন পূর্ব্বক আশ্রয় শূন্য আশালতাকে প্রেমের সহিত সংযত

করিয়া দিতেছে; অপর দিকে সংসার বিদ্বেষী ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন বৈরাগী, প্রেমের নিগড় সকল ছিন্ন করিয়া পরকালের সেই তমোময় আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক মানস নয়নে শক্তির অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে; যেস্থানের একদিকে রাজতন্ত্র অপর দিকে প্রজাতন্ত্র, ওই দেখ রাজতন্ত্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাতন্ত্রকে চরণে দলিত করিতেছে, অপর দিকে প্রজাতন্ত্র একমত হইয়া রাজতন্ত্রকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে; যাহার একদিকে পৌত্তলিকতা অপর দিকে নাস্তিকতা; এক দিকে বিজ্ঞানবিৎ দোর্দণ্ড ইংরাজের শাসন, অপর দিকে নিয়ন্তার বশবর্ত্তী, আইন ভীত, নিরীহ ভাল মানুষ বাঙ্গালী; এক দিকে শ্বেত মূর্ত্তির ভীষণ মূর্দ্ধা, এক হস্তে দণ্ডনীতি অপর হস্তে দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীর উপর সমুদ্রের উপর আপনার আধিপত্য, আপনাদিগের প্রতাপ প্রকাশ করিতেছে, আর এদিকে একবার চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখ চাটুকার, লগুড়তাড়িত, শ্বেত চরণস্থ উপানহ চিহ্নধারী কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী কেমন সেই শ্বেত মূর্ত্তির পদসেবা করিতেছে। ঈশ্বর করুন, সেই ধর্ম্মে তাহাদের মতি থাকে—সেই দেবতায় তাহাদের বিশ্বাস থাকে! সেই দেবতার প্রতাপ দিন দিন বর্দ্ধিত হউক; বিশ্বসংসার তাহার করতলগত হউক—যখন প্রভুর সুখেই ভৃত্যের সুখ, প্রভুর দুঃখেই ভৃত্যের মরণ, তখন সেই প্রভু যাহাতে সতত সুখে থাকেন তাহার চেষ্টা তাহাদের সতত করা কর্ত্তব্য। তুমি বলিবে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াও আমরা অনেকে উপকৃত হইয়াছি। সত্য বটে, দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আমরা অনেকে উপকৃত হইয়াছি, ভারতে যাহা ছিল না—যাহার বিনিময়ে এই সোনার ভারত তাহাদের চরণে উপঢৌকন দিয়াছি, সে বস্তু মহৎ—সে বস্তু মহৎ বলিয়া মানি; কিন্তু এক দিকে সেই মহৎ বস্তু অপর দিকে ভারতকে রাখিয়া যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে সেই মহৎ বস্তু ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র বলিয়া

বোধ হয়। পাঠক! আমি বাঙ্গালী, আমারও ভীষণ দণ্ডনীতি বাঙ্গালীর মান সম্ভ্রম ভুক্ নবম বিধানের ভয় আছে!

হরি হরি! যেস্থানের এক দিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ক্ষীণস্বরে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে—অপর দিকে ভিন্ন বেশধারী ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম্ম নববলে বলীয়ান হইয়া ক্ষুদ্রমতি ধর্ম্মজ্ঞানহীন বঙ্গীয় যুবকদিগকে পথভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া আপনাদিগের নবপ্রসূত ধর্ম্মের কলেবর বর্দ্ধিত করিতেছে; যাহার এক দিকে শ্মশান—জ্বলন্ত চিতা—এক জনের আশা, প্রেম, ধর্ম্ম, বল, বুদ্ধি, নাশকারী সর্ব্বভুক্ অগ্নি জ্বলিতেছে; যেখানে বসিয়া এক বার চিন্তা করিতে পারিলে এই পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক চলিয়া যায়—জীবন অসার বলিয়া বোধ হয়—অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়—আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়—পাপে ভয় হয়—ধর্ম্মে মতি হয়—যাহার অপর দিকে নৃত্য, গীত, অধর্ম্ম, অহঙ্কার, চৌর্য্য-বৃত্তি ইত্যাদি; যেস্থানের এক গৃহে বৃদ্ধা জননী এক মাত্র পুত্র বিয়োগ দুঃখে উন্মত্তা হইয়া শোকের দারুণ যন্ত্রণায় হৃদয়ের নিভৃত গৃহস্থিত প্রাণকে দগ্ধ করিতেছেন, আপনার ক্ষণভঙ্গুর শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলিয়াও একবার ভ্রমেও ভাবিতেছেন না, শ্মশান অপেক্ষা সেই স্থানে—জননীর হৃদয় কক্ষে—সেই খালি বুকের ভিতরে—সেই চর্ম্মকক্ষে সেই পুত্রের—সেই ভস্মীভূত—কি জানি-কোথায়-গত পুত্রের—মুর্ত্তি ভিন্ন কিছুই নাই; হাহাকার—দীর্ঘশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ধ্বনি মুখ হইতে নাসারন্ধ্র হইতে বায়ুপথে নিক্ষিপ্ত হইতেছে না; যাহার সেই মুর্ত্তি দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়—পৃথিবী অসার বলিয়া বোধ হয়—জীবনের আয় ব্যয় একেবারে স্থিরীকৃত হইয়া যায়—দেবতায় অবিশ্বাস হয়—ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তখন মনে হয়—যদি এজীবন বিসর্জ্জন দিলে সেই হৃদয়শূন্য বধির যমের পাষাণ প্রাণ হইতে করুণার উদ্রেক হয়—যদি এই বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে পুনঃ

প্রাপ্ত হয়—তাহা হইলে এ প্রাণ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি—তাহা হইলে বোধ হয়—তখন মনে হয়—

"যদি নিত্য মনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্নলব্ধং ভবেন্নু কিম্।"

সে প্রাণ কি এতই কঠিন যে পরের যন্ত্রণায় কাতর হয় না? প্রাণ থাকিলে ত পর যন্ত্রণা দর্শনে কাতর হয়—তবে কি তাহার প্রাণ নাই?—যদিই থাকে, তবে তাহার কি কঠিন প্রাণ! সে প্রাণের জড়তা, সে প্রাণের স্থূলত্ব যে কত অধিক তাহা বোধ হয় কল্পনাতীত! ইংরাজ-দিগের বিচিত্র নিয়ম—তুমি আমার প্রাণনাশ করিলে রাজদ্বারে দণ্ড-নীতির নিকট তোমারও প্রাণ দণ্ড হইবে। সত্য বটে, প্রাণের জন্য প্রাণ দণ্ড উচিত—"Life for life"—বড় ভাল; তোমার প্রাণও প্রাণ আমার প্রাণও প্রাণ, সিংহের প্রাণও প্রাণ, শৃগাল কুক্কুরের প্রাণও প্রাণ, মশকের প্রাণও প্রাণ। গত কল্য রাত্রে একটী জীব-হত্যা করিয়াছি, শত সহস্র কীট চরণে দলিত করিয়াছি, কৈ আমার জন্য ফাঁসি কাষ্ঠ কোথায়? যখন "Life for life" এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তখন কেন না থাকে? সেই আইনে ত এরূপ কিছুই লেখা নাই যে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিলে মনুষ্যের প্রাণ দিতে হইবে, তবে "Life for life" মানে কি? তুমি কথা কহিতে জান, মনের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পার, তোমার বিচারালয় আছে, তাহাদের কি কিছুই নাই? তাহারা তোমাকে বলিতে পারে না, তাহারা ইংরাজি, বাঙ্গালা, দেবভাষা জানে না সত্য, তথাপি তাহা-দের ভাষা আছে, সুখ দুঃখ জানাইবার স্থল আছে। তোমার আইন **magnet**—তাহাদের আইন **non-conductor.**

ক্রমশঃ

খদ্যোতিকা।

(৺ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত।)

হেথা সেথা থেকে থেকে দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে— ১
খেলিতেছ খদ্যোতিকা কাননে কাননে,
প্রলম্বিত যামিনীর অঞ্চল আঁধার—
চমকি চমক তায় বিহার তোমার।

দিবাভাগে খদ্যোতিকা দেখিনা তোমায়, ২
গরিমা দেখাও ভাল তামসী নিশায়,
আঁধারের মাঝে থেকে পুচ্ছ আস্ফালন,—
দেখাতেছ খদ্যোতিকা ক্ষুদ্রের লক্ষণ।

তোমা হেরে এক মনে ভাবিতে ভাবিতে, ৩
সুখের শৈশব স্মৃতি উঠিতেছে চিতে,—
ধাইতাম পিছে পিছে ধরিতে তোমায়,
পাঠশালা হ'তে গৃহে আসিতে সন্ধ্যায়;—

তুমিও কৌতুক কত বাড়াতে খেলার, ৪
যথা দেখি তথা যাই নাই তথা আর,
পুনঃ জ্বলে পুনঃ ধাই নাই পুনঃ তথা,
গত সুখ তিক্ত মধু স্বপনের কথা!

পাছে উড়ে যাও ভয়ে ধরিতে ধরিতে, ৫
পেষিত হইতে কত নিবিড় মুষ্টিতে;
হেরে ত্রাসে দুর্ব্বাদলে ঘসি করতল,
তথাচ না ঘুচে তব অনুষ্ণ অনল।

বিম্ব ফলে গুটিকত জীবিত পূরিয়া ৬
নিয়া আসিতাম গৃহে লতায় বাঁধিয়া,
পরীর নিকুঞ্জ যোগ্য দীপক রচন,
আমিও পরীর মত ছিলাম তখন।

মান।

সংসারের মধ্যে সর্ব্বদাই "মান" বিষয়ক কথার আন্দোলন শুনিতে পাওয়া যায়। মানের লাঘব গৌরবে যেন মরণ জীবন নির্ভর করিতেছে। সদাই মানের প্রতি দৃষ্টি, মান পাইলেই মুখে হাস্য ধরে না, কুত্রাপি কিঞ্চিৎ ত্রুটি বোধ করিলে কর্ত্তা ক্রোধে লাল হইযা উঠেন। "যা'ক্ প্রাণ ত থাক্ মান" প্রাণের বিনিময়েও যেন মান বাজারের পরম ধন ; ইহাতে অর্থের বিনিময়ে যে মান সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি ঘটে তাহা বিচিত্র নহে। আবার কথন কথন মূল আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ধন লাভ, প্রতিপত্তি লাভ উদ্দেশে মানের প্রতি দৃষ্টি হইয়া থাকে। কথন মানের উদ্দেশে ধনব্যয়, কথন ধনের উদ্দেশে মানের আয়। ঐ উভয়ের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কত প্রকার বিচিত্র অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে যে চারি রূপ মানের বিবরণ করা যাইতেছে, শব্দের সাদৃশ্য অনুসারে তাহাদের অবস্থা কীর্ত্তন যেমন প্রয়োজনীয়, মানকে সেই রূপ চারি ভাগে বিভক্ত করা উদ্দেশ্য নহে। ভাগ চতুষ্টয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখা যাইতেছে যে প্রথমতঃ যাহার পরিমাণ নাই তাহার যেমন গৌরব, পরিমিত বস্তু সেরূপ গৌরবান্বিত নহে। মানহীন যে রূপ গুরু মানী তত গুরু নহে, এ বিষয়ে আকাশ যে রূপ দৃষ্টান্ত স্থল এমত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। আকাশের একটী নামান্তর বিমান। আকাশের তলস্পর্শ হয় না, কতদূর যাইলে আর আকাশ নাই এবং আকাশের সীমান্তরেই বা কি আছে ভাবিলে ইয়ত্তা করা যায় না।

কোন দিন এক স্থানে দেখিলাম কোন এক ফকির একটী একতারা হাতে লইয়া গান গাইতেছে—

"আমার মন মনুয়া শোন্‌রে কথা।
ওরে আসমান জোড়া ফকির তার জমিন জোড়া কাঁথা
এ ফকির মরিলে পরে, গোর হবে তার কোথা॥"

উঃ। এ ফকিরের কি মহিমা!

আমার একটী জমিন্দার বন্ধু, মধ্যে আমাকে একটী আমোদের কথা শুনাইয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন "যে যদি কেহ আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাহ'লে আমি জমিন্‌দার বলিয়া পরিচয় দিব না, এখন আমাকে আসমান্ দার বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে, যে হেতু জমির মধ্যে আর আপনাকে মুখ রগড়াইয়া মারিতে চাহি না।" ঐ কথাটী শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তি আলোচনা করিয়া বোধ হইয়াছে যে তিনি এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমিত মেটে ভাবে সন্তুষ্ট নহেন। বিমান শব্দে আমার যে কি লক্ষ্য স্থান তাহা পাঠকগণ একটু উকি মারিয়া দেখিবেন। উকিটী বিকারের প্রলাপ হইলে অনুরোধ করিতাম না। প্রকৃতির উচ্চ মঞ্চে উকি মারা সুস্থাবস্থার কার্য্য বটে। মান সম্বন্ধে প্রথম রূপ জানাইলাম।

যে সকল মহাত্মা দিগের গুরুতর বিষয়ের ধ্যান থাকে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি প্রশস্ত দেখা যায় এবং যাঁহাদের পরিমিত লঘু বিষয়ের আলোচনায় জীবন ক্ষেপণ হয় তাঁহাদের ভাবের যে ঔদার্য্য থাকে না তাহা প্রকৃতিসিদ্ধ। যিনি যাহা ধ্যান করেন—ধ্যান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়! দেবতাকে কে কোথায় দেখিতে পায়? ধ্যানেতেই দেবতার পরিচয়। অন্তরের ধ্যানও যেমন, বাহিরের ধ্যানও সেইরূপ। সাধারণের মধ্যে যাঁহারা গুরুতর বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, (যেমন জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা) তাঁহারা মনুষ্য সমাজে আদরের পাত্র বলিয়া চিরকালই পূজিত

হইয়া আসিতেছেন। মানের এটী দ্বিতীয় রূপ ইহার নাম অনুমান।

তৃতীয় রূপ এই—সকলকেই মানের ভিখারী দেখা যাইতেছে। বস্তাবন্দি করিয়া সমস্ত মান একচেটে করিরা অভিমানী আছেন, এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাজারে মানের একটী বিনিময়ের ভাব দেখা যায়। তুমি আমাকে যতটুকু মান দাও, আমিও তোমাকে ততটুকু দিতে সম্মত হই। তোমার যেমন—"আস্তে আজ্ঞা হোক"—এই শব্দের ঠাম্‌নি, আমিও তোমাকে—"আস্তে আজ্ঞা হোক" বলিবার সময় সেইরূপ—"আস্তে আজ্ঞা হোক" শব্দের ঠাম্‌নি দিয়া থাকি। যদিও মানের কজু কজু ঠিক মানের বিনিময় না ঘটিতে পারে, কিন্তু আমার মান বা তৎসদৃশ বিনিময় কিছু একটা অন্তরে আছেই আছে। সাধারণতঃ প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে "আপনার মান্ আপনার ঠাঁই"। আপন মানবিষয়ে যেমন উচিত জ্ঞান থাকে, সেইরূপ অন্যের মান রাখিয়া চলিলেই ভাল হয়। আপন মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে যাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে হনুমানের মত আর কাহাকেও দৃষ্ট হয় না। রামায়ণে প্রসিদ্ধ আছে যে উচিত সময়ে সর্ব্বস্বধন লোম লাঙ্গুল ত্যাগ করিয়াও কখন মাছি, কখন ব্রাহ্মণ, কখন কখন আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া শত যোজন পরিমিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়াইয়াছেন। মহাত্মা হনুমান ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া আপনার পরিমাণ বিষয়ে কত লীলাই দেখাইয়াছেন! তাঁহার কার্য্যপ্রণালী গুলি আলোচনা করিলে কোন কাজই বাঁদ্‌রামি বলিয়া বোধ হয় না। হনু মহাশয় প্রয়োজন হইলে যে সকল লম্ফ দিয়াছেন সে লম্ফের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে বানুরে লাফ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের কতকগুলি বর্ত্তমান বানর যে রূপ পাণ্ডিত্যাভিমানে অনুমানের উপর লম্ফ ঝম্ফ

করিতেছেন তাহার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ঠিক বর্ত্তমান হনুমানের লাফই বোধ হয়। কোন্ মূল অবলম্বন করিয়া কোন্ শাখা প্রশাখায় লম্ফ প্রদান করেন, কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না। দেখিলে বোধ হয় যেন কোন মূল অবলম্বনই নাই। এই নিমিত্ত শাখা-মৃগ নামটী অব্যর্থ হইয়াছে। হনুমানে যে কয়েকটী বর্ণ আছে অনুমানে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যুনতা দেখা যায়। মাত্রাগত কিঞ্চিৎ ভেদ মাত্র, কিন্তু লক্ষ্যগত কোন ভেদ নাই। শব্দ সাদৃশ্যে এইটী তৃতীয়রূপ।

নিম্ন শ্রেণীর আর একটী (চতুর্থ) রূপ ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। একজন লোকের এক জোড়া যুতা আছে, অপর এক জনের দুই জোড়া আছে, তৃতীয় আর এক জনের চারি জোড়া আছে। প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিতীয় মানে দ্বিগুণ বড়, এইরূপ প্রথম দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ব্যক্তি চারিগুণ দ্বিগুণে বড়। যুতাকে মানদণ্ড করিয়া মনুষ্যের মান নিরূপণ করা কোন্ হীন বুদ্ধি হইতে যে সমুদ্ভূত হইয়াছে, মনুষ্যের কতদুর নীচবুদ্ধি ঘটিলে বস্তুর সংখ্যা অনুসারে মানের সংখ্যা অবধারণ করা পদ্ধতি চলিতেছে, ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মানের বৃদ্ধি এবং তাহার পরিমাণের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মানের লাঘব এ কোন্ গণিতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ঘটিয়াছিল, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথমেই যুতাকে মানদণ্ড করিবার প্রয়োজন এই যে প্রায় সকলেই পদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে, হেডের প্রতি দৃষ্টি কেহই করিল না! এখন পদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলেই যুতার মূল্যটা কসিয়া দেখা হয়, সেই অনুসারে যতদূর তাঁহার দৃষ্টি চলে মোটামুটি মানুষের মূল্য কসিয়া লওয়া হয়। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে যে কোন্ অমূল্য রত্ন কোথায় কি ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিল, তাহা যেন আলোচনার বিষয় নয়! হয় ত মাথার মণি শিরোধার্য্য কোন মহাপুরুষ ছেঁড়া যুতা পরি-

ধান করায় অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িলেন। এই উদ্দেশেই যুতাকেই মানদণ্ড বলিয়া উল্লেখ করা গেল। যুতগতদৃষ্টি—যেন ভূতগত দৃষ্টি !!

লিখিতে লিখিতে একটী গল্প মনে হইল। যুতার উপরে যে মান সম্ভ্রম দাঁড়াইয়া আছে গল্পটী পাঠ করিলে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। যদি গভর্ণমেণ্টের এরূপ আইন হয় যথা—(আইনের মুসাবিদা) “যে হেতু দেখা যাইতেছে যে আমাদের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বাঙ্গালিই অধিক, ঝোলপ্রিয় বাঙ্গালিদের শরীর বড় ঢিল তাহাতে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বড় বেযুত ঘটিয়া উঠিতেছে, যুতিয়া না রাখিলে এ বেযুতের কোন প্রতিকার দেখা যায় না, যুত ব্যতীত যুতিয়া রাখিবার কোন উপায় দৃষ্ট হয় না, অতএব হারহারি মত একশত টাকা বেতনের দশ যুতা, দুই শত টাকা বেতনের কুড়ি যুতা, এইরূপ বেতনের সংখ্যা অনুসারে যুতার নিরূপণ করা গেল।” এই আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ পরস্পরে মুখ তাকাতাকি করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ভাই! শুনিয়াছ যুতার ব্যবস্থা করিতেছে; ইহাতে কে চাকুরি করিবে ?”

তৃতীয়বার পাঠের পর আইন পাশ হইয়া গেল। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের আফিসে যুতা মারিবার কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও একশত টাকার উপর বুট্ নাগ্‌রা, একশত টাকার কম চটী মারিবার উদ্দেশে সংগ্রহ হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে পরস্পরে সেইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন এখন তাহা উল্‌টাইয়া গেল—“ভাইরে! আমাদের শরীর দৃঢ় করাই যখন গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য তখন অভিপ্রায় আলোচনা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কাহার ভাগ্যে কি ঘটিল সে কথায় আমাদের কাজ কি ?” চাপ্‌কান বগলে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন আপন বরাদ্দে সম্মতি দিলেন। এ অবস্থায় লোকের আর বেতন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন রহিল না। যুতার বরাদ্দ শুনিলেই সেই

অনুসারে বেতন ও মান সম্ভ্রম অনুমিত হইতে লাগিল। পিতার কর্ম্ম পুত্রে পাইয়া তাঁহারও সেই বরাদ্দ সহিয়া আসিতে হইল। দৈব-ঘটনা ক্রমে বুট্ নাগ্রা না থাকায় একদিন কোন বুটের যোগ্য মহিমান্বিত ব্যক্তিকে মারক কর্ম্মচারী চটীর বাড়ি মারিল। আপন বংশ মর্য্যাদার হ্রাস বিবেচনায় বুটখোর কর্ম্মচারী বুট বাহালের প্রার্থনায় জজের নিকট দরখাস্ত করিলেন—যথা——"ধর্ম্মাবতার! যে খান্দানে আমার জন্ম, তাহাতে বুট্ নাগ্রা ভিন্ন কখন চটীর ব্যবহার ছিল না, অমুক তারিখে অমুক, চটী মারিয়া, আমাকে অসম্ভ্রম করিয়াছে। আসামীকে তলব ও আমার নিকট প্রমাণ গ্রহণ করিয়া উচিত শাস্তি এবং বুট্ বাহাল রাখিতে আজ্ঞা হয়।" জজ আসামীর জবাব লইয়া দেখিলেন যে বুট্ হাতে না থাকায় চটীর বাড়ি মারা হইয়াছে। প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবার কারণ না থাকায় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সাএল জজের হুকুমের অন্যথায় হাইকোর্টে আপিল ও তথায় এই মর্ম্মভেদী বেদনার প্রতিকার না পাইয়া প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিল। কাউন্সিল দেখিলেন দুই আদালতের ব্যয় অনেক ঘটিয়াছে ও প্রার্থনাটাও সামান্য। যদি বংশ মর্য্যাদার কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে ত প্রার্থনার অন্যথা নিম্ন আদালতের উচিত হয় নাই। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি! দুই আদালতের রায় অন্যথা!! বুট্ বাহাল!!! এই হুকুম পাইয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া বাদ্যোদ্যমে সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিতে চলিলেন। বাদ্যের শব্দ শুনিয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"হ্যাঃ বাবা! অমুক যেমন তেমন ছেলে নয়! বুট বাহালের সেই মোকর্দ্দমা প্রিভিকাউন্সিলে জিত হইয়াছে। কই চটী মারিয়া সাম্লাইতে পারিলেন না?"

এইত দেশের যুতার মান!

উপরের লিখিত চারি রূপের প্রথমটীর নাম বিমান, দ্বিতীয়টীর

অনুমান, তৃতীয়টীর হনুমান, ও চতুর্থটীর হত-মান বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল।

মহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তার।

সপ্তম অধ্যায়।

মুসলমান ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও উন্নতির বিষয় এতদূর পাঠ করিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য মহামতি মহম্মদের এত আগ্রহ যত্ন ও অধ্যবসায়, যাহার জন্য তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অম্লানবদনে ও অক্ষুব্ধ হৃদয়ে কত বার বিপদ আপদের মধ্যে অচলবৎ অটলভাবে অবস্থান করিয়াছেন, সুখ সম্পত্তি, স্বজন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক সময়ে যাহার জন্য পথের ভিখারী ও অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী—এমন কি গলগ্রহ পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত? তাহার মধ্যে এমনই কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য আছে যে শত শত ব্যক্তি তদ্দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া গেল? পিতৃপিতামহানুষ্ঠিত ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কেনই বা পুঞ্জ পুঞ্জ ধনুর্দ্ধর বলদৃপ্ত আরবগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল? ইসলাম ধর্ম্ম তাহাদের শ্রবণবিবরে এমনই বা কি আশ্বাসবাক্য প্রদান করিল যে ভীরুগণও তচ্ছ্রবণে সহাস্য আস্যে ভীমদর্শন শত্রুগণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া করাল কৃতান্তেরও সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না? যথা কথঞ্চিৎ রূপে পাঠকগণের এই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এই অধ্যায়টীর অবতারণা করা গেল।

বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপর মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইসলাম ধর্ম্মও জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই কাণ্ডে বিভক্ত। জ্ঞান কাণ্ডের প্রাণ বিশ্বাস ও কর্ম্ম কাণ্ডের জীবন অনুষ্ঠান। এই বিশ্বাস ছয় ভাগে বিভক্ত,—ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা যাইবে। প্রথম—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান, তিনি স্রষ্টা, পাতা ও সংহার কর্ত্তা। মহম্মদ কহিতেন "লা ইল্লা ইল্ আল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র ও অদ্বিতীয় এবং "মহম্মদ রসুল আল্লা" অর্থাৎ মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

দ্বিতীয়—স্বর্গীয় দূত ও মহাপুরুষগণের প্রতি বিশ্বাস। মহম্মদ কহিতেন দূতগণের দেহ অগ্নিবিনির্ম্মিত, পাপ ইহাঁদের শরীর স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয়, সৌমমূর্ত্তি ও সদানন্দ, নিয়ত বিভুগুণগান ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে রত, স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ ইহাঁদের মধ্যে নাই। এই দূতগণের মধ্যে গেব্রীল, মিকাএল (পুরাণ বর্ণিত সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সহ ইহাঁর সৌসাদৃশ্য আছে যুদ্ধই ইহাঁর কার্য্য) আজ্রেল (যম) ও ইজ্রাফিল এই চারিজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাইবেলবর্ণিত সয়তানের অনুরূপ মুসলমানগণের আজাজিল, সৎকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করাই ইহার কার্য্য। এতদ্বিতীত মুসলমানগণ আরও দুই দেবতার বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অষ্টপ্রহর মনুষ্যগণের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগের অনুষ্ঠিত সদসৎ কার্য্য সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কোরাণে লিখিত আছে—প্রেরিত মহাপুরুষগণের সংখ্যা দুইলক্ষ। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে আদম্ নোয়া, আব্রাহিম, মুষা ঈষা ও মহম্মদ এই কয়জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়—কোরাণে বিশ্বাস। কোরাণ মুসলমানজাতির ধর্ম্মগ্রন্থ—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। সপ্তম স্বর্গে অনন্তকাল এই শাস্ত্র বিদ্যমান

ছিল, গেব্রীল দূত হইতে সময়ে সময়ে মহম্মদ তাহা প্রাপ্ত হন। মহম্মদ কোন বিশেষ গ্রন্থে কোরাণের বিক্ষিপ্ত অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি দূতমুখে যাহা শুনিতেন শিষ্যগণ সমীপে পরদিন তাহা অভিব্যক্ত করিতেন, তাঁহার শিষ্যগণ খর্জ্জুর পত্রে সমস্ত লিখিয়া রাখিত। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে আবুবেকার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, সময় ক্রমে তাহা রীতিমত গ্রন্থে পরিণত হয়। এই গ্রন্থের অনেক অনুলিপি প্রস্তুত হইলে দেখা গেল যে অনেক স্থানের সহিত অনেক স্থানের আদৌ মিল নাই, এইরূপ অসামঞ্জস্য বিদূরিত করিবার জন্য তৃতীয় কালিফ্ অথমান পুনরায় সমস্ত বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া মনোনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন এবং অসংলগ্ন বা অতিরিক্ত পত্রগুলি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কোরাণ ১১৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে রাজ্যশাসনপ্রণালী ও ধর্ম্মনিয়ম উভয়ই সঙ্কলিত আছে। ধার্ম্মিক মুসলমানগণ ইহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং অশুচি অবস্থায় প্রাণান্তেও ইহাকে স্পর্শ করেন না বা কটীদেশের নিম্নে রাখেন না। মহম্মদ কহিতেন কোরাণ সঙ্গে লইয়া দূরদেশে বা অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে এবং ভূতলে রাখিয়া অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক ইহা পাঠ করাও নিষিদ্ধ। মুসলমানগণের আর একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, ইহার নাম সোন্না। কতকগুলি ব্যক্তি ইহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায় ইহাকে আদৌ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, এই জন্য এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ পরিদৃষ্ট হয়।

কোরাণে মহম্মদ বহুবিধ অমূল্য নীতি সারগর্ভ উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা অতীব যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঋণ

শুদ্ধ যে আমাদের পুরাণেই নানাবিধ কপোলকল্পিত অ[illegible] জীবজন্তু ও দেবদেবীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, [illegible]দের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণেও বহুবিধ কিম্ভূত কিমাকার জী[illegible] উল্লেখ আছে। একটী কুক্কুটের দেহ খানি এত বড় যে স্বর্গে [illegible] বৎসরের পথ ব্যাপিয়া পক্ষীটী বসিয়া আছে; স্বর্গে এক দূত বাস [illegible] তাঁহার একটী চক্ষু এত প্রকাণ্ড যে একটী বার মাত্র তাহা[illegible] বেষ্টন করিতে হইলে ৭০ হাজার বৎসর অবিরাম ভ্রমণ করিতে হয়, ইঁহার বদনাভ্যন্তরে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটী বালুকণার ন্যায় এক পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। আর একটী অপরূপ দূতের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহস্র মুণ্ড, প্রতি মুণ্ডে সহস্র বদন, প্রতি বদনে [illegible]স্র জিহ্বা, প্রতি জিহ্বায় অনর্গল সহস্র প্রকার বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছে। স্বর্গে এক প্রকাণ্ড মেজ আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কোরাণ গ্রন্থ খানি আল্লা স্বহস্তে তদুপরি লিখিয়া রাখেন। তিনি যে লেখনীটা ব্যবহার করিতেন তাহা এত প্রকাণ্ড ও উচ্চ যে দ্রুতগামী অশ্বের—লম্ফ প্রদান করিয়া এক দিক হইতে অপর দিকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে—একশত বৎসর লাগে। এরূপ অপ্রাকৃতিক বর্ণনার অভাব নাই। বিশদরূপে সমস্ত লিখিতে হইলে এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়, [illegible]র এরূপ বর্ণনা লেখা ও পাঠ করা উভয়ই যারপর নাই কষ্টকর। কাজেই এই খানেই কোরাণ বর্ণনা সমাপ্ত করিলাম।

চতুর্থ—পুনরুত্থানে বিশ্বাস। মহম্মদ কহিতেন—মৃতদেহ কবরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে মঙ্কার ও নাকির নামধেয় দুই দেবতা সেই সমাধি স্থানে আগমন [illegible]। মৃত শরী[illegible] পুনরায় জীবন সঞ্চার করেন। শব সেই সম[illegible] গাত্রো[illegible] করিয়া উপবেশন করিলে পর, দেবতাদুটী তাহাকে [illegible]টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যদি উত্তর সন্তোষ জনক হয় তবেই মঙ্গল, নহিলে জীবনপ্রাপ্ত শবকে (?) অবিরত

ভেরী ধ্বনি হইলে পৃথিবী জীবশূন্য হইয়া পড়িবে, স্বয়ং যমরাজ আজ্রেল অন্তিম শয্যায় শয়ন করিবেন, মুসলধারে বৃষ্টি পড়িবে, সমুদ্র পুনরায় সলিলরাশি পূর্ণ হইয়া দিক বিদিক গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইবে ও নিমেষ মধ্যে পৃথিবীকে গর্ব্ভসাৎ করিয়া ফেলিবে, অমনি অসংখ্য পরলোক বাসী আত্মা পৃথিবীতে নামিয়া স্ব স্ব দেহ অন্বেষণে ব্যস্ত হইবে এবং তাহা নির্ব্বাচন করিয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইবে। নিরীশ্বর বাদীরা পৃথিবীতে মুখ ঘর্ষণ করিবে, ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণ শুভ্র বর্ণ উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন। পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইলে সকলকেই একটী অতি সূক্ষ্ম সেতুপার হইয়া অপর দিকে গমন করিত হইবে। অন্ধকা[illegible] [illegible]র্ব্বতোপরি এই সেতু সংস্থাপিত। মহম্মদ অগ্রে অগ্রে যাইবেন, অপর সকলে তাঁহার অনুসরণ করিবে। এই সেতু পার হইলেই স্বর্গ নিকেতন। নরকের বর্ণনা অতীব ভয়ঙ্কর, ইহা সপ্ততলে বিভক্ত; পাপাত্মা মুসলমানগণ প্রথমতলে, খৃষ্টানগণ দ্বিতীয়তলে, তৃতীয়তলে য়িহুদিগণ, চতুর্থ তলে সেবিয়গণ, পঞ্চম তলে মেজিয় সম্প্রদায়, ষষ্ঠতলে পৌত্তলিক বর্গ এবং সপ্তম তলে নাস্তিকগণকে নিরয় যাতনা সহ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক অধস্তন তলে যন্ত্রণার আধিক্য; যত পাপক্ষয় হইবে পাপীরা তত ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

আরবদেশে যে সকল বস্তু অতীব দুর্লভ, মহম্মদ সমুদায় গুলিই স্বর্গে আনয়ন করিয়াছেন। রম্যদর্শন সুবিস্তৃত হ্রদ ও হ্রাদিনী সকল [illegible]র্গের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। সলিলরাশি শীতল স্বচ্ছ [illegible]বাসিত ও মধুর। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী হইতে ঝির ঝির করিয়া [illegible]ল পড়িতেছে, স্রোতস্বতীগণ ধীরি ধীরি বহিয়া যাইতে[illegible]। নদীর [illegible]ভয় কূল তরুরাজি সমাকীর্ণ, লতিকা [illegible]ল সুরভি [illegible]পাভরণে

বিগ্রহে ক্ষান্ত দিয়া তরবারিগুলি কোষমধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইল, এবং ইন্দ্রিয় সুখে গা চালিয়া দিয়া ভোগ্যরূপ ভেলায় আরোহণ পূর্ব্বক বিঘ্নসঙ্কুল জীবনসমুদ্র পার হইতে প্রয়াস পাইল। তাহাতে লাভ হইল কি?—না সামান্য বায়ুভরে ক্ষীণ ভেলাটী টলমল করিতে করিতে কালগর্ব্বে নিমগ্ন হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হামির—ঐতিহাসিক নাটক। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। আমরা সুরেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত পদ্য ইত্যাদি পাঠ করিয়া যে রূপ প্রীতি লাভ করিয়া ছিলাম এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রতি যে রূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এই নাটক খানি পাঠে তাদৃশ প্রীতি যদিও লাভ না করিয়াছি তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে একথা বলিতে পারি যে বঙ্গভাষায় আজ কাল যে রূপ নাটক প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে এ খানি [illegible] দিতে হইবে। কবি এই নাটক খানিতেও পদ্মিনীর গীত রচনা করিয়া তাঁহার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নাটকের গল্পাংশটী তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই। কবি উদয় ভট্টের চরিত্র অতি স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত করিয়াছেন হামির চরিত্রে রাজপুতগণের দেশানুরাগ বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। লীলা বীরণ ও [illegible] এই তিনটী চিত্রে রাজপুত স্ত্রী জাতির চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং উহাও ভারতবাসীর প্রীতির পদার্থ তাহার সন্দেহ নাই। বাসর ঘরের দৃশ্যটী অতি উৎকৃষ্ট ও মনোরম হইয়াছে এবং তাহাতে ঘাত প্রতিঘাতের বিশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তম অঙ্কে মালি, ভৃত্য ইত্যাদি চরিত্রের অধিবেশন